KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 200	Place of Publication: ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection: KLMLGK	Publisher: মীর ওসমান
Title: চতুরঙ্গ	Size: 7"×9.5" 17.78×24.13 c.m.
Vol. & Number: ৫৮/১ ৫৮/2 ৫৮/৩	Year of Publication: বৈশাখ ১৪০৬ ভাদ্র ১৪০৬ পৌষ ১৪০৬
	Condition: Brittle Good
Editor: আবদুর রাউফ	Remarks:

C.D. R. No.: KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ১ বৈশাখ ১৪০৩

সূচিপত্র

'জীবনে ও মননে সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ'— অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদারের সন্দর্ভ।
'সাম্প্রদায়িকতা রোধে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা'— ইতিহাসবিদ শান্তিময় রায়ের আলোচনা।

'ভারতীয় নাট্যপ্রেক্ষিতে বাংলা থিয়েটার'— কুমার রায়ের দীর্ঘ বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ।
'কলকাতার হিন্দি নাট্যচর্চার একটি ভিন্নধারা'— ঊষা গাঙ্গুলীর নাট্য অভিজ্ঞতার পরিচয়।

কবিতা নিয়ে মননশীল নিবন্ধ,— 'শব্দানুষঙ্গে কাব্যবিচার'— লিখেছেন কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়; আর একটি নিবন্ধ— 'সৌন্দর্যের আলোকে কবিতা ও বিজ্ঞান' —লিখেছেন আর এক কবি— আনন্দ ঘোষ হাজরা।

বিজ্ঞানশিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য দুরবস্থা নিয়ে নিয়ে লিখেছেন বিজ্ঞানের দুই অধ্যাপক ড. মানস জোয়ারদার এবং অশোকেন্দু সেনগুপ্ত।

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় নতুন আলোকপাত করেছেন ড. শিশির কুমার দাশ।

কবি নজরুলের সমন্বয়বাদী মানসিকতার উৎস সন্ধান করেছেন আবদুর রউফ

গ্রন্থসমালোচনা করেছেন নিত্যপ্রিয় ঘোষ, স্বপন মজুমদার, সুধীর চক্রবর্তী, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

Hindustan Wires Limited

Registered Office

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016

Phone : 242-6745 (3 lines)
242-6746
242-6747

Telegram : WIREFIELD

Factory

B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas

Phone : 58-1947, 58-1934

Manufacturers of

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle Spoke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &
MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED
JAPAN

বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ১
বৈশাখ ১৪০৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

■ জীবনে ও মননে সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ	দেবদাস জোয়ারদার	১
সাম্প্রদায়িকতা রোধে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা	শান্তিময় রায়	৯
■ অকৃতার্থতার তৃপ্তি	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	১৩
সূর্যস্তোত্র	আলোক সরকার	১৪
অসামাজিক	বিজয়া মুখোপাধ্যায়	১৫
গায়ত্রী	রাজলক্ষ্মী দেবী	১৬
কেউ আমায় বলুক	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
শান্তি-প্রস্তাব	উত্তম দাশ	১৮
পদ্মার টিল	সৈয়দ কওসর জামাল	১৯
সেতুগুলি ভেঙে পড়ছে	মেঘ মুখোপাধ্যায়	২০
■ ভারতীয় নাটপ্রেক্ষিতে বাংলা থিয়েটার	কুমার রায়	২১
কলকাতার হিন্দি নাট্যচর্চার একটি	ঊষা গাঙ্গুলীর নাটা	
ভিন্ন ধারা	অভিজ্ঞতার পরিচয়	২৯
■ ক্যাণ্ডির বৌদ্ধ ভিক্ষু	দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩
■ শব্দানুষঙ্গে কাব্যবিচার	শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	৩৭
সৌন্দর্যের আলোকে কবিতা ও বিজ্ঞান	আনন্দ ঘোষ হাজরা	৪২
■ বোধিলাভ	সোহারাব হোসেন	৫০
■ বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান মনস্কতা	মানস জোয়ারদার	৫৭
শিক্ষার হালচাল	অশোকেন্দু সেনগুপ্ত	৬২
■ প্রথম প্রতিশ্রুতি	শিশির কুমার দাশ	৬৮
■ বাঙালিয়ানার প্রতীক	আবদুর রউফ	৯০

গ্রন্থসমালোচনা

নিত্যপ্রিয় ঘোষ ■ স্বপন মজুমদার ■ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ■ মীনাক্ষী ঘোষ ■ রণেন্দ্রনাথ দেব ■ পুলক নারায়ণ ধর ■ মঞ্জু দাশগুপ্ত ■ অজিত কুমার চক্রবর্তী ■ ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ■ সুধীর চক্রবর্তী ■ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

■ স্মরণে আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ	প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য	১১৪

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক গুপ্তপ্রেস কলি-৯ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৩ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩ থেকে প্রকাশিত

অফিস : ৫৪ গনেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩
শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

দূরভাষ : ২৭৬৩ ২৭
সম্পাদক : আবদুর রউফ

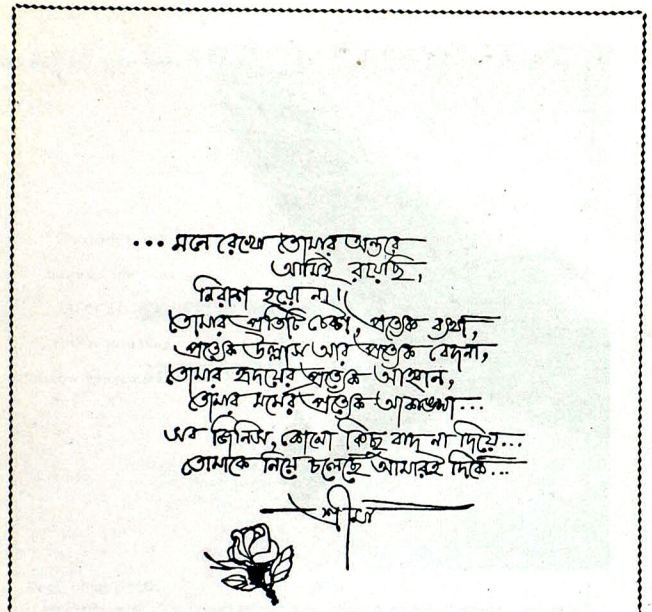

জীবনে ও মননে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

দেবদাস জোয়ারদার

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র—একজন কবি, তাঁর জীবনে চলছিল 'নির্জন-সঞ্জনের নিত্য সংগম', আরেকজন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা যোদ্ধা, যুদ্ধকালেই স্বাধীনভারত গঠন চিন্তায় ব্যাপৃত, 'ঘূর্ণচক্র জনতা সংঘে'র সঙ্গে সতত আবর্তিত তাঁর জীবন, মূলত কর্মী, কর্মের প্রয়োজনে তারই মধ্যে ধ্যানী। এ-ধ্যান কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যান নয়। তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গ লাভের অভিজ্ঞতা থেকে গতযুগের মনস্বী সাংবাদিক প্রমাত সত্যরঞ্জন বক্সী লিখেছিলেন, 'নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা অনেকে দেখেছেন শত জনসমাগমেও তিনি কত নিঃসঙ্গ ছিলেন'। এই নিঃসঙ্গতা বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'দ্বিতীয় চেতনা' প্রসূত। অধিকাংশ মানুষ যখন গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় নিমগ্ন, তখন ক্বচিৎ কখনো যে, কয়েকজন সেই চিন্তা-চেতনার বাইরে গিয়ে চারদিককার মানুষের বেদনা অঙ্গীকার করেন, তাঁদের মধ্যেই সেই 'দ্বিতীয় চেতনা' জাগে। জনতার মাঝখানে একা যে সুভাষচন্দ্রের কথা শ্রদ্ধাস্পদ সত্যরঞ্জন বক্সী লিখেছিলেন, সেই বহু সঙ্গের মধ্যেও নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সৃষ্ট আত্মত্যাগী, কর্মী অজস্র চরিত্রের মধ্যেও সেই নিঃসঙ্গ মানুষের আদল ফিরে ফিরে দেখতে পাই, যেমন তাঁর 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের শশিভূষণে, গোরায়, নিখিলেশে, পঞ্চক-অভিজিৎ-বিশু-রঞ্জনে এবং এমনিতর অজস্র চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথ বা সুভাষ চরিত্রের নিঃসঙ্গতা আসলে যে-কোনও যথার্থ স্রষ্টা, চিন্তক ও কর্মযোগীর রক্তের অন্তর্গত থাকে। তাঁর দেশত্যাগের বছর চারেক পূর্ব থেকে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ আকস্মিক ঘটনা নয়। কনিষ্ঠের সংপূর্ব অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভের পর বয়োজ্যেষ্ঠ কবি তাঁর নিজের সমানধর্মা ও তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলির একটি বাস্তবরূপ সুভাষচন্দ্রের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন ব'লেই আমরা বিশ্বাস করি।

কবি রবীন্দ্রনাথ ও কর্মযোগী সুভাষচন্দ্রের শত পার্থক্য সত্ত্বেও দু'জন জীবনে ও মননে কোথাও কোথাও একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ভারতের নবজাগরণের পরমপরিণতি রবীন্দ্রসাহিত্যে ও জীবনে। আর এই নবজাগরণ যখন স্বাধীনতা যুদ্ধে ও স্বাধীন ভারতের রূপরেখা অঙ্কনে ব্যক্ত হয়, তখন তারই বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে সুভাষ-ব্যক্তিত্বে। এই সূত্রেই জীবনের পথে পথ চলতে চলতে তাঁরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিলেন। কনিষ্ঠ সুভাষ তাঁর ছাত্রজীবনে ১৯১৪তে কয় বন্ধুতে মিলে শান্তিনিকেতনে কবির কাছে গিয়েছিলেন। কবি তাঁদের গ্রামোন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন সে উপদেশের মর্ম পরে বুঝলেও তখন তাঁদের ভালো লাগেনি। চব্বিশ বছর পর একটি বক্তৃতায় এ-কথা তিনি নিজেই বলেছেন। ১৯১৪র দু'বছর আগে বিলেতযাত্রী শরৎচন্দ্র বসুকে কটক থেকে দশমশ্রেণীর ছাত্র সুভাষ রবীন্দ্র-আদর্শবিরোধী ইংরেজি ভাষায় যে চিঠি লিখেছেন, তাতেই তাঁর মুদ্রিত রচনাদির মধ্যে প্রথম রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লিখিত হতে দেখছি। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে আছেন। দশম শ্রেণীর ছাত্রটি গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপিকে ঘিরে বাংলা কবিতার বিশ্বজয়ের গর্বে উৎফুল্ল, বিদেশে কবির সমাদরে তাঁর দেশাত্মবোধ উদ্বেল, আত্মঅনুশোচনায়ও তিনি পীড়িত বোধ করছেন এই ভেবে যে বাংলাদেশ কবির 'প্রতিভার প্রতি কত উদাসীন ছিল!' ১৯১২র ১৭ই সেপ্টেম্বরে লেখা এই চিঠির শেষে তিনি লিখছেন যে তাঁর বিশ্বাস কবির কবিতাগুলির মর্ম তিনি একদিন উপলব্ধি করতে পারবেন। ১৯১২র ২২ অগাস্টের চিঠি পড়ে মনে হয়, ঐ বয়সেই তিনি 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র

সূর্যাস্তরঞ্জিত সমুদ্র তাঁর কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন, রবীন্দ্র কবিতার মর্মলোকে প্রবেশপথ খুঁজে পাচ্ছেন।

এ রকম পরোক্ষ যোগ খুঁজনের ঘটেছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ওটেনকে নিয়ে গোলমালের পর। রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রের ১৩২২ (১৯১৬) চৈত্র সংখ্যায় 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' নামে একটি প্রবন্ধে এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধচিত্তে লিখেছিলেন, 'এ দেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে; এইজন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন'। প্রজা বলে দেখেন ব'লেই ছাত্রদের সঙ্গে ইংরেজ অধ্যাপক জেলখানার কয়েদির প্রতি জেলারের মতো আচরণ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে এই 'ছোটো ইংরেজ'দের দেখেছেন, খবরের কাগজে এই মনুষ্যপুঙ্গবদের কুকীর্তির কথা বারবার পড়েছেন। তাঁর প্রবন্ধে চিঠিপত্রে সোজাসুজি এই পুঙ্গবদের কথা লিখেছেন, এমনকি গল্পে উপন্যাসেও পরোক্ষভাবে এঁদের কথা এসেছে। সুতরাং এ হেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শিক্ষা বইটির অন্তর্ভুক্ত 'ছাত্রশাসন তন্ত্র' প্রবন্ধ লেখা এবং 'মডার্ন রিভিউ'তে তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার বাংলার গভর্নর কারমাইকেলের কাছে এর কপি পাঠানো খুবই স্বাভাবিক। সুভাষচন্দ্র কি ওটেনসংশ্লিষ্ট তাঁর জীবন-অধ্যায়ে কবির এই ভূমিকার কথা জানতেন? জানলেও অতিদ্রুত লেখা তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী An Indian Pilgrimও অথবা প্রকাশিত আর কোনও ভাষণে বা চিঠিপত্রে এ-প্রসঙ্গে কবির কথা উল্লেখ করেন নি। রবীন্দ্রনাথও কি জানতেন ওটেনকে ঘিরে বিক্ষোভে ছাত্র-আন্দোলনের নেতা সুভাষ কয়বন্ধুর সঙ্গে মিলে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বছর দুই আগে দেখা করে এসেছেন অথবা ১৯২১-এ বিলেত থেকে ফেরার পথে এই সুভাষের সঙ্গেই অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর The Indian struggle 1920-42 বইটিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই জাহাজে দেশে ফেরার সময় এই আলোচনার কথা লিখেছেন। আলোচনায় তাঁর মনে হয়েছিল যে কবি অসহযোগের এই নতুন রীতির প্রতি বিরূপ ছিলেন না, তিনি গঠনমূলক কাজ আরও বেশি চাইছিলেন যাতে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র (a state within the state) জনসাধারণের সহযোগিতায় ও সমর্থনে গড়ে তোলা যায়। কবি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা আইরিশ সিন্ ফিন্ মুভমেন্টের অনুরূপ। সুভাষচন্দ্র এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন যে তাঁর নিজের জন্যে অনুরূপ ছিল। কিন্তু দেশে ফেরার পর অসহযোগের বিরোধীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কবি অসহযোগের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন, তার সঙ্গে আবার কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে সংস্রবশূন্য মহাত্মার আধুনিক বিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধারণাগুলির সমালোচনা করে চললেন। অসহযোগ আন্দোলন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদকামী এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কবি কলকাতায় 'শিক্ষার মিলন' নামে একটি ভাষণ দেন, 'শিক্ষার বিরোধ' নামে পাশ্চা ভাষণ দেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এইসব তথ্যের পর সুভাষচন্দ্র অবশেষে লিখেছেন যে কিছুকাল অতিবাহিত হলে কবির গান্ধীবিরোধিতা দূর হয় এবং তিনি মহাত্মার পরবর্তী কার্যক্রমের বিশ্বস্ততম সমর্থকদের একজন হয়ে ওঠেন। কবির গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও সিন্‌ফিন্ মুভমেন্টের অনুরূপ ধারণার কথা সুভাষচন্দ্র যে-ভাবে লিখেছেন, তা যথার্থ। কিন্তু কবি তখন অসহযোগের বিরোধী ছিলেন না, পরে দেশে ফিরে বিরোধিদের প্রভাবে বিরোধিতা শুরু করলেন তাঁর এই বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা একমত নই। কেন না বিদেশ থেকে লেখা কবির চিঠিপত্রে অসহযোগ বিরোধিতার সুর আগেই শোনা যাচ্ছিল।

The Indian Struggle বইটির ভূমিকা লেখার জন্য বার্নার্ডশকে অনুরোধ করে কবি একটি চিঠি লিখুন, এমন মনোবাসনা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁকে চিঠি দেন। এই চিঠি তাঁর সমগ্রচরিত্রদ্যোতক। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষকে একমাত্র সুভাষচন্দ্রের মতো শুদ্ধবাক্ মানুষেরই লেখা সম্ভব Bernard Shaw মহাশয়কে '...আপনি যদি লেখা স্থির করেন, তাহা হইলে এমনভাবে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন যাহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছু কাজ হয়। কেবল আমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য লিখিয়া কোন লাভ নাই। আমি যখন ইয়ুরোপে তখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া Romand Rolland মহাশয়কে আমার সম্বন্ধে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু সে পরিচয়-পত্র যেন অনুরোধ রক্ষার জন্য লেখা। কিন্তু সে পত্রের আমি সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই'। এখানে প্রকাশ থাকে যে, কবি দুটি মাত্র বাকো সেই পরিচয়-পত্র লিখেছিলেন। সত্যি বোঁমা রোলাকে চিঠি লিখে সুভাষচন্দ্র নিজেই যোগাযোগ করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে স্বাধীনতালাভে ভারতের সহিংস পন্থা অবলম্বনে এই ফরাসি মনীষীর প্রসন্নচিত্তের স্বীকৃতি পেয়ে ভারমুক্ত বোধ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকার বিষয়ে রোলাঁ তাঁর Indeতে লিখেছেন। সুভাষচন্দ্রও এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বার্নাডশ'কে রবীন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান স্ট্যাগলের ভূমিকা লেখার অনুরোধ জানালে কোনও কাজ হবে না— তা জানিয়ে কবি সুভাষচন্দ্রকে নিজেই শ'র সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই বই অন্য কারও ভূমিকা ছাড়াই প্রকাশিত হয়। শুধুই অনুরোধ রক্ষার জন্য পরিচয়-পত্র লেখার অভিযোগ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের চিঠির উত্তর দেওয়ার সময় কবি নীরব ছিলেন। কিন্তু তা যে কবির মনে ছিল, এর প্রমাণ আছে। বছর পাঁচেক পরে ত্রিপুরী কংগ্রেস চলার সময় অসুস্থ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র যখন বিরোধীদের

প্রতিকূলতায় ও ছদ্ম-অসুস্থতার অভিযোগে বিধ্বস্ত দিনগুলি আরোগ্য লাভের আশায় কাটাচ্ছেন, তখন একটি ছোট্ট চিঠি কবি তাঁর উদ্দেশে লিখেও একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে পরের দিন ডাকে দিতে নিষেধ করেন এই ভেবে যে এটুকু চিঠিতে তাঁর মনের কথা পরিষ্কার ক'রে বলা হয় নি। আমরা বলি, কবির হয়তো বা আশঙ্কা জেগেছিল যে ঐ অনুরোধ রক্ষার চিঠির মতোই এটিও নিছক কর্তব্যপালনের চিঠিরূপেই সুভাষের মনে হবে।

এইসব ব্যক্তিগত কথার চেয়েও বড়ো কথা ১৯৩৪এর তেসরা অগস্ট ভিয়েনা থেকে ইন্ডিয়ান স্ট্যাগল বিষয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন যে একবার কবিকে দিয়ে তাঁর বইয়ের ভূমিকা লেখানোর কথা তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর দুটি কথা মনে হয়েছে। এক, রবীন্দ্রনাথ বোধহয় রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে চাইবেন না, দুই গান্ধীজি সম্পর্কে বইটিতে সমালোচনা থাকায় 'মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত' কবি তা 'বরদাস্ত' করতে পারবেন না। ইন্ডিয়ান স্ট্যাগলে রবীন্দ্রনাথকে তবু তো তিনি অসহযোগোত্তর কালে One of the staunchest Supporters of the Mahatma বলেছিলেন ; কিন্তু এই চিঠিতে তাঁকে সোজাসুজি 'মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত' বললেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে মহাত্মাগান্ধী যে 'সমস্ত ভারতবর্ষকে মনকে এক যুগ থেকে আরেকযুগে নিয়ে যেতে পেরেছেন,' ইংরেজি শিক্ষিতদের বাইরে 'সমস্ত জনসাধারণের মনকে তিনি বিচলিত করতে পেরেছেন— আজ পর্যন্ত আর কেউ তা পারেন নি', তা পেরেছেন তাঁর চরিত্রের মধ্যে 'একটা প্রবল নৈতিক শক্তি'তে— এইসব কথা স্পষ্টভাষায় লিখেছিলেন। 'মহাত্মাজীর চরিত্রের মধ্যে এই একটা প্রবল নৈতিক শক্তিকে ভক্তি যদি না করতে পারি তবে সেটাকেই বলবো অন্ধতা'— কবির এই বাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে বলি, এই অন্ধতা মহাত্মার প্রতি সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিকেও কোনও দিন আচ্ছন্ন করতে পারে নি— না ইন্ডিয়ান স্ট্যাগল রচনার সময়, না ত্রিপুরা পর্বে বা তার ঠিক পরে, বা আজাদহিন্দ ফৌজ পরিচারচালনার সময়। কেন না কাজে ও কথায়, আচরণে ও উচ্চারণে সংগতিহীন নৈতিক শক্তিরিক্ত অনেক প্রখর সাবির নেতার সঙ্গে মহাত্মাগান্ধীর পার্থক্য বোঝায় অক্ষম অল্পমতি সুভাষচন্দ্র কোনও দিন ছিলেন না। মহাত্মার মতো তাঁর চরিত্রের মূলভিত্তি ছিল এক অটল নৈতিকশক্তি। আর 'ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে দুর্বল রকমের রাষ্ট্রনৈতিক সুড়সুড়ি'র বদলে তিনিই যে প্রথম গণজাগরণ ঘটালেন, এই ঐতিহাসিক সত্য ইন্ডিয়ান স্ট্যাগলের লেখক তাঁর বস্তুনিষ্ঠায় মুহূর্তের জন্যও আড়াল করেন নি। করেন নি, তার অন্য কারণ বাদ দিলেও মূল কারণ তা করা যায় না। খিলাফৎ আন্দোলনের মতো একটি ইসলাম ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য যে অসহযোগের ডাক দেওয়া হল, তা ক'রে গান্ধীজি ভুল করেছেন এবং খিলাফৎ আন্দোলনের ধর্মের ফুটো নৌকোয় অসহযোগের নদী পাড়ি দেওয়ার সময় তা ডুবে যায়— রবীন্দ্রনাথ এমন সমালোচনা ক'রে লিখেছিলেন 'মালাবারে মোপলাতে হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল, সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখে'। সুভাষচন্দ্রও অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের মিলন, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা এমন জলিল প্রসঙ্গগুলি নিয়ে তাঁর বইটিতে আলোচনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মত মেলে না। দুই আন্দোলনের মিলনে কোনও ভুল হয় নি, তাঁর মতে ভুল হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ খিলাফৎ কমিটি সারা দেশে গঠন করতে দেওয়ায়। তার ফলে যখন নব্য তুরস্কের নেতা কামাল পাশা খলিফাকে রাজ্যপাট তুলতে বাধ্য করলেন এবং খলিফার পদ লুপ্ত করলেন, তখন খিলাফৎ কমিটির সভ্যরা এ-দেশে সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল, ব্রিটিশপন্থী মুসলিম সংগঠনগুলির মধ্যে ঠাঁই পেল। সুভাষচন্দ্রের এই বিশ্লেষণ কবির চিন্তা থেকে স্বতন্ত্র। দু'জনের মননের আলোচনায় এই পার্থক্য আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠতে পারে বিবর্তিত সুভাষমনন কি শেষ পর্যন্ত ধর্ম ও রাজনীতির মিলনকে একই ভাবে দেখেছে? এ-বিষয়ে আমাদের দ্বিধাহীন উত্তর— না, একভাবে দেখে নি। ১৯২২ এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কলকাতা আর্য সমাজ হলে নিখিলবঙ্গ যুব সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে যে-সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন 'যিনি ওপারে, দুলোকে আকাশের চরকায় আলোকবৃষ্টির সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন এবং ভূলোকে কালের চরকায় কত বিভিন্ন জাতির বিচিত্র ইতিহাসের সুবর্ণসূত্রের সৃষ্টি করছেন— তাঁকে আমরা পরম বিষ্ণু বলে নয়— জাতির ভাগ্যবিধাতা বলে বরণ করব', যে সুভাষচন্দ্র ১৯২৮এ কলকাতা সিটি কলেজে রামমোহন ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা করা নিয়ে কলেজের ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধে রাজনীতির অঙ্গরূপে হিন্দু ছাত্রদের আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ান, সেই সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস সভাপতি রূপে 'বন্দেমাতরম্' গানের 'অঙ্গচ্ছেদে' (শব্দটি তখনকার বাঙালি হিন্দুদের পরিচালিত সংবাদপত্রের) স্বীকৃতি দেন, জর্মানিতে ও পূর্ব এশিয়ায় বন্দেমাতরম্ থেকে জয়হিন্দ ও 'জনগণমন'তে উত্তীর্ণ হন, তখন বলতেই হয় পরের সুভাষচন্দ্র আগেকার সুভাষচন্দ্রের বিবর্তিত রূপ। এই বিবর্তন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কে জানে হয়তো বা রবীন্দ্রপ্রভাবও কাজ করেছে। আগেকার সুভাষ ধর্মের সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে যতটা যুক্ত মনে করতেন, পরবর্তী কালের সুভাষ ততটা যুক্ত ব'লে ভাবতেন

না। শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির ভিত্তি ঐহিক, বারবার জাতীয় জীবনে পারত্রিক ও পারমার্থিক ভাবনা টেনে আনলে এদের ভিত্তি দুর্বল হয়। এসব ভাবনা ব্যক্তিগত স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এতসব কথা তিনি সবিস্তারে কোথাও লেখেন নি। Secularism এর একটি ভুল বাংলা এখন চলছে ধর্ম নিরপেক্ষতা। কিন্তু এর বাংলা হওয়া উচিত ঐহিকতা। সব ধর্মেই কিছু ঐহিক ব্যাপার থাকে, হিন্দু ধর্মেও আছে। আবার পারত্রিক ও পারমার্থিক ভাবনার ভাগই ধর্মের মধ্যে বেশি থাকে। তাতে দেব দেবী বা একেশ্বরবাদী ধ্যান ধারণা মিশে যায়। বন্দেমাতরম্ গানে 'ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণধারিণী'তে সকলের দেশমাতা ও কেবল হিন্দুর দুর্গামাতার মিলন অহিন্দুর কাছে গ্রাহ্য হতে পারে না। তাই গানের প্রথম অংশে যেখানে এই মিলন ঘটে নি, সেটুকু জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত হোক—রবীন্দ্রনাথের এই মত সুভাষচন্দ্র মেনে নেওয়ায় একশ্রেণীর বাঙালি হিন্দু সেদিন তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১১ই অগাষ্ট ১৯৩৯ সন্ধ্যায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়িতে কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদের এক ঘরোয়া সমাবেশে কবি কালিদাস 'বন্দেমাতরম্' গানের আনীতে বর্জনে কংগ্রেস সভাপতি রূপে তাঁর অবশ্যই সম্মতি ছিল কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'হাঁ, আমার সম্মতি না থাকলে আমি নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করতাম। শুধু বাংলার দিক থেকে বা বিশেষ কোনো ধর্ম বা জাতির দিক থেকে কোনো বিষয়ের বিচার কংগ্রেস করতে পারে না। সেই জন্য সর্ববাদিসম্মতভাবে যে অংশটুকু গৃহীত হয়েছে তাতে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মর্যাদা কোনো মতে ক্ষুণ্ন হয় নি বলেই আমি মনে করি'। রাষ্ট্র হবে ঐহিক—এসব তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে না গিয়েও এখানকার কথা কয়টিতে তাঁর মনোভাব বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁর এই বিবর্তন বোঝার দিক্ থেকে শ্রীমতী কৃষ্ণা বসুর 'প্রসঙ্গ সুভাষচন্দ্র' বইটির 'সৈনিকের স্মৃতি' শীর্ষক আবিদ হাসানের 'জয়হিন্দ্' ধ্বনি প্রবর্তন ও 'জনগণমন' সংগীত নির্বাচন বিষয়ে স্মৃতিচারণ অমূল্য। ঈশ্বর-আল্লা, রাম-রহিম-এভাবে আলাদা উপসনা রীতির পরিবর্তে জর্মানিতে ইন্ডিয়ান লিজিয়ন ট্রেনিং ক্যাম্পে সৈনিকদের একটি অভিন্ন উপাসনা প্রবর্তনের জন্য 'মালিক' (যেমন পাশ্চাত্যে বলা হয় লর্ড) শব্দটি নির্বাচন সুভাষচন্দ্রের কাছে ছেলেমানুষি মনে হয়েছিল, দুনিয়ার মালিকের উদ্দেশ্যে ওই স্তবগানকে ননসেন্স ভেবেছিলেন, তিনি আবিদ হোসেনকে বলেছিলেন, 'এই আন্দোলনের তিনি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ আর এর চরিত্র রাজনৈতিক,' 'যদি তোমরা ধর্মের নামে কাউকে এক হতে বলো তাহলে আবার ধর্মের নামে বিভেদ ডেকে আনাও খুব সহজ', 'ধর্মের নামে একতার চেষ্টা এই দৃষ্টিভঙ্গী, এই অ্যাপ্রোচ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ওতে শুধু বিভেদের বীজ বপন করা হয়'। যে-পরিণত প্রজ্ঞায় তিনি আবিদ হাসানকে এই কথাগুলি বলেছিলেন, সে-প্রজ্ঞা অসহযোগ ও খিলাফতের ভরা জোয়ারে উত্তাল দিনগুলিতে তাঁর লাভ করার কথাই ওঠে না। এমনকি ১৯৩৪এ ইন্ডিয়ান স্ট্যাগলেও সেই প্রজ্ঞার পরিচয় নেই। তারপর আবিদ হাসান জর্মানিতে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে 'বন্দেমাতরম্' বা অন্য কোনও গানের বদলে কিভাবে 'জনগণমন' জাতীয় সংগীতরূপে নির্বাচিত হল, তার স্মৃতিচারণ করতে বসে সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের আরেকটি দিকের পরিচয় দিয়েছেন। কোনও সিদ্ধান্ত অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। অথচ নিজের অব্যক্ত 'জনগণমন' গানের প্রতি প্রীতি অন্য সকলকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিচ্ছেন। 'নমস্কার', 'নমস্তে', 'সেলাম আলেকুম', 'সৎশ্রী অকাল' 'জয় রামজি কি' ইত্যাকার পারস্পরিক অভিনন্দনের ভাষার ধর্মীয় অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে, 'জয়হিন্দ্' উচ্চারণ ও প্রবর্তনের যে-ইতিহাস আবিদ হাসান শুনিয়েছেন, তাতেও সুভাষচরিত্রের এক বিবর্তিত দিকের উপর আলো এসে পড়েছে। যাকে স্বাধীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা নাম দিয়ে সর্বধর্মেসমদর্শিতা ও সমন্বয় ভেবে আমরা নিমীলিত লোচনে চালাচ্ছি, তার তুলনায় সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি স্বচ্ছতর ছিল। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার পরিচালিত পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের জন্য বিদ্যালয় গুলিতে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। যৌবনে শিক্ষা প্রসঙ্গের বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র সমস্ত ধর্ম শিক্ষার ধারা জাতীয় শিক্ষার সমুদ্রে মিলিত হবে—এমন কথা বলতেন। এ-সব কথা এখনও অনেকে বলেন। কিন্তু পরিণত সুভাষ ঐহিক দূরে থাকবে, এ-বিষয়ে স্থির ধারণায় পৌঁছেছিলেন।

শিক্ষায় ধর্মের স্থান থাকবে কিনা, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটির নামই 'ধর্মশিক্ষা'। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি যা লিখেছেন, তার নিগলিতার্থ এই যে স্বতন্ত্রভাবে শান্তিনিকেতনে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন নেই, আশ্রমের পরিবেশকে করতে হবে ধর্মবোধ উন্মেষের উপযোগী। সুভাষচন্দ্রকেও এই মতাবলম্বী ব'লেই মনে হয়। কোথায় যেন পড়েছি জর্মানির একটি কাগজে তিনি তখনকার ভাষায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে ব্যক্ত ধারণা আমাদের জানা নেই। তবে তাঁর বাংলা লেখায়ও আমরা কবির শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেখেছি। শিশুর কাছে সমস্ত ধারণাকে ইন্দ্রিয়াভিত্তিক ক'রে তোলা, শিক্ষার্থীর জীবনে প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য এমনিতর রাবীন্দ্রিক ধারণা গুলি তিনি তাঁর শিক্ষাচিন্তায় বিশেষ মূল্য দিতেন। আই.সি. এসে যোগদান না-করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। এমন কথা তাঁর একটি চিঠিতে আছে। আবার এ কথাও সত্য হতে পারে শান্তিনিকেতন আশ্রমিকদের দেখে তাঁর কিছু বিরূপ ধারণা জেগেছিল যে আদর্শ যা-ই হোক না কেন, ওখানে যতটা কোমলতার চর্চা হয় ততটা লৌহকঠিন

পেশীর চর্চা হয় না, ব্যক্তিত্ব দৃঢ় ভিত্তি পায় না। এই জাতীয় ধারণাকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' বইটিতে আছে, একদিন সুভাষের সঙ্গে তিনি জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। তখন সুভাষচন্দ্র গৌড়ীয় বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ এর নাম বিদ্যাপীঠ কেন জানতে চেয়েছিলেন। এমন একটা ইঙ্গিত ছিল, তাহলে কি ওখান থেকে বিদ্যা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে? এই বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিতে নিঃসন্দেহে শ্রোতা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। সাবিত্রী প্রসন্ন লিখেছেন, তারপর কবি সুভাষের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করলেন। নিরীক্ষা মূলক মনস্তত্ত্বের প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরাগী ছাত্র ছিলি তিনি। তাই শিক্ষাবিজ্ঞান তাঁর বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল। চিঠিপত্রে ও ভাষণে প্রকাশিত তাঁর শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল দেখতে পাই। কটকের Protestan European School-এ (সংক্ষেপে P.E.School) তাঁর ছেলেবেলায় পড়ার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি আত্মজীবনীতে যা লিখেছেন, তা আবার রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তাই মনে করিয়ে দেয়। ভারতীয় অবস্থা, প্রয়োজন, ইতিহাস ও সমাজকে অস্বীকার করে ইংরেজদের পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা বালকমনকে, বিশেষভাবে তাঁর মতো অন্তর্মুখী বালক মনকে, কিভাবে হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন করেছিল—তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর তিনি লিখেছেন যে ভারতীয় ছোটো ছেলেদের 'ইংরেজি' শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। পরিণত বয়সে বিচার শক্তি জাগার পর খালো মন্দ যখন আলাদা করতে পারে, তখন পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এলে কোনও ক্ষতি হয় না। এ-সব কথা কি রবীন্দ্রনাথেরও কথা নয়?

দিলীপকুমার রায়ের 'অনামী' বইটিতে তাঁকে লেখা সংগীত বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠি আছে। এই চিঠি রবীন্দ্রনাথকে তিনি পড়তে পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর—এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি।' চিঠির শেষেও আবার লিখেছিলেন, 'সুভাষের চিঠিগানি পাঠিয়ে তুমি আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছ—সেই কৃতজ্ঞতাবশতই, আমার ডান হাতের তর্জনী এই খানিক আগে ছুরিতে বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এতখানি লিখে ফেললুম'। সুভাষ মান্ডেলে জেল থেকে ১৯২৫এ দিলীপকে এই চিঠি লিখেছিলেন। কী ছিল এই চিঠিতে? তিনি লিখেছিলেন 'আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়েই আদি জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা ছিন্ন ক'রে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নূতন কোনও যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তাও নয়'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ফরমাস দিয়ে আর্ট হয় না, জনসাধারণের জন্য সৃষ্টি করো বললেই সৃষ্টি করা যায় না। এ-কথা সুভাষের চিঠিতেও ছিল—'আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি'। জীবনঘনিষ্ঠতায় সেই আনন্দ স্বত উৎসারিত হয়। জীবনের সঙ্গে আর্টের বিচ্ছিন্নতায় তাঁর বেদনা কবির বুকেও ক্ষণে ক্ষণে বেজেছে। এজন্যই তো তিনি মাঝে মাঝে কালোয়াতির গণ্ডী থেকে বহুদূরের লোকসংগীত ও বাউলগানের সুর এনে বসিয়েছেন তাঁর গানে। তাঁর সাহিত্য ও সংগীত চিন্তায় ফরমাস ও প্রযোজনের গোলামি খাটার বিরোধিতা করলেও 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' আপনাতে আপনি বিকশিত শিল্পের ভাবনাকে তিনি মুহূর্তের জন্যও প্রশ্রয় দেন নি। এজন্যই বোধহয় সুভাষচন্দ্রের চিঠি তাঁর ভালো লেগেছিল।

রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে তাঁর সানন্দ প্রাপ্তির কথা তিনি বারবার লিখেছেন। 'যৌবনের ব্রত' শীর্ষক এক ভাষণে ১৯২৮এ যৌবনারেণ্য স্পন্দিত কবিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ও টেনিসনের 'ইউলিসিজ' কবিতার Strong in will/To strive, to seek, to find and not to yield এর কথা স্মরণ করেন। যৌবনের কবিতারূপে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'র আস্বাদন এ-কবিতার প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে একটু অভিনব বৈ কী! এই কবিতার সংক্ষিপ্ত যে-সব রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত মূলপাঠের 'যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব। কে জানে কাহার কাছে'—এ-রকম পঙ্‌ক্তি তাতে বর্জিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের এই কবিতা আস্বাদন সমর্থিত হয় এই বর্জিত পঙ্‌ক্তিতে। যিনি যৌবনের প্রতিভূ, তাঁর দিক্ থেকে এই কবিতাকে যৌবনের কবিতারূপে গ্রহণ স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এই যৌবনের জয়গান গেয়েছেন। এই জয়গান উচ্চ গ্রামে বেজেছে বিশেষভাবে 'সুবজপত্র'— পর্বে। তারই কিছুকাল পরে যৌবনের আরেক কবি নজরুলের কণ্ঠ যৌবনের জাগ্রধ্বনিতে মন্দ্রিত হল। সাহিত্যের এই যৌবন বন্দনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজনীতিতে বিপ্লবী যৌবন 'আরামের শয্যাতল' শূন্য করে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ নিয়ে শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদের মধ্যে বেরিয়ে এল। সুভাষচন্দ্র সেই বিপ্লবী যৌবনের প্রতিনিধি। অন্তত কবির কাছে এভাবেই তিনি প্রতিভাত হন। নইলে তাঁর উদ্দেশে লেখা 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ যা শুরুই হয়েছে এভাবে—'সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের মতে বরণ করি', তাতে তিনি এ-সব কথা লিখতেন না—'ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে', 'বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি'। অবশ্য ভরে অনেকে যাঁদের সম্রাসবাদী বলেন, তাঁদের কথাই কবি এখানে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন। 'তাসের দেশ' গীতিনাট্য উৎসর্গ করার সময় বাঁধ ভেঙে দেওয়ায় অদ্ভুত

চঞ্চল যৌবনেরই দূত তাঁর 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র'কে উৎসর্গপত্রে লেখেন 'স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ। সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম— রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শান্তিনিকেতন, মাঘ, ১৩৪৫'। একত্রিশ বছর বয়সে লেখা 'একটা আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে ১৯৩৩এ প্রথম তিনি 'তাসের দেশ' রচনা করেন। তাতেই আরও কয়টি গান জুড়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় ১৯৩৯এ তিনি রাজনীতির কুটিলতায় অক্লান্ত সুভাষচন্দ্রকে তা উৎসর্গ করে আনন্দ পান। তার অর্থ এই নয় যে সেই কুটিল রাজনীতির ছাপ নাটিকায় পড়েছে। তা পড়তে পারে না। কেন না 'তাসের দেশ' ১৯৩৯এ লেখা নয়। এটির উৎসর্গে, 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রকে কবি সানন্দ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা কবির কাছ থেকে দেশনায়কের সানন্দ প্রাপ্তির কথা বলছিলাম। বাংলা থেকে বহুদূরে ব্রহ্মদেশে কারান্তরালে দিন কাটাতে কাটাতে তাঁর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথও বুঝি এরকম বিচ্ছেদ বিধুর চিত্তেই 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গান বেঁধেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে ঐ বন্দী জীবনে 'আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব?' লিখে 'গুরুগোবিন্দ' কবিতার ভাষায় লিখেছেন— 'এখনো কেবল নীরব ভাবনা,/কর্মহীন বিজন সাধনা,/দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা/আপন মর্মবাণী।/একা ফিরি তাই যমুনার তীরে। দুর্গম গিরি মাঝে।/মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,/মিশাতেছি গান নদী কলরোলে,/গড়িতেছি মন আপনার মনে,/যোগ্য হতেছি কাজে'। এই উদ্ধৃতি তাঁর লেখায় আরও অনেক জায়গায় আছে। এই কথাগুলি অনুমান করি বারবার তাঁর মনে পড়েছে মান্তালে ইনজিনে কারান্তরালে, য়ুরোপে চিকিৎসার সুযোগদানের নামে নির্বাসনে, কার্শিয়াঙে অন্তরীণ অবস্থায়, মহানিষ্ক্রমণের সময় পার্বত্য পথে। বরফজমা নদীতে, যুদ্ধব্যস্ত জর্মনীতে, সাবমেরিন যাত্রায় সপ্ত সিন্ধুতে, পূর্ব এশিয়ায় দশ দিগন্তে, ভারত-ব্রহ্মদেশের সীমান্তে অরণ্যে পর্বতবন্ধুর পথে। এ-কবিতার ভাষায় বলতে পারি, তিনিও সমুদ্র কল্লোলে তাঁর গান মিশিয়েছেন, পাষাণের পথে পথ চলতে চলতে পাষাণের দৃঢ়তা আয়ত্ত করেছেন, আপন মনে মন গড়তে গড়তে আপন কাজের যোগ্য হয়ে উঠেছেন।

শ্রীহরিচরণ বাগচীকে একটি চিঠিতে তিনি এই তরুণ স্বদেশব্রতীর পাঠ্য পুস্তকের একটি তালিকা পাঠিয়েছেন। তাতে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী', 'চয়নিকা', 'গীতাঞ্জলি', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা' এই কয়টি বইয়ের নাম আছে। তালিকাটি নানাজাতীয় বইয়ের নামে সমৃদ্ধ, তবে মনুষ্যত্ব ও দেশাত্মবোধ জাগানোর উপযোগী বইগুলি তালিকায় যথাসম্ভব স্থান পেয়েছে। কবির বই নির্বাচনও এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি করেছেন। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' দুটো উপন্যাসের কোনোটিই হিন্দুজাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত নয়। 'ঘরে বাইরে'তে দেখানো হয়েছে অসহযোগের পাঁচ বছর আগে স্বদেশী বস্ত্র শিল্প ব্যাপকভাবে গড়ে না তুলে বিদেশী বস্ত্র পোড়ালে সাধারণ মানুষের কষ্ট বাড়ে বৈ কমে না। অসহযোগ আন্দোলনে বিদেশী পণ্যবর্জনের আহ্বানের সঙ্গে এই উপন্যাসের মেলে না। 'গোরা'তো স্পষ্টত এই নামের মানুষটির হিন্দুভারত থেকে সর্বধর্মের মহাভারতে উত্তরণের কাহিনী। মহাভারত কবির কাছে 'মহামানবের সাগরতীর'। তাঁর ভারতবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের বিরোধ নেই। 'কথা ও কাহিনী'র কবিতায় দেশাত্মবোধ জাগানোর উপকরণের সঙ্গে মিশে আছে বিশেষ দেশকালধর্ম নিরপেক্ষ মানবধর্ম বোধ। তাসত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র যে পাঁচমিশালি কবিতা সংকলন 'চয়নিকা'র সঙ্গে তাঁর এক তরুণ সহমর্মীকে ওসব বই পড়ার কথা লিখেছেন, তাতে তাঁর চিন্তাভাবনার কিছুটা আভাস মেলে। অনেকসময় অন্যায়ের প্রতিবাদে বজ্রকণ্ঠ, হিন্দুত্বের গণ্ডী অতিক্রমী, সর্বভারতীয়ত্ববোধে উত্তীর্ন, সর্বসাধারণের সঙ্গে ইংরেজ শিক্ষার অভিমান কাটিয়ে একাত্ম হয়ে ওঠার আকাঙ্খায় ব্যাকুল গোরার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আত্মীয়তার কথা ভাবি। তিনি যে পানুবাবু নন, দেশকে ইংরেজি বিদ্যার চশমা পরে দেখেন না, ব্রাউনলো সাহেবের বশংবদ নন— এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় খণ্ডিত উপমহাদেশের উভয় ভাগে ক্ষমতা যাঁদের হাতেই ব্রিটিশ ১৯৪৭এ দিয়ে যাক্ না কেন, কার্যত ক্ষমতার ফলভোগী যে পানুবাবুরাই হলেন, বরদাসুন্দরীরাই পায়াভারি হলেন, গোরারা নেপথ্যে চলে গেল— তা তো স্বাধীনতার পরে জ্বলজ্যান্ত সত্য।

হিন্দু ভারতের অপর প্রান্তে আছে মহাভারত। য়ুরোপীয় অর্থে 'একজাতি, এক রাষ্ট্র' নীতিতে ভারতে একটি জাতি নেই, এখানে আছে মহাজাতি। এ-সব সত্য রবীন্দ্র চিন্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাই সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি যে-গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন কলকাতায়। তার নাম দেন মহাজাতি সদন। রবীন্দ্রনাথের মহাজাতির ধারণার সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এককেন্দ্রিক সংবিধান, সর্বাত্মক বা কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্র— কোনটাই এই মহাজাতির ধারণার সঙ্গে মানায় না। উৎপাদনে, ভোগে, বিপণনে কবি যে সমবায়ের কথা তাঁর 'সমবায়নীতি', 'পল্লীপ্রকৃতি'তে বলেছেন, তার মূল কথাটাই বিকেন্দ্রীকরণ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে আমরা ফ্যাশিজম ও কমিউনিজম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে লব্ধ এক সর্বাত্মক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষপাতী বলেই জানি। তার কারণ তিনি নিজেই এই ভাষায় তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ভারতবর্ষে শক্তিশালী একটি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনীতির আমূল পরিবর্তনের কথাও

যেমন বলেছেন তাঁর হরিপুরা ভাষণে, তেমনি স্থানীয় ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের কথাও বলেছেন। ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য, জাতীয় পরিকল্পনার সার্থক রূপদানের জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজন। আবার একই সঙ্গে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও প্রদেশগুলির সাংস্কৃতিক ও সরকারি কার্যে বহুল পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগদানও প্রয়োজন। এই দুটি পরস্পরবিরোধী ব্যাপারের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের মধ্যেই আমাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। হরিপুরা ভাষণের এ-সব ধারণা রবীন্দ্র-আদর্শ সম্মত। তাঁর মহাজাতির ধারণার অনুকূল। এ কথা সত্য রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র দু'জনেরই মধ্য ভিক্টোরীয় পার্লামেন্টারি ডিমোক্রেসির ভারতে সার্থকতা বিষয়ে সন্দেহ ছিল। এই সন্দেহ ভাষা পেয়েছে এভাবে 'পার্লামেন্টারি শাসনতন্ত্র: এ কি বিলিতি দাওয়াই থানা থেকে ভিক্ষে করে আনলেই তখনই আমাদের ধাতের সঙ্গে মিলে যাবে?'— পল্লীপ্রকৃতি। পত্রাবলী ৫। আরও গভীর বিশ্লেষণের ভাষায় সমবায় হতে তিনি যা লিখেছেন, তা দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতিযোগ্য এবং আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় বিশেষভাবে স্মরণীয়। '...যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেন না সকল রকম প্রতাপের প্রদান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতে পারে না। তাই 'য়ুনাইটেড স্টেট্স্'এ রাষ্ট্র চালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরী হয়, টাকার দৌরাত্মের সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না'। রবীন্দ্রনাথ তাই পার্লামেন্টারি ডিমক্রাসির বিকল্প খুঁজেছেন সমবায়ে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছে সমবায়কেও সার্থক করে তোলার জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ চাই, অন্তত কিছুকালের জন্য কতৃত্বমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চাই। নইলে সমবায়ের লাভের চিনি শোষক পিপীলিকার দল উদরসাৎ করে ফেলবে। যাই হোক্, কবি রবীন্দ্রনাথের পলিটিক্যাল থিয়োরি দেওয়ার কথাই ওঠে না। আবার সুভাষচন্দ্র সম্পর্কেও বলা যায় যে তিনিও কোন 'ইজম' বা 'বাদ' প্রতিষ্ঠা করেন নি। কেননা তিনি নিজেকে Pragmatist বলেই পরিচয় দিয়েছেন। তবুও দুজনের চিন্তার তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি'তে ওদেশের ব্যক্তি স্বাধীনতা দমন সুদৃষ্টিতে দেখেন নি। কমিউনিজমের আর্থিক দিকের উপর অধিক গুরুত্ব, জাতীয়তাবোধকে অস্বীকার, নাস্তিকতা ইত্যাদি অনেক কিছুই ভালো না-লাগলেও সুভাষচন্দ্র ব্যক্তি স্বাধীনতা দমনের প্রসঙ্গটি তোলেন নি। আবার ফ্যাসিজিমের উগ্র জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিক বিশেষ গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ববোধ পররাজ্যগ্রাসী উন্মত্ততা— এসবও তাঁর পছন্দ হয় নি। দুই ব্যবস্থার আরও কিছু ত্রুটির কথা তিনি বললেন। শিল্প প্রসারের জন্য মূল (Kcy) শিল্প, ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন, দেশের উপযোগী ক'রে যন্ত্রশিল্প ও কুটির শিল্পের পরিপূরক সম্পর্ক স্থাপন, উৎপাদনের উপায় গুলির রাষ্ট্রীয় মালিকানা ছাড়া দারিদ্র্য নিরসন তাঁর মতে সম্ভব নয়। 'রাশিয়ার চিঠিতে'তে রবীন্দ্রনাথ ওখানকার যন্ত্র নির্ভর ঐকত্রিক কৃষি ও গণ শিক্ষা ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করলেও এই দুটি কোন্ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কিভাবে সম্ভব হল, তার আলোচনা করেন নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে উপায় নিয়ে ভাবতে হয়েছে। কেন না তিনি রাজনীতির মানুষ। জাতীয়তার আবেগ কমিউনিজম যেভাবে অস্বীকার করে। সে ভাবে যে করা যায় না, একই কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন দেশের বিরোধের ফলে সাম্প্রতিক কালে কমিউনিজমের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা দেখে রাজনীতি বিশেষজ্ঞ না হয়েও তা বোধ হয় বলা যায়। সোভিয়েট রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা দীর্ঘকাল কমিউনিস্ট ব্যবস্থার থাকার পরও যেভাবে দেখা দিচ্ছে, তাতেও জাতীয়তাবোধের মূল্য নতুন করে অনুভূত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে, নাৎসিবাদেও ফ্যাসিবাদে পরিণত হয়, তার নিন্দা করলেও জাতীয়তার সদর্থক দিক্ অস্বীকার করেন নি। আবার অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদী হলেও আন্তর্জাতীয়তায় আস্থাবান। জাপানের চীন আক্রমণে ভারত থেকে Medical Mission পাঠানোয় জাপানি আগ্রাসনের নিন্দায় তিনি সক্রিয় ছিলেন। নবজাতক এর 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায় জাপানের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কবির বিক্ষোভ সুভাষ চন্দ্রেরও বিক্ষোভ। আবার বলি, তার কয় বছর পরে সেই জাপানের সাহায্যেই আজাদহিন্দ্ সরকার ও ফৌজ গঠন সত্ত্বেও এ তাঁরও বিক্ষোভ।

ভারতে National Planning বিষয়ে ভাবনা চিন্তায় ও কাজে কর্মে তিনি পথিকৃৎ। আসলে তাঁর কংগ্রেস সভাপতিত্ব কালে Planing Committee নিয়ে যে-বিরোধের সূত্রপাত্র হয় গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে, অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে এই বিরোধ ছিল একটি কারণ যার জন্য তিনি ত্রিপুরী কংগ্রেসে ১৯৩৯ এ গান্ধী পন্থীদের সমর্থন পান নি, অবশেষে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয় ও তারও পরে কংগ্রেস থেকে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গান্ধীজি সুভাষের পুনর্নির্বাচন মেনে নিন, এই অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ও আরেকজন প্রথম সারির নেতাকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জাতীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে ড. মেঘনাদ সাহা রবীন্দ্রনাথকে অবহিত করেন। কবি তাঁর স্নেহাস্পদ সুভাষের জন্য শুধুই ভালোবাসায় এই পুনর্নির্বাচন চাননি। আসলে কুটির

ও যন্ত্র শিল্পের দ্বন্দ্বে, স্বয়ম্ভর গ্রাম ভিত্তিক অর্থনীতি ও পরিকল্পিত কেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়িয়েছিলেন দ্বিতীয়পক্ষের পাশে। অথচ এই রবীন্দ্রনাথকেই সুভাষচন্দ্র তাঁর টোকিও বিশ্ব বিদ্যালয় বক্তৃতায় যন্ত্রশিল্প বিরোধী গান্ধীজির সঙ্গে এক বন্ধনীভুক্ত করলেন। সমকালীন মানুষেরা কবির আধুনিকতা যে ঠিক বুঝতে পারেন নি, তার আরেকটি দৃষ্টান্ত সুভাষচন্দ্রের এই বক্তৃতা। তিনি তাঁর হরিপুরা ভাষণে ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। জন্ম নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম পদ্ধতি সম্পর্কে এই আন্দোলনের নেত্রী ম্যাডাম মার্গারেট স্যাংগার গান্ধীজির মত জানতে চাইলে মহাত্মাজি ব্রহ্মচর্যের কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম পদ্ধতিকে পর্যন্ত সমর্থন করেন। তাঁর মত জানিয়ে ম্যাডাম স্যাংগারকে চিঠি দেন। এ বিষয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ-সব তথ্য সুভাষচন্দ্রের জানা বা মনে থাকলে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজিকে গতযুগের প্রতিনিধি বলে এক শ্রেণীভুক্ত করতে পারতেন না। এমনকি স্বাধীনতা বা শান্তির জন্য কবি প্রয়োজনীয় অপরিহার্য হিংসার পক্ষেও ছিলেন। তার অভ্যন্তর প্রমাণ তার কবিতা ও নাটক থেকে সন্ধান করা যায়। যে 'বিপুল-বীর্য শান্তি'র কথা সুভাষচন্দ্রের বন্ধু ভারততত্ত্ববেত্তা চেক অধ্যাপক লেসনিকে পাঠানো 'নবজাতক' কাব্যের 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায় তিনি বলেন, সেই 'বিপুলবীর্য অহিংস ব'লে আমরা ভাবতে পারি না' কিন্তু এই প্রসঙ্গ বিস্তারের অবকাশ এখানে নেই।

আর শুধু সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণ অর্থাৎ এলগিন রোডের বাড়ি থেকে রাত্রির অন্ধকার বেরিয়ে পড়ার পর কবির প্রতিক্রিয়ার কথা ব'লে এই প্রবন্ধ শেষ করি। যাঁকে তিনি স্নেহে ভালোবাসায় বিরোধীদের সর্পিল আচরণের দিনগুলিতে ভরে রেখেছিলেন। স্বভাবতই তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনায় তাঁর উৎকণ্ঠায় সীমা ছিল না। শরৎচন্দ্র বসুকে তিনি টেলিগ্রাম করেন। শরৎচন্দ্র অন্যদের সত্যের আভাস না দিলেও কবিকে জানিয়েছিলেন সুভাষ যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি কবির আশীর্বাদ পাবেন, গান্ধীজিকে তাঁর উৎকণ্ঠার উত্তরে লিখেছিলেন যে সুভাষ সন্ন্যাসের পথে বলে মনে হচ্ছে। পরে শরৎচন্দ্র বসু সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে গেলে কবির আন্তরিক উৎকণ্ঠা দেখে তিনি সত্য কথাই বলেছিলেন। শরৎচন্দ্রের কাছে তিনি অনেকটুকু সত্যই জেনেছিলেন— আফগানিস্থানের পথে বার্লিন পৌঁছোনো পর্যন্ত। সত্য জানার একটি পরোক্ষ সাক্ষ্য আছে ১৩৪৮ সালে (১৯৪১) গ্রীষ্মকালে কালে লেখা ও 'প্রবাসী'র আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বদনাম' গল্পটিতে। এ-গল্পের অনিল মিত্তিরও রবি ঠাকুরের 'আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে' মুখস্থ ব'লে পুলিশ ইন্‌স্পেকটর বিজয়বাবুকে বলে ওঠে— 'এই গান অনেকবার গেয়েছি। আবার গাইব, তারপরে চলব আফগানিস্থানের রাস্তা দিয়ে, যেমন করে পথ করে নেব'। আমাদের অনুমান। শরৎচন্দ্র বসুর কাছে যা তিনি শুনেছিলেন, তারই সাহিত্যেক পরোক্ষ প্রকাশ ঘটেছে এখানে। আরও আশ্চর্য যে এই ছোট গল্পে অনিল মিত্তির সম্পর্কে এমন কিছু কথা আছে যা পরে দেশবাসী সুভাষকে নিয়ে যা করেছে, তার সঙ্গেও মেলে। অনিল মিত্তির 'লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে— ও একজন সিদ্ধ পুরুষ, বাবা ভোলানাথের চিহ্নিত'। সুভাষচন্দ্র নিজে এমন বিশ্বাস না জন্মালেও দেশবাসী এমন বিশ্বাস করেছে। এই গল্পে 'মোচ কাঠিতে ঐ পায়ের চিহ্নের (অনিল মিত্তিরের পায়ের চিহ্ন) উপরে মন্দির বানাবে বলে একজন ধনী মারোয়াড়ি ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বসেছে'। 'হিন্দুধর্মের পাহারাওয়ালারা হাংগার স্ট্রাইকের ভয় দেখতে থাকে' বলে 'বদনাম' গল্পের ইন্‌স্পেক্টর যা বলেছেন, সেই পাহারাওয়ালাদের উপদ্রব বছরের পর বছর খণ্ডিত স্বাধীন এই উপমহাদেশের প্রতিটি অংশ সব ধর্মের নামে ক্রমবর্ধমান। অনিলমিত্তিরদের সিদ্ধপুরুষের আসনে বসিয়ে এ-দেশের বীরপূজায় আবিষ্ট নিবীর্য মানুষ প্রতিযুগে সুখনিদ্রার আয়োজন করেছে। সে-আয়োজন মহাত্মাগান্ধীকে নিয়ে যেমন হয়েছে, তেমনি নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে ঘিরেও চলেছে। অনিলমিত্তিরের মতো ছোটোমাপের একজন বিপ্লবী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎকালে তাঁর 'কল্যানীয় সুভাষচন্দ্র'কে নিয়ে এ-দেশের মানুষ যা করবে, তারই আভাস রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজ্ঞাতসারে এই 'বদনাম' গল্পে দিলেন। আরেকটি আভাসও আছে। স্বদেশের বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত অনিল মিত্তিরদের 'বদনাম' জোটে। সুভাষচন্দ্রেরও বদনাম অনেক জুটেছে। বদনামকে যিনি সুভাষচন্দ্রের ললাটে তিলক ক'রে পরিয়ে দিয়েছেন, দেশে ফিরলে যে কবি বেঁচে থাকলে আবার সেই তিলক পরাতেন, তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ।

ঋণস্বীকার— এই প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী', সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র', পবিত্রকুমার ঘোষের 'সুভাষচন্দ্র', নেপাল মজুমদারের 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র', শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং', সমর গুহের 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র', সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী, Correspondence (1924-32), Netaji Research Bureau-র Netaji Collected Works কৃষ্ণা বসুর 'ইতিহাসের সন্ধানে', 'রবীন্দ্ররচনাবলী' ও সর্বোপরি জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ রচনাবলী'র সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 'বদনাম' গল্পের অনিল মিত্তিরের আফগানিস্থানের পথে দেশ ছাড়ার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের মিলের প্রতি প্রথম বর্তমান লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রয়াত অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু। □

সাম্প্রদায়িকতা রোধে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

শান্তিময় রায়

ভারতের রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র বোস এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং অত্যন্ত ব্যাতিক্রমি ও গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন যিনি গান্ধীজি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কাজ করেছেন। এই দুই জনের সঙ্গে কাজ করার ফলে তাঁর একটা বিশেষ মানসিকতা তৈরি হয়েছিল যার প্রভাবে শুধু বাঙালির কাছে নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মানুষের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু হিন্দুদের কাছে নয়, মুসলমানদের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল অবিসংবাদী। সুভাষচন্দ্রের এই দিকটিও আমাদের আলোচ্য বিষয়।

শুরুতেই তখনকার পরিস্থিতির দিকে তাকানো যেতে পারে। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর দেশের প্রথম সারির নেতারা বন্দি হলেন। মালাবার বা আন্দামান জেলে বহু নেতাকে নির্বাসন দেওয়া হ'ল। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নানা প্রদেশে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তরুণেরা বিক্ষিপ্ত চেষ্টা চলাচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলনও নানা জায়গায় একটু একটু করে দানা বাঁধছে। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) প্রভাব এসে পড়ছে বুদ্ধিজীবী ও যুবকদের উপর। ইংরেজ সম্বন্ধে ভয় ভীতিও ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন জেলে এই সব ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

১৯২৭ সালে নেতাদের মুক্তিলাভের পর ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা কংগ্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেখানে সুভাষ বসু জি.ও.সি হন। যুব মানসের ওপর তার একটা ছাপ পড়ে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা দিশা যুবকরা লাভ করল। এই পথে, অর্থাৎ চরম সামরিক অনুষঙ্গ সুভাষ বসু যুবকদের মনে সৃষ্টি করলেন। এই মডেলে সুভাষ বসু সংগঠন করার চেষ্টা করেন। এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিল বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স বাহিনী যারা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি সমর্থন লাভ করেছিলেন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের কাছ থেকে যিনি ছিলেন 'যুগান্তর' পার্টির নেতা। সুভাষচন্দ্রের একটি বই সে সময় তরুণদের মনে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। বইটির নাম 'তরুণের স্বপ্ন'। এই কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষ বসুর সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যোগাযোগ করতে আরম্ভ করলেন। বাংলার বিভিন্ন জেলায় তিনি সংগঠন গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন। এই সংগঠনগুলি একেবারে গোপন সশস্ত্র বিদ্রোহের পথেও নয়, আবার পুরোপুরি গান্ধীবাদী ধারার কংগ্রেস পথেও নয়, সম্পূর্ণ নতুন 'মডেলে' তিনি গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। এই ভাবে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ একজন ভিন্ন জাতের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ইতিহাসের বিধাতার হাতে গান্ধীজিরই প্রতিদ্বন্দ্বীতে রূপান্তরিত হলেন। যদিও ইতিহাসে এই রকম মধুর শ্রদ্ধাবনত চিত্তের প্রতিদ্বন্দিতা খুবই বিরল ঘটনা।

খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। বাংলার অনেক নেতা এবং বুদ্ধিজীবী এই সময় মুসলমানদের সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু সুভাষ বসু কখনও সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপট বিসর্জন দেন নি। হিন্দু ও মুসলমানকে সর্বাগ্রে ভারতীয় হিসাবেই বিবেচনা করতেন। উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু নেতার পক্ষে এটা কিন্তু সে যুগে মস্ত বড় ব্যাপার। সর্বভারতীয় রাজনীতির স্বার্থে তিনি মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান জনগণের কাছে সুভাষ বসুর একটা বিশ্বাসযোগ্যতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। চিত্তরঞ্জনের সমস্ত Heritage সুভাষচন্দ্র যে ভাবে বহন করেছেন ভারতের রাজনীতিতে কোনও প্রথম শ্রেণীর নেতা তাঁর গুরুর

heritage তাঁর মতন বহন করেন নি। চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজপার্টি ছিল হিন্দু মুসলমানদের মিলনভূমি। তাঁর 'বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৪)' মুসলমানদের মধ্যে যে উৎসাহ ও বিশ্বাস উৎপাদন করে ছিল তা তো ইতিহাস। কংগ্রেসের ও বিভিন্ন দলের হিন্দু নেতারা এই বেঙ্গল প্যাক্টের নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর যোগ্য শিষ্য সুভাষচন্দ্রের সহায়তায় ভারতের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করার প্রয়াসে বিন্দুমাত্র বিরতি দেন নি। স্বরাজ দল ও 'বেঙ্গল প্যাক্ট' শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুর পর শক্তি হারাল। কিন্তু তৈরি করে গেল এক অসামান্য মানবিক শক্তি যার প্রতীক হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। মুসলমান জন সমাজ অনাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও বাংলার সুভাষকে তারা ভালবেসে ফেললেন। বাংলার মুসলমান সমাজ মনে করতেন চিত্তরঞ্জন দাশের পরই সুভাষচন্দ্রই হচ্ছেন তাদের ভরসা।

কলকাতা কংগ্রেসের (১৯২৮) পর সুভাষচন্দ্রের প্রভাব স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পেল। এই সময় অনেক মুসলমান নেতা তাঁর পাশে আসেন। তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবের একজন বিখ্যাত নেতা ডঃ আলমের নাম উল্লেখ করা যায়। মুসলমান যুবকদের উপর তাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল। ডঃ আলম সুভাষচন্দ্রকে ভবিষ্যতের নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া ডঃ আনসারি, ডঃ কিচলু প্রভৃতি ব্যক্তিরা সুভাষচন্দ্রের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন বেশি। যদিও এঁরা গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা করতেন তবু সুভাষ বসুই হচ্ছেন এঁদের ভবিষ্যৎ নেতা। সুতরাং বলা যায় এই পরিস্থিতিতে সুভাষ বসু কলকাতার কংগ্রেসেই মুসলমান সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করলেন নির্দিষ্ট পথে ও সংগ্রামের লক্ষ্যে।

এই সংগ্রামের লক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এখন এই সব শ্রমিক সংগঠন গুলিতে বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের সংস্পর্শে সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে মুসলমান শ্রমিকরাও সে ভাবে পেলেন। এদিকে কংগ্রেসে ও তার বাইরে মদন মালব্যের প্রভাব মুসলমানদের বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দিল। তারা ভাবলেন সুভাষ বসুই তাদের বিশ্বে ভরসা। তিনিই তাদের কাছাকাছি আছেন।

কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে তারা সমর্থন করলেন। বামপন্থীদের কাছাকাছি আসাটাও সুভাষচন্দ্রের গ্রহণযোগ্যতার আরও একটি কারণ, যদিও বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রকে যে ভাবে সাহায্য করেন নি।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে জিন্না তখনও মুসলমানদের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন নি, বা বলা যায় সমগ্র মুসলিম জনমানসকে ভুল পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হন নি। তাঁর কোন সংগ্রামী কর্মসূচি বা লক্ষ্য ছিল না। সৌকত আলি, মহম্মদ আলির পর থেকেই জিন্না ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেন। এবং মুসলমানদের কংগ্রেসের প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সুভাষচন্দ্র ততদিনে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন। মুসলমানরা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পেলেন একজন শ্রমিক নেতা, কৃষক নেতাকে। এই ভাবে তিনি একদিকে বিপ্লবী আন্দোলন, একদিকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আর একদিকে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন এই তিনটি ধারা সমন্বিত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর ফলে মুসলমান সমাজে তাঁর একটা মর্যাদার আসন স্থাপিত হল।

আসলে চিত্তরঞ্জনের যে mantle তাঁর ওপর পড়েছিল তা নিয়ে তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন। হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন জেলা সম্মেলনগুলিতে, ফৈজাবাদে হরিপুরা (১৯৩৮) সম্মেলনে সুভাষ বসু যে সব ভাষণ প্রদান করেন তা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হবার চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যেই বিবৃত। মুসলমান জনগণের সমর্থনই বিপুল ভাবে সুভাষ বসুকে ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে চিহ্নিত করে দিয়েছিল।

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, আলী ভাই এঁরা ছিলেন কংগ্রেসের বিধায়ক এবং সদস্য উকিল। কিন্তু এঁরা ছিলেন সুভাষপন্থী। তখন রাজনীতিতে জে.সি. সেনগুপ্ত ও সুভাষ বসুর নেতৃত্বে দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু মুসলমান বিচ্ছেদের রাজনীতি তাঁরা কেউ করেন নি। নাসিরুদ্দিন মিঞা, রাজিয়া খাতুন, ডঃ আলম, ডঃ কিচলু, ডঃ আনসারি প্রভৃতি ব্যক্তিরা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর কাছাকাছি। ময়মনসিং জেলা, ফরিদপুর জেলা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমান নেতারা সুভাষ বসুর কাছে আসেন। জালালুদ্দিন, ইত্রাহিম-এর মতন নেতা ও জমিদারও ছিলেন সুভাষ অনুগামী। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গেও সুভাষ বসুর সুসম্পর্ক তাঁকে মুসলমানদের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর অবদানও অপরিসীম। অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে বলা যায় বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মুসলমান রাজনৈতিক কর্মীরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে (১৯৩৮) গান্ধীজি একদিকে চলে গেলেন আর গান্ধীজিকে বাদ দিয়ে মুসলমান কর্মীরা সুভাষবসুর দিকে চলে গেলেন। হরিপুর, ত্রিপুরী, রামগড় কংগ্রেসে আমাদের মতন বামপন্থীঘেঁষা কর্মীরাও মুসলমানদের মধ্যে সুভাষ বসুর জনপ্রিয়তায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে জিন্না ভারতীয় মুসলমান সমাজে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা দ্বিজাতি তত্ত্ব ভারতের রাজনীতিতে বিভেদের বীজ বপন

করেছে। ধর্মকে ভিত্তি করে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব সে সময় কম্যুনিস্টরাও সমর্থন করে বসেন। খুব সংক্ষেপে কাজ সারার জন্য অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্যেই কমিউনিস্টরা এই কাজ করলেন। এটা তারা ভুলই করেছিলেন এবং এই কাজের জন্য তাদের সমালোচনা না করে উপায় নেই। সুভাষ বসু জিন্নার তত্ত্ব সমর্থন করেন নি। ভারতভাগও তিনি তীব্র ভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। এই সময় কমিউনিস্টদের উপর সুভাষ বসু বিরক্ত হয়ে ছিলেন। কমিউনিস্টরা এই ভাবে মুসলমানদের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছিলেন। সুভাষ বসুর অন্যান্য এটাই যে তিনি সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য সার্বিক আদর্শকে বিসর্জন দেন নি।

সুভাষ বসু অবশ্য জিন্নাকে এ ব্যাপারে বিশেষ বোঝাবার বা চাপ দেবার চেষ্টা করেন নি। কারণ বাস্তববাদী সুভাষ এটা বুঝে ছিলেন যে জিন্নাকে এ ভাবে বুঝিয়ে তাঁর পথ ও মতের পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। তিনি ছিলেন আদ্দোলনে বিশ্বাসী। এছাড়া ততদিনে তাঁর মনও তৈরি হয়ে গেছে সশস্ত্র বিপ্লব বা বিদ্রোহের মাধ্যমে দেশের মুক্তির বিশ্বাসে। আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে নিজেদের শক্তির প্রভাব দেখিয়ে যদি কিছু করা যায় এটাই ছিল তার চেষ্টা। খুব একটা তত্ত্ব কথায় সময় ব্যয় তিনি করেন নি।

সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগত ভাবে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বটে কিন্তু তাদের সমাজের কথাবার্তা চালচলন ইত্যাদিতে অনেক সময়ই তিনি বিরক্তবোধ করতেন—এটাও অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি। ধর্ম নিয়ে কুসংস্কারের চর্চার তিনি বিরোধী ছিলেন। অথচ ধর্ম ছিল তাঁর চরিত্রের মূল ভিত্তি। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর ধ্যানের পুরুষ। সিঙ্গাপুরে চেট্টিয়ারের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে আমন্ত্রিত হয়েও সুভাষ বসু যেতে চান নি যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর মুসলমান সহযোগীদের সেই মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত চেট্টিয়ার সুভাষের কথাই মেনে নিলেন।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (INA) মধ্যেও তিনি জাতপাত ধর্ম নিয়ে বাছবিচারের প্রশ্রয় দেন নি। সচেতন ভাবে তা দূর করারও চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ এদের ঐক্যবদ্ধ করে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায় তার একটা আদর্শ তৈরি করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। প্রাত্যহিক জীবন চর্যায় এর প্রতিফলন থাকতে হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে খাবার টেবিলে সকলকে একসঙ্গে বসে খাবার প্রথা তিনি চালু করেছিলেন। এটা তিনি করেছিলেন এবং ধর্মের গণ্ডী পেরিয়ে একটা অভিন্ন আদর্শের ভিত্তি তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। 'জয় হিন্দ' প্রবর্তন করেও তিনি সকল ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্য সম্ভাষণ প্রথা চালু করেছিলেন। মুসলমানদের এই ভাবে কাছে টানার চেষ্টা করেছেন। তারাও এটা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

আই.এন.এ (INA) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি নিরপেক্ষতার একটা প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ১৯৪৬ এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে আই.এন.এ-ও সুভাষ বসু দেশের মানুষের মনে একটা নতুন জোয়ার আনেন। আই.এন.এর আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। হিন্দু ও মুসলমান নতুন করে ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছিল। আসলে এইটেই ছিল ভারতের সাম্প্রদায়িক, ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতা ও ইংরেজদের ভয়ের কারণ। সুভাষ বসু উপস্থিত থাকলে এই জোয়ার অন্য খাতে প্রবাহিত হতো।

সুভাষচন্দ্র কোন নির্দিষ্ট তত্ত্ব নিয়ে তেমন সময় নষ্ট করেন নি। তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সহজভাবে নানা লেখা ও দু-একটি গ্রন্থে বুঝিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে দুটি আত্মজীবনী। An Indian Pilgrim (১৯৪৮) ও The Indian struggle (১৯২০–১৯৪২)—এই দুটি গ্রন্থে তাঁর কিছু মৌলিক চিন্তা ভাবনার সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন বক্তৃতা ও চিঠি পত্রের মধ্যেও আমরা তাঁর ভাবনার সন্ধান পাই। তাঁর সমস্ত চিন্তাই ছিল একটি সূত্রে গ্রথিত। তা ছিল দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন। হিন্দু মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় দেশ স্বাধীন করাই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

হিন্দু ও মুসলমানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করার যে চেষ্টা ইংরেজ নানা আইনের মাধ্যমে ১৯০১, ১৯১১, ১৯৩৫-এ করেছে সুভাষ বসু এ সমস্তকে ছিলেন শংকিত। তাই প্রথম থেকেই এই ভেদ বুদ্ধির রাজনীতি ও কর্ম কাণ্ডের তিনি ছিলেন বিরোধী। মুসলমানদের অনেকেই এই সব পছন্দ করেও সুভাষ বসু তা পছন্দ করেন নি। তৎসত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের গোটা কর্মধারার পেছনে মুসলমানদের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। কারণ তাঁর কর্ম জীবন ও ধ্যান ধারণা মুসলমানদের প্রত্যয়ের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে আসে নি।

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন হয় যেখানে হিন্দু মুসলমানদের নিয়ে গঠিত একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই জন্য তিনি দেশব্যাপী সংগ্রামেরও আহবান দিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালের জুলাইতে অন্ধকূপ হত্যা স্মৃতি স্তম্ভ বা হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি আন্দোলন হিন্দু মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল।

হিন্দু ও মুসলমানকে ভারতীয় হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করার পথ যদি খুঁজে বের না করা যায় তাহলে দেশ স্বাধীন হতে পারে না বা যথার্থ স্বাধীনতা আসতে পারে না একথা সুভাষচন্দ্র

জীবন দিয়ে বুঝিয়ে ছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ চিত্তরঞ্জন এর কর্ম পন্থা ও দৃষ্টিকোণকে যে মানসিকতা নিয়ে সমর্থন করেছিলেন সাধারণ ভাবে মুসলমানরাও সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছেন। সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাশ একথা নির্দ্বিধায় বলেছিলেন: "হিন্দুরা যদি উদারতার দ্বারা মুসলমানদের মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে না পারে তবে হিন্দু মুসলমান ঐক্য আসিবে না। হিন্দু মুসলমান ঐক্য ব্যাতীত আমাদের স্বরাজের দাবী চিরকাল কল্পনার বস্তু থাকিয়া যাইবে।" এই ভাবধারাই চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর সুযোগ্য শিষ্য সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। এটাই মূল কথা যা সুভাষচন্দ্রকে কোন দিনও অন্যাভাবে অন্য পথে চালিত করে নি। যাদের জন্য এই ভাবনা, সেই মুসলমান সম্প্রদায় ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। এবং ঠিক মনটা ধরতে পারা বা বুঝতে পারা সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে এটাই ছিল মুসলমানদের কাছে তাঁর গ্রহণ যোগ্যতার একটি কারণ।

আজকের ভারতে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা খুব বেশি। ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় গান্ধীজি বলেছিলেন সুভাষের কথা, আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা। "সুভাষের আজাদ হিন্দ বাহিনী আমাদের জাতীয় আন্দোলনের উপর প্রভাব রেখেছিলেন। আমি কারও জন্মদিন পালন করি না। আমার জন্মদিনের কথাও মনে রাখি না। কিন্তু আজ এমনই একজনের জন্ম দিন যিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়েছেন দেশের মুক্তির জন্য, জাতির জন্য। কি অপূর্ব জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছেন সুভাষ। আমি আমার দেশবাসীকে বলছি তোমরা সুভাষের দেশপ্রেম ও তার জাতীয় ঐক্য ও আদর্শ অনুসরণ কর।"

এই ভাষণের কয়েকদিন পরই জাতির পিতা শহীদ হলেন। আজও তাঁর বাণী, আমরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি, তাদের হৃদয়ে অনুরণিত হয়। □

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ পত্রিকার জন্মের অর্ধশতবর্ষ স্মরণে

ড. অশোক মিত্র সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ ''চতুরঙ্গ' থেকে প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। মোট তিনি খণ্ডে এই সংকলন গ্রন্থ সম্পূর্ণ হবে।

দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত এই সংকলন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মূল্য— ১৭০ টাকা,

প্রাপ্তিস্থান: দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩

চতুরঙ্গ দফতরেও পাওয়া যাচ্ছে।

৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩, ফোন—২৭-৬৩২৭

অকৃতার্থতার তৃপ্তি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বৈরোচন:
অংশত তাঁর নিজস্ব ঈশ্বরীর সঙ্গে আশ্লেষরত
বাঁ-হাতে পদ্মটাকে অনিশ্চিত ভাবে ধরে আছেন

অবলোকিতেশ্বর
সমস্ত দিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি, অথচ
ষোলোটা মুণ্ডু আর সহস্র হাত নিয়ে তেমন কিছুই করে উঠতে পারছেন না

বজ্রপাণি:
ওলিম্পিকের বাঘা দৌড়বীরদের এক লহমায় পার হয়ে যান
আজ তাঁর আরগ্রাইটিস

তিনজনেই
একযোগে আমায় আশীর্বাদ করতে এলে পদ্মের উপর
হুড়মুড়িয়ে পড়ল দেবালয়ের পেল্লাই ঘন্টা, সেই সুযোগে
বৈরোচনের অর্ধাঙ্গিনী অবলোকিতেশ্বরের দিকে চলে গেলেন
আর বজ্রপাণি ঈর্ষাদগ্ধ হয়ে আমাকে তাঁর করুণার
অন্তর্গত করে নিতে পারলেন না

এই প্রথম বৌদ্ধধর্ম নিতে গিয়েও পারলাম না দেখে
গলির মোড়ে সমস্ত মেরুর মৌলবাদীদের সে কী উল্লাস।
তাঁদের মধ্যেও তাহলে ঘোরতর মৈত্রী নির্মিত হচ্ছে!

সূর্যস্তোত্র

অলোক সরকার

শিশির সিঞ্চিত মাটি। যেমন হবার কথা
শিউলি ঝরেছে অহিসাব। তুমি এইবার
সূর্যস্তোত্র বলো। যা কিছু প্রতিদিনের
যা কিছু নিশ্চিত, অর্থাৎ যা কিছু প্রথম,
স্বাভাবিক নিয়মনিবেশ তা কি বন্দনীয় নয়!
যেমন শিউলি অপরিবর্তন সাজ
সাদা পাপড়ি বোঁটার দিকের বাসন্তিকা।
বলো সূর্যস্তোত্র বলো। পূর্বগগন ভরে
নবীন অরুণ আবির্ভাব কত স্থির বধির নির্মল
স্নেহস্পর্শ রাখে যেন মাতৃদৃষ্টি নিকট বুকের জন—
নেই কোলাহল নেই আবেগ-বিহ্বল অতিরেক,
আমরাও বন্দনার স্তবগান ধীর লয়ে বলি।
সারাটা পৃথিবী বলে শিশির-সিঞ্চিত মাটি বলে
বলে সুপ্ত-বিকশিত পুষ্প, বলে অমল কিরণ ধ্বনি—
ওই ধ্বনি স্পর্শ করে মেঘ, সুনীল আকাশ চরাচর।

অসামাজিক

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

সূর্যতোরণের নীচে প্রদর্শনী
তবু তারা দেখা যায়—এত কালো যোগেনের কালো।
দ্বাররক্ষী জামবন, তারও কিছু লুপ্ত অন্ধকার—
সবশুদ্ধু ছিটকে আসে
বুজে যায় চোখ—কালো এত দীপ্র কবে?

পাশেই মন্দিরে হাসে শাদার দাপট, সেও তীব্র
ছাঁকা দেয় পাথরের মোম, বলে ওঠে—
তুমি কি অসামাজিক?
অবিন্যস্ত বিজিত কেশর নিচু করে বলি—অবিচার।

ওপারে কীসের লাল? ডাকঘর পার হয়ে
ধুলোয় দাঁড়াই, শান্ত।
এই তো পাঁশুটে বর্ণ, পিপুলের গায়ে শাদাকালো
ধুলোপাতা, চটাওঠা আকুলের মাথানিচু বাড়ি
শূন্য ঘর। পথের বালাই চেনা-চেনা।

কাকে বলি—বাঁচো দীর্ঘ, যুদ্ধ করো ধুলোর আড়ালে
বুকের বাঁদিকে পাম্প রয়ে গেছে তেজি?
শূন্য ঘর, অপেক্ষায় থাকো। পদচিহ্ন, পথ
থাকো আরও কিছুদিন প্রতারণাহীন।

গায়ত্রী

রাজলক্ষ্মী দেবী

না-ই হ'লে সাবিত্রী বা সীতা—
তুমিও তো পুরুষ সাধিতা,
উপভোগে নয়—তবু, যোগে।

গায়ত্রী, ব্রহ্মার বাকচাতুরী,
মন্ত্রস্বরূপিনী বিদ্যাধরী,
পুরুষপ্রধান মর্ত্যলোকে।

তুমি কি উৎসর্গ-করা হবি,
ছন্দোবদ্ধ নগ্ন নারীছবি
প্রজাপতি ঋষির পশ্চাতে।

পুরুষের বিধান অমোঘ,
অনুচ্চার্য গায়ত্রীর শ্লোক
নারীর অশুদ্ধ রসনাতে।

গায়ত্রী, তোমার লজ্জা তবে
কোন্ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হবে?

কেউ আমায় বলুক

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝড় জল চোঁয়ায় না বার দেয়ালে।
রোদ আর তারার লেখা ধরে জাগে পুবের জানলা।
একফালি চলা-পথ পাক খায় ঘর ঘুরে।
পুরোনো দোতারার মতো বাজছে ঘরণী, এককোণায়
মাথা গুঁজে সুর বাঁধছে গগন হরকরা—

কেউ আমায় বলুক: আছে, আছে।

মেঘ আকাশের নীচে ভার কালো দিন,
ঈশ্বরের নিশ্বাস লাগছে যেন গূঢ় হয়ে।
যেন এখুনি ফুঁ দেবেন খেলাচ্ছলে—হাওয়াবাতাসের
শিরাজালে আহ্লাদ বয়ে বয়ে উঠছে—
গাছ বাড়ি টেলিগ্রাফ তার, সে লোকটাও
জানলার এপিঠে মুখ বুক ধুয়ে ধুয়ে
নিরুপম নীল হয়ে হয়ে উঠছে—টের পেয়ে
চেঁচিয়ে উঠবে: কেউ আমায় বলুক একবার!
ঘর ভরা সারা রাত তারা জোনাকির গুঞ্জন
যেন পুরোনো ঘরণীর মতো বাজছে, কোণা দিয়ে
মাথা গুঁজে সুর বাঁধছে গগন হরকরা—

কেউ আমায় বলুক: আছে, আছে—

শান্তি-প্রস্তাব

উত্তম দাশ

তোমার এক কাপড়ে দেশত্যাগ আর স্বপ্নের স্বাধীনতার মধ্যে
অকথা রক্ত—এ সবই আমার।

মেঠো-পথের স্কুল, আর গান গাইতে খুব, এসব সঞ্চয়
আমাকে তুমি দাও নি, বাঁচতে বলেছ অনেক দিন
কিন্তু বাঁচা শব্দের অর্থ কখনো বলনি আমাকে,
অঙ্কের মতো আমার শব্দার্থের জ্ঞানও খুব কাঁচা,
জীবন খরচ করে হৈচৈ বাধানো গেল
আর ভুল শব্দের পথ ধরে অনেক হাঁটা হলো, কিন্তু তোমার
গন্ধের বাগান আর সেই চাঁদ ডুবে যাওয়া ধান-কাটা মাঠের
অন্ধকার তেমন জানা হলো না, ঝুম বৃষ্টিতে
তুমি ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরছো, এই সব দৃশ্যের অলৌকিক
আমায় দাওনি, স্বাধীনতার জন্যই তো তোমার
এক কাপড়ে দেশত্যাগ, খুব সন্দেহকাতর ছিল
সেই সব অভিযান, একটা দেশকে এমন করে কাটলে,
খুব রক্তের উৎসব হলো, আর আমরা
ঘর ভেঙে পথেই বসলাম চিরদিন—এসব যন্ত্রণার
কথাও তুমি কখনও বল নি।

সেদিন তোমার ভাঙা তোরঙ্গে
সমাজিক-নিরাপত্তা নামে দুটি শব্দ পাওয়া গেল,
পুরানো অশোকস্তম্ভের মতো বেশ জমিয়ে রেখেছ,
কেমন রহস্যজনক ছিল তোমাদের ভালোবাসা
সন্ততির দুধভাত খুব উতলা করতো, অথচ আমাদের
যুদ্ধের পোষাকগুলো লুকিয়ে ফেলে একটা সাদা পতাকা
তুলে দিলে হাতে, অনেক উড়িয়ে হাতে ব্যথা ধরে গেল,
আচ্ছা বলতো—এত শান্তি
আমি কোথায় রাখবো?

পদ্যের ঢিল

সৈয়দ কওসর জামাল

ঘড়ির কাঁটার মতো এগোয় তোমার দিকে মহাজাগতিক প্রেত,
এত ধীর পায়ে

জানতেও পারছো না কিছু, এমন ধার্মিক তুমি, মৃত্যুগণনায় থাকো
অক্ষের ভিতর।

সময়শলাকা সে তো, এই মোহভ্রান্তি থেকে চেয়েছো অর্জন করতে
পচা অমরতা

আসলে তো সার্কাসের উঁচু তাঁবু, অবিকল ট্রাপিজের খেলা, নীচে
ক্লাউনেরা ঘোরে।

গোলোকশূন্যতা ঘেরা অস্তগামী সৌরকলা, লাফাবে কোথায় তুমি
প্রহরা বিহীন?

সার্বিক ধ্বংসের আগে বার্তাবহ এই শেষ অক্ষরবৃত্তের সারি
মাথার ভিতরে!

প্রেতেরা সন্ত্রস্ত খুব, টের পায় কোথা যেন রাত্রির মানচিত্রভাঙে
আকাশ আড়ালে

স্থবিরতা চেয়ে দেখে চটকানো পদ্যের ঢিল কী গভীর ঢেউ তোলে
মৃত্যু-জলাশয়ে।

সেতুগুলি ভেঙে পড়ছে

মেঘ মুখোপাধ্যায়

উচ্ছন্ন পাতায় পথ ছেয়ে গ্যাছে
পৃথিবীর সেতুগুলি ভেঙে পড়ছে আজ রাত্রিবেলা
নিজের শহরে গ্রামে ভয় করে নিতান্ত দুপুরে
নিজের উঠোনে নেমে চমকে উঠতে হয়
কোথা থেকে ভস্ম উড়ে এসে পড়ে গৃহকোণে, নিভৃত দেয়ালে
তুমি কাকে ডেকে বলবে, আর নয়
এই ভয়ংকর খেলা শেষ করো
এসো, নতুন খুকুর জন্য কাঁথা বুনি, উজ্জ্বল নকশা এঁকে তুলি

রণদামামার শব্দে বন ফেলে উড়ে গ্যাছে পাখপাখালিরা
মৌচাকেরও শূন্য কোটর— কতকাল মধু জমবে না!
গাঁইতি শাবলের শব্দে চমকে উঠবে ইতিহাস
ভবিষ্যতের খোপে খোপে ডানা ঝেড়ে নড়ে উঠবে চামচিকে বাদুড়
পূর্বপুরুষের পুঁথিগুলি মাকড়সায় ঘিরে রাখবে পরম আদরে

গাঁইতি শাবল হাতে কারা যায়? কারা ঘোরে পাড়ায় পাড়ায়
ওরা কি পাহাড় ভাঙবে, পথ গড়বে? দুর্গম সুগম হবে—
সে পথে পৌঁছানো যাবে দেশের হৃদয়ে?
ওই শাবলের ঘায়ে কঠিন উষর দেশে পাথর ফাটিয়ে
ঝরণা ফোটাবে?

কে তোমার কথা কানে তোলে
নগরীর পথে পথে অলিতে গলিতে মানুষেরা হাড়ের মাদুলি
প'রে ঘোরে—দেশের হৃদয় কেউ টের পায় আজ!
উচ্ছন্ন পাতায় পথ ছেয়ে গ্যাছে
সে পথে প্রেতের দল হুল্লোড় জিগির করে হাঁটে
ভয়াল খুলির ভাণ্ড থেকে আমাদের মুখে রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে নাচে
নতুন খুকুকে দুয়ো দেয়, ভেংচি কাটে
থুতু ছুড়ে দিয়ে অট্টহাসে ফেটে পড়ে উৎকট ভঙ্গিতে নবরসে নাচে
পৃথিবীর সেতুগুলি ভেঙে পড়ে চতুর্দিকে ঘোর আর্তনাদে।

ভারতীয় নাট্যপ্রেক্ষিতে বাংলা থিয়েটার

কুমার রায়

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নাটাচর্চা অব্যাহত আছে, বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তর ভারতে এই নাটাচর্চার ব্যাপ্তিও ঘটেছে। তবু বিদগ্ধ মহলে এবং নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষজনদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে সৃজন শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহসী পদক্ষেপ তা যেন নাটাশিল্পের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। বিগত একশ' বছরের সামগ্রিক খতিয়ানের (সৃজনের ক্ষেত্রে) প্রেক্ষিতে এই বিদগ্ধ জনেরা সে কথা বলে থাকেন। বোধহয় খানিকটা না-জানা, (অজ্ঞানতা বলবনা) এবং থিয়েটারের প্রতি যথোচিত উৎসাহের অভাবে এই পক্ষ একরকম বলেন। থিয়েটারের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, যে উদ্দীপনা দেখা দিচ্ছে, যে উদাম ব্যাপ্তি হচ্ছে—যা নাটাচর্চাকে বিশিষ্ট চরিত্র দান করেছে—সে সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাবে এটা ঘটছে অথবা এও হতে পারে, যে শিল্পের অন্য ক্ষেত্রে যে পৃষ্ঠপোষণা আছে, সাহিত্য নিয়ে যে অনুপুঙ্খ আলোচনা হয়—কিংবা সিনেমায় যে পরিমাণ অর্থলগ্নি হয় থিয়েটারের ক্ষেত্রে সে সব কিছুই নেই বা থাকলেও তা নগণ্য। একজন প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা নিয়ে প্রচার মাধ্যম গুলি এতই মুখর যে কোনও নবীন গবেষক যিনি সমাজ ইতিহাসের উত্থান-পতন-পরিবর্তন নিয়ে কিংবা শিল্পের রূপধর্ম ও শৈলী নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা থিয়েটার নিয়ে সাধারণত মাথা ঘামাতে পারেন না বা নাটা ব্যাপারে গুরুত্ব দেবার অবকাশ পান না। তবু থিয়েটার আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ এবং মানুষকে সজাগ রাখতে এবং আনন্দ দিতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

উপরের কথাগুলি স্বীকার এবং বিশ্বাস করে নিয়েই বাঙলা থিয়েটার নিয়ে আলোচনা শুরু করা যায় এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় নাটাচর্চার প্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থান নিয়েও আলোচনা করা যায়।

সাধারণ ভাবে আলোচনাটা এই ভাবে শুরু করতে পারি যে এখানে এই বঙ্গদেশে সকলেই প্রায় বিশ্বাস করেন যে এই বঙ্গদেশে থিয়েটারের ঐতিহ্য প্রাচীন এবং ধনী। এবং সেই সঙ্গে আমরা স্বীকার করি যে মহারাষ্ট্র রাজ্যও এ ব্যাপারে আমাদেরই সহযাত্রী। যদিচ মারাঠি নাটা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৪৩ খৃঃ এ প্রথম মারাঠি ভাষায় নাটক রচিত হয়েছে দেখা যাচ্ছে (বিষ্ণুদাস ভাবে রচিত সীতা স্বয়ম্বর)। আমাদের একজন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এবং তারাচরণ সিকদারকে যদি ধরা যায় প্রথম বাংলা নাটকের রচয়িতা হিসেবে (ভদ্রার্জুন ও কীর্তিবিলাস) তাহলে ১৮৫২ সালকে চিহ্নিত করতে হয়। মহারাষ্ট্রে ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে দশটি সংস্কৃত নাটকের মারাঠি ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে। এবং এই সময়ের মধ্যে শেকসপীয়ার এবং গোল্ডস্মিথ এর নাটক অনুবাদ এবং অভিনয়ও হয়েছে যার সংখ্যা ৩০টি। ১৮৩১ সাল থেকে ইংরেজি ভাষায় এবং বাংলা ভাষায় এখানেও নাটাচর্চা আরম্ভ হয়েছে এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে ১৩টি নাটক অভিনীত হয়েছে। নাটক লেখা হয়েছে আরও কিছু সংখ্যক। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তখনও হয়নি। ১৮৫৭ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত অবশ্যই বাংলা থিয়েটারের বিকাশের কাল। লোকনাটোর হিসেবটা এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না।

জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকদের অভ্যুত্থান এর পর, যেমন জাতীয় জীবনে, তেমনি নাটাচর্চার ক্ষেত্রেও, একটা জোয়ার এসেছিল এই উভয় দেশেই। ওদিকে বাল গঙ্গাধর তিলক, সাভারকর, কেলকার, খারে, পরনজাপে, খাদিলকর, দেশমুখ প্রমুখ থিয়েটারে পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছিলেন। স্বাধীনতার

আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে। এখানে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসন নীতির পরিবর্তন এবং তার প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশিকতার চেতনাতেও পরিবর্তনের সূচনা হয়। রাজনারায়ণ বসু, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, নবগোপাল মিত্র, শিশির কুমার ঘোষ এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলা নাটক এবং মঞ্চকে প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রথমাবধি বোধহয় মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলার কিছু কিছু ব্যাপারে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। মহারাষ্ট্র তার লোকনাট্যের অনুষঙ্গে 'কোম্পানী নাটক', 'সঙ্গীত নাটক' এর ঐতিহ্য তৈরি করেছিল এবং আমাদের এখানে যাত্রা (কৃষ্ণ যাত্রা) কথকতা, পাঁচালী আখড়াই প্রভাবিত করেছিল নাটককে। উভয়ক্ষেত্রেই অবশ্য ইউরোপীয় নাটক বিশেষ করে শেকসপীয়ার (আমাদের এইখানে সেই সঙ্গে ম্যালিয়ার ও গ্রীক নাটক) এবং অবশ্যই সংস্কৃত নাট্যাদর্শ প্রভাবিত করেছিল। এই যোগসূত্রের আরও একটি প্রমাণ পাচ্ছি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় একটি চিঠি যার তারিখ ১১ই মে ১৮৫৪। সেই 'নাগারিক' (citizen) এর চিঠিতে বঙ্গভাষায় নাট্যচর্চার অনুরোধ জানাচ্ছেন এবং 'হিন্দু ড্রামা' যে যথেষ্ট শক্তিশালী সে কথাও বলেছেন এবং তীক্ষ্ম মন্তব্য করেছেন সেই সব শিক্ষিত জনদের, যাঁরা স্বদেশীয় ভাবধারার পরিবর্তে ইওরোপীয় ধারার অনুসরণেই সভ্যতার আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠবে ভাবেন। সেই পত্রেই একটি সংবাদও দিয়েছেন তিনি — "Bombay Hindoos have set an example in this respect to the Bengalees which they do well to immitate—They have got up a theatre where they represent the most approved portions of the ancient Hindoo drama."—এক্ষেত্রে হিন্দু ড্রামা বলতে অবশ্যই সংস্কৃত এবং দেশজ নাটককেই বোঝাচ্ছে।

বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে শুধু বাংলা থিয়েটার কেন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, যেখানে ভিন্নতা নিয়েও বৃহত্তর থিয়েটার সমাজ চলমান এবং কর্মব্যস্ত সেখানে, যে থিয়েটার, একশিলার মত একই চেহারায় প্রকাশমান নয়। সম্পাদ্য শিল্প হিসেবে সে থিয়েটারকে যদি স্থান মাহাত্ম নিয়ে এবং কালবিশিষ্টতা নিয়ে অন্য কালে চলিষ্ণু থাকতে হয় — তবে সেই মুহূর্তের বৃহত্তর সমাজ সংস্কৃতি এবং সেই সময়ের পরিকাঠামোর মধ্যেই তাকে বাঁচতে হবে। নতুবা তাকে তার নিজের স্থানে এবং কালের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। আমরা নিশ্চয়ই এই টুকুতেই আজ আর সন্তুষ্ট থাকতে পারিনা। আমরা তো চাইবই যে আমাদের থিয়েটার সামগ্রিক নাট্য সংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হোক এবং বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, আদান প্রদানের ভিত্তিতে, আত্মীকরণের মধ্যে বেঁচে থাকুক।

বস্তুতঃ স্বাধীনোত্তর কালেই বাংলা থিয়েটার এ কাজটা শুরু করেছে। তার আগে অবশ্যই সে ভারতীয় গণনাট্যের কালে সর্ব ভারতীয় একটা প্রেক্ষিত খুঁজে পেয়েছিল নাটক গান, নাচ ইত্যাদি সৃজনধর্মী শিল্পের মধ্যে। সেটা স্বাধীনতার আগেই যেন ম্রিয়মান হয়ে গেল। স্বাধীনতার পরই আমাদের ভাল করে পরিচয় ঘটতে শুরু করে — হিন্দি, মারাঠি, গুজরাতি, পাঞ্জাবি, কন্নড় এবং মালয়লাম ভাষার নাটকের সঙ্গে। সেই সঙ্গে মনিপুরি থিয়েটারের সঙ্গেও। অন্ধ্র এবং তামিল থিয়েটারের সঙ্গে কেন জানি সে রকম পরিচয়ই ঘটেনি।

এই আলোচনায়, বর্তমান আলোচক, ইচ্ছে করেই লোক নাট্যের সম্ভারকে এই নিবন্ধে আলোচ্য করতে চায় না। প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্তিগত একটা বিশ্বাসের কথা বলা যায় এই সূত্রেই। শুধু বিশ্বাস-ই নয়, কিছু তথ্য নিরীক্ষনের মধ্যেই ধারণাটা গড়ে উঠেছে। লোকনাট্যের যে রঙিন সম্ভার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বেঁচে বা টিকে ছিল — সে প্রান্ত গুলি চিহ্নিত করলে আমরা দেখতে পাবো যে ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন নৃপতি শাসিত রাজ্য গুলিতেই তার অস্তিত্ব ছিল। হয়তো বিকাশের তেমন কোনও সচেতন আয়োজন ছিল না তবু কিছুটা পৃষ্টপোষণাও ছিল রাজন্যবর্গের পক্ষে। স্বাধীনোত্তর কালে নানান আলোচনা এবং সেই সূত্রে উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ভারতীয়ত্ব এবং শিকড়-এর সন্ধান চলে এবং লোকনাট্য প্রসারিত হয়। এর পিছনে অদম্য আর একটি প্রেরণা কাজ করেছে। সে প্রেরণা বিদেশি নাট্যকলার অনেক গুণি জনের কাছে এর কদর বেড়ে যায়। তাদের কাছে এই সব লোক নাট্যের মধ্যে যে উজ্জ্বল দৃশ্যরূপ ছিল তা তাদের আকৃষ্ট করে। শুধু উজ্জ্বল দৃশ্যরূপই নয় — এই প্রকাশ গুলির সঙ্গে যে সেইসব লোকশিল্পীর জীবন যাত্রার প্রণালী যুক্ত হয়েছিল — সেটা তাদের (বিদেশিদের) কাছে স্পষ্ট ছিল না। বিভিন্ন প্রান্তের লোকজীবনের সঙ্গে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সেই সব প্রাচীন শিল্প কলা যুক্ত ছিল — একথাটা খুব বেশী গুরুত্ব পায়নি। যাইহোক বিদেশিদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠা এবং সরকারী স্তরে উৎসাহদানের ফলে ছ'এর দশক থেকে লোকনাট্য একটি বিশিষ্ট নাট্যশিল্প হিসেবে গুরত্ব পেতে শুরু করে এবং আমাদের থিয়েটারে তার কিছু রূপধর্ম সুবিধেমত আত্মস্যাৎ-এর প্রক্রিয়াও শুরু হয়। এই খানে এই কথাটা মনে রাখতে চাই যে স্বাভাবিক আত্মীকরণের প্রক্রিয়াটা ভারতের অন্য প্রান্তে যতটা বেগবান ছিল আমাদের এই বাংলা থিয়েটারে সেটা ছিল না। এই সব বাইরের প্রেরণা ব্যাতিরেকেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮-৯ সাল থেকে শুরু করে দিয়েছিলেন তাঁর নাটকে সচেতন ভাবে। সেটা যে কোনও কারণেই হোক, এমন কি, আমাদের কাছেও, যথোচিত গুরুত্ব পায় নি।

(২)

মূল আলোচনার প্রবেশের আগে একটা প্রেক্ষিত রচনা করা গেল মাত্র। আমরা আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের সঙ্গে আধুনিক বাংলা নাট্যকলার আলোচনা করবো। এই আলোচনার সম্পর্ক-অসম্পর্ক এবং স্বভাবের সদ্ভাব-অসদ্ভাবের কথা বলবো।

একথা স্বীকার্য যে এই আলোচনার অধিকার আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গে — কাজেই নিরপেক্ষ নাও হতে পারে — অনেকটাই আত্মগত আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকার আশঙ্কা থেকেই যাবে। বহুরূপী সংগঠনের সঙ্গে বিগত ৪৮ বছর ধরে যুক্ত থাকার সুবাদে ভারতীয় থিয়েটারের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। বহুরূপীর স্থপতি শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র বুঝেছিলেন যে পশ্চিমের জানালাটা খোলা যেমন আছে তা থাক, কিন্তু স্বাধীনতার পর আমাদের দায়িত্ব বাংলা থিয়েটারের অঙ্গনটাকে প্রসারিত করা অর্থাৎ অভিজ্ঞতার প্রসারের কথাটা বোঝাতেই তিনি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার নাট্য চর্চার খবরাখবরের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। জ্ঞানের পরিধিটা বাড়ানর কথাই তিনি বলতেন। প্রযোজনার চেয়ে বেশী গুরত্ব হল অন্য ভাষায় নাট্য চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থানটা কোথায় এটা বুঝে নেওয়া। সুযোগও ঘটে গিয়েছিল ১৯৫৪ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে। এবং ১৯৫৬ সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ইওনেস্কো আয়োজিত আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে। তখন থেকেই সর্বভারতীয় নাট্যঅঙ্গনে আমাদের যাতায়াত শুরু হয়েছিল। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বহুরূপীর শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্রের ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফলেও কিছুটা সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতটা বুঝতে সাহায্য করছিল। বহুরূপী নাট্য পত্র — যা বিগত ৪২ বছর ধরে বছরে দু'টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে — তাতে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় নাট্যকারদের লেখা নাটক অনুবাদ করে ছাপা হয়েছে — যেমন, হিন্দি ভাষার নাট্যকার মোহন রাকেশের 'আধে আধুরে' ধরমবীর ভারতীর 'অন্ধাযুগ' এবং ভীষ্ম সাহানীর 'ফানুস' কন্নড় নাট্যকার গিরিশ কারনাডের — 'হয় বদন', 'তুঘলক' 'নাগমণ্ডল'; মারাঠি নাট্যকার তেন্ডুলকরের 'চোপ আদালত চলছে', 'কন্যাদান', দুর্গাভাগবৎ-এর 'বুটপালিশ', জি. পি. দেশপাণ্ডের 'উদ্বস্ত ধর্মশালা', বিদ্যাধর পুণ্ডলীক-এর 'চক্র', সতীশ আলেকর-এর 'মহানির্বাণ', বৃন্দাবন দন্ডবত্রের 'কোট নিয়ে গল্প'; পাঞ্জাবি ভাষা থেকে বলবন্ত গার্গীর 'রিজিয়া'; ওড়িয়া ভাষা থেকে মনোরঞ্জন দাস-এর 'অরণ্য ফসল'। এ ছাড়াও স্বল্প দু'একটি ব্যাতিক্রমী পত্রিকাতেও বিগত দশ বছরে আরও কিছু নাটক বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরিচয় আমাদের ঘটেছে। এই তালিকা থেকে পুনরায় মহারাষ্ট্র এবং কন্নড় নাটকের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রের কথাটা আবারো প্রমাণিত হচ্ছে।

স্মরণে রাখতে চাই যে এ সব নাটক মূলত প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্যই রচিত। যদিও এব্রাহিম্ আলকাজি ধরমবীর ভারতীর 'অন্ধাযুগ' নাটকটি পুরানো কেল্লার পটভূমিতে খোলা আকাশের নীচে আশ্চর্য সুন্দর ভাবে প্রযোজনা করে ছিলেন। এর মধ্যে থেকে বাংলা মঞ্চে অভিনীত নাটকের সংখ্যা সীমিত — কেন না অনেক গুলি নাটকে আঞ্চলিকতার ছাপ এতো বেশি যে 'আধে-আধুরে' 'কন্যাদান', 'চোপ আদালত চলছে', 'তুঘলক', 'অন্ধাযুগ' এই রকম নাটক ছাড়া অভিনীত হয়নি। তেমনি বাংলা নাটকের অন্য ভাষায় অভিনয়ের সংখ্যাও সীমিত। বিজন ভট্টাচার্য বা সরোজ মিত্রের যে সব নাটকে বাঙালিয়ানা বেশি সেগুলি বাদে অন্য নাটক অভিনীত হয়েছে। মোহিত এবং বাদল বাবু এ ব্যাপারে কিছুটা ভাগ্যবান। তাঁদের নাটকে অনেক ক্ষেত্রেই বাঙালিয়ানার ছাপ সেরকম নেই। উৎপলবাবুর নাটকও হতে পারত। কিন্তু উৎপল বাবুর নাটক এমন ভাবেই তৈরি যেন তা উৎপলবাবুর নিজস্ব প্রয়োজনার জন্যেই রচিত। তাই বাঙলাতেও তাঁর সফল নাটক অন্যকেউ করবার সাহস করেন না।

বিগত তেরো বছরে নান্দীকার গোষ্ঠী কলকাতায় সর্বভারতীয় নাট্য কলার পরিচয় বাঙালি দর্শকদের সামনে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সেখানে লোকনাট্য কলা বা প্রান্তীয় বৈশিষ্ট নিয়ে ট্র্যাডিশনাল নাট্যকলারও প্রদর্শন আমরা জেনেছি। মণিপুর, গুজরাত, কেরল এবং কন্নড় নাটকের প্রয়োজনায় সেই রূপ ধর্মের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটেছে। উত্তর স্বাধীনতা কালে লোকনাট্যের উৎস যুগে নিয়ে যাওয়া এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্য সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি এবং এও লক্ষ্য করেছি যে প্রযোজনাকে দর্শনীয় করে তুলতে কী পরিশ্রম তাঁরা করেছেন তাদের এই জাতীয় প্রযোজনায়। নাচে, গানে, শরীরীভঙ্গিতে, ক্ষিপ্র গতি সঞ্চার করে নানান কৃত্য মঞ্চে এনে সে সব প্রযোজনাকে অবশ্যই স্পেক্টাকেল করে তোলা হয়েছে — দর্শক মুগ্ধ হয়েছে। বাংলা নাটকে অবশ্য এসবের ব্যবহার নেই বললেই চলে। দেশজ উপকরণ, মিথ, রিচুয়াল এর ব্যবহার, লোককথাকে নাটকে ব্যবহার, পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে কাজ প্রায় নেই বললেই চলে — হাতে গোনা কয়েকটি প্রযোজনা ছাড়া। যেখানে যেখানে তা করা হয়েছে, — তা দূরত্ব তৈরি করে আজকের সময়টাকে বোঝাবার জন্যেই এখানে তা করা হয়েছে। অন্যত্র কি সেটা হয়েছে?

রবীন্দ্রনাথের নাটকে মিথ, রিচুয়াল এবং লোকনাট্যের উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে — কিন্তু সেখানে নতুন মিথ নতুন রিচুয়াল সৃষ্টি হয়েছে — লোকজীবন এসেছে নতুন ঢং-এ। শারোদোৎসব থেকে তাসের দেশ নাটকে সে পরীক্ষা আমরা

দেখেছি। কিন্তু এ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে আমি আনতে চাইনা। শিকড়ের সন্ধান তিনিও করেছেন এবং নতুন ফুল ফুটিয়েছেন।

প্রসেনিয়াম থিয়েটারে শেক্সপীয়ার এবং পরবর্তীকালে ইবসেন যখন ভারতীয় নাট্যকারের কাছে আদর্শ থেকেছে — সে বাঙালি বা মারাঠি নাট্যকার বা হিন্দি ভাষী নাট্যকারই হোন না কেন — তখন তুলনামূলক আলোচনায় বোধ করি অসুবিধে ঘটে না। আধুনিক কালে প্রভাব প্রযোজনার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়েছে।

(৩)

১৯৫৪ বা ১৯৫৬ সাল থেকে সময়ের দিক থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। যদিও ওই দুই ঘটনা ভারতীয় প্রাদেশিক থিয়েটারকে মুখোমুখি করে দিয়েছিল সে সময় নিঃসন্দেহে — কিন্তু সেটা সূচনা মাত্র। হাল আমলটাই আমাদের আজকের বিবেচ্য। না, তুলনামূলক কোনো আলোচনা নয়, বাংলা থিয়েটার এবং নাটক বুঝে নিতে চাই প্রতিনিধিমূলক ভিন্ন ভাষী নাট্যকার এবং নাট্য প্রযোজনার প্রেক্ষিতে। যাকে মূল্যায়ন বা ইংরিজিতে ভ্যালু জাজমেন্ট বলে সেটা করাও উদ্দেশ্য নয়। জরুরি বিবেচনা করছি প্রবণতাকে তুলে ধরবার। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় থিয়েটার এবং নাটক অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাবো যে পরিবর্তন এবং বিকাশ সবক্ষেত্রে এক নয় এবং ভিন্নতাটাই প্রকট। এটা তো ঠিক যে নাটক বা বলা ভাল সব শিল্পই, সময়, আঞ্চলিক পরিবেশ, মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েই বিকশিত হয় — অবস্থা নিরপেক্ষ হয়ে নয়। আমাদের দেশতো বিশাল — সেখানে পরিবর্তনের রূপরেখা একরৈখিক তো নয়ই — পরিবর্তনও অসম। এই প্রসঙ্গে 'ভারতীয় প্রেক্ষিত' এবং 'ভারতীয় ঐতিহ্য' বলতে আমরা কী বুঝি, সে কথাটাও উঠে পড়বে। বাংলা, মহারাষ্ট্র, কন্নড় প্রান্তে নাট্যকলার বিকাশ ঘটেছে — প্রান্তিয় পরিচয় নিয়ে এবং প্রান্তিয় ঐতিহ্য নিয়েই। সেটাই স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছিতও বটে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণেই ভারতীয় সংস্কৃতি। এই প্রসঙ্গে পুরোনো কথাটাও মনে রাখতে চাই — আমাদের সংস্কৃতিতে, — সে ঔপনিবেশিক ভারতেই হোক বা স্বাধীন ভারতেই হোক, দুটি ধারা বজায় ছিল। এক, সাধারণ মানুষের বোধশক্তিকে সমীহ করে একটা ধারা এবং অন্য ধারাটি হল পরিশীলিত এক ধারা যেখানে সমীহ না করে উদ্বোধনের কথা ভাবা হয়েছে। এই দুই ধারা কম বেশি সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য প্রথম ধারাটিই যে প্রবল সে সম্পর্কে প্রশ্ন নেই। আগে বলেছি যে ইওরোপীয় নাট্যধারা অনুসরণ কালে একটা ঐক্য ছিল। নাট্য সংঘাত এবং দ্বন্দ্বের ধারণাটা সেখানে এক। কিন্তু এটাই চিরস্থায়ী হয়ে থাকে নি। আমাদের নাট্যকাররা নিজস্বতা অর্জনও করেছেন। আর সে নিজস্বতা গড়ে উঠেছে স্থান কাল সম্পৃক্ত হয়েই। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা যেমন করবো না, তেমনি রবীন্দ্রনাটকের সফল প্রযোজনাগুলি নিয়েও আলোচনা ওঠাবোনা। তাই শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র প্রযোজিত রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি নাট্য প্রযোজনারও উল্লেখ করবো না কেন না ভারতীয় প্রেক্ষিতে ও সব প্রযোজনা বিরল ব্যাতিক্রমী ঘটনা হয়েই রয়ে গেছে।

বিজন ভট্টাচার্য বাঙালি নাট্যকার এবং অভিনেতা প্রযোজক। তাঁর নিজস্বতার মধ্যে বাঙলা সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছিল এবং মধ্যবিত্ত শহুরে মানুষ নয়, তাঁর উপজীব্য লোকজীবন। লোকজীবনের মিথ্ রিচ্যুয়াল সবই এসেছে অনায়াসে। কন্নড় নাট্যকার গিরিশ কারনাডও তাঁর নাটকে মিথ রিচ্যুয়াল এনেছেন, এনেছেন একটা পুরোনো পরিমণ্ডলে। দুভাবে এঁরা শিকড়ের সন্ধানই করেছেন — কিন্তু কত ভিন্ন এঁরা। বিজন ভট্টাচার্যের 'জীয়ন কন্যা' এবং গিরিশের 'নাগমণ্ডল'-এর মধ্যে দূরত্বটা শুধু সময়েরই নয় — বাংলাদেশের ফরিদপুর (বিজন ভট্টাচার্যের জন্মস্থান) এবং কর্ণাটকের ধারওয়ার (গিরিশের জন্মস্থান) স্থান কাল ভেদে দুটি ভিন্ন শৈলীর জন্ম দিয়েছে।

মোহন রাকেশ এর 'আষাঢ় কা এক দিন', কিংবা 'লিহেরোঁ কে রাজহংস' — তাই বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'কালসন্ধ্যা', 'প্রথম পার্থ' কিংবা ধরমবীর ভারতীর 'অন্ধাযুগ' থেকে আলাদা। যদিও কাব্যের প্রকাশ সব নাটকেই ঘটেছে। নাটকগুলিকে স্থান কালের পশ্চাৎ পটের সামনেই বিচার করতে হবে এবং নাট্যকারকে দেখতে হবে তাঁরা যে ভাষায় লিখছেন — যে ভাষা তাঁদের কাজকে নিয়ন্ত্রিত করছে — স্থান কালের সঙ্গে নিজস্ব ভাষার বিশিষ্টতার কথাও মনে রাখতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই তিনটি বিষয় নাট্য প্রযোজনাকেও নিয়ন্ত্রিত করে।

আপাততঃ কয়েকজন নাট্যকারকে বিছে নেওয়া যাক। বাংলা ভাষার নাট্যকারদের মধ্যে আমাদের কালের উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং মনোজ মিত্র। এঁদের মধ্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর সবাই নাট্য প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত। অন্যদিকে বিজয় তেণ্ডুলকর, মোহন রাকেশ, রতন থিয়াম, কে, এম, পানিক্কর এবং মহেশ এলকুনচয়ারকে আলোচনার পরিধির মধ্যে আনা যায় এবং সেই সঙ্গে গিরিশ কারনাড। গিরিশ এবং বিজয় তেণ্ডুলকর সাধারণ ভাবে নাট্যকার হিসেবেই খ্যাত। মোহন রাকেশ বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছেন। এবং আধুনিক হিন্দি নাটকের জনক বলেই বিবেচিত হয়ে আসছেন। আধুনিক কালেই এটা উপলব্ধ হয়েছে যে পশ্চিমের দরজাটা খোলা থাক সেই সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নাট্যকলার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটুক। অবশ্য আজকের আলোচনায়, এই পরিচয়ের সুবাদে, বাংলা থিয়েটার কতটা প্রভাবিত হয়েছে,

সে আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু একটা কাজ নিশ্চিত ভাবেই হয়েছে যে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 'আধে আধুরে', 'তুঘলক', 'হয়বদন', 'শান্ততা কোর্ট চালু আহে?' 'কন্যাদান', 'অন্ধাযুগ', 'উদ্বস্ত ধর্মশালা', 'ওয়াডা চিরবন্দি', 'মধ্যমবায়োগ', 'চক্রব্যূহ' প্রভৃতি নাটকের প্রযোজনা আমাদের ভাবিয়েছে। ঘাসিরাম কোতয়াল কিংবা হবিব তনবীর এর ছত্তিশগড় প্রযোজনা গুলিও আমাদের মুগ্ধ করেছে। এ সবই ঘটেছে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। আমাদের ভাবনার মধ্যে নিশ্চয়ই বাসা বেঁধেছে এই সব নাট্যাক্রিয়া কিন্তু যা আমাদের মুগ্ধ করেছে — তা মুগ্ধতার বাইরে কখনো সক্রিয় থাকেনি। থাকেনি তার কারণ আমাদের নাট্যধরনের সঙ্গে তার মিল ঘটেনি। ঘটা সম্ভবও নয়। আবার অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্য সেই ১৯৪৪ সালে 'নবান্ন' নাটক লিখে এবং ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ সেই নাটকের প্রযোজনার মধ্যে যে ধারার জন্ম দিয়েছিলেন — সেটা দীর্ঘদিন বাংলা নাটকের উদ্দেশ্য একটা ঠিক করে দিয়েছিল। কিন্তু উৎপল দত্ত, বাদল সরকার প্রমুখরা সে পথে হাঁটতে চাননি। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'দেবী গর্জন', 'গর্ভবতী জননী', 'গোত্রান্তর' এবং 'মরাচাঁদ' নাটকে তাঁর নিজস্ব পথেই হেঁটে গেছেন। 'চাকভাঙা মধু' নাটকে মনে হয়েছিল — মনোজ মিত্র বুঝি বা বিজন ভট্টাচার্যের নির্দিষ্ট পথেই হাঁটবেন। কিন্তু না, মনোজ তার নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছেন। উৎপল দত্ত তাঁর নাটক ও প্রযোজনায় যেমন রাজনৈতিক থিসিস্ বা মতবাদকে তুলে ধরেছেন, সেই সঙ্গে তার প্রযোজনার বৈভব প্রায় অনুকরণীয়। কিন্তু তাঁর দৃশ্যগ্রাহ্যতা কখনোই স্পেক্টাকেল করে তোলা নয়। যেটা লোকনাট্য বা ঐ জাতীয় উপকরণের ব্যবহার করে হয়। প্রসেনিয়াম মঞ্চের মধ্যেই, সেই থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই, উৎপল কাজ করেছেন। আলাদা করে দেখানপনা ছিল না। 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'তীর', 'টিনের তলোয়ার'-এর কথা মনে রেখেই কথাটা বলছি। বিষয় বস্তুর কিংবা প্রযোজনার বৈভবের নমুনা ভারতীয় অন্য ভাষার থিয়েটারে এমনটি দেখা যায় না। প্রযোজনায় বৈভব এবং চমক অবশ্য অন্য ভাষার নাটকেও আছে। উৎপলবাবুর আগে বিজন ভট্টাচার্য এবং শম্ভু মিত্রের প্রযোজনার ভঙ্গি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সমাজ, মানুষ যেমন করে এসেছে, যে কাব্য মঞ্চে প্রকাশ করার আয়োজন হয়েছে, যে গভীর কথা বলা হয়েছে এবং গভীর কথা বলবার জন্য কণ্ঠের সাধনা হয়েছে অভিনয়কে গভীর গামী করবার জন্যে তেমনটিও দেখা যায়না — তাই 'ছেঁড়াতার', 'দশচক্র', 'পুতুল খেলা', 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'রাজা অয়দিপাউসের' সমতুল প্রযোজনা দেখা যায়নি। সমতুল না হলেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনাও ভিন্ন মাত্রায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এখনো পর্যন্ত বাংলা নাটক অভিনয় কেন্দ্রিক। অভিনয়ই নাট্য প্রযোজনার প্রধান উপকরণ হয়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে সমাজ সচেতনা। রাজনৈতিক সচেতনতার ব্যাপারটাও দায়বদ্ধতার কথাটাও বোধহয় বাংলা থিয়েটারকে স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত করেছে। মনোজ, মোহিত এবং বাদল সরকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হলেও এ ব্যাপারে কখনোই অমনোযোগী হন নি। তার ফলে একটা সমালোচনাও উঠতে পারে। বাংলা থিয়েটার খানিকটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় নানা ভাষার থিয়েটারের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে থিয়েটারের বা নাট্যের অপার সম্ভাবনার দিকটা। সেখানে মনে হতেই পারে অনেক প্রযোজনা দেখে, যে সেখানে থিয়েটার এর জন্যেই থিয়েটার করা জরুরি বলে বিবেচিত।

অনেকদিন আগে মোহন রাকেশের 'আধে আধুরে' দেখেছিলাম — পরে সে নাটকটির বাংলা অনুবাদ বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। সে প্রযোজনায় মধ্যবিত্ত এক পরিবারের ভগ্নস্তূপ দেখানো হয়েছিল। জনপ্রিয়ও হয়েছিল সে প্রযোজনা। পুরুষ সেখানে তার ক্ষমতা থেকে এবং পরিবারে তার নিজের জায়গা থেকে স্থান চ্যুত। পরিবার চলছে — স্ত্রীর রোজগার এবং কর্তৃত্বে। এ পরিবারের সকলেই যেন সকলকে ধ্বংস করতে চাইছে। পালিয়ে বেড়াতেই যেন স্বামী মদ্যপান করে। স্বামী পরিত্যক্ত বড় মেয়ে ঠাঁই নিয়েছে এ সংসারে। ছেলে একাই যেন বিদ্রোহী, ছোট মেয়ে চেঁচামিচি করে তার অস্তিত্ব জাহির করে। আর স্ত্রী এ সবের মধ্যেই তিক্ততা নিয়ে যেন এক আদর্শ প্রেমিককে খুঁজে বেড়ায়। নাট্যশৈলী এবং সংলাপের ভাষা মুগ্ধ করে দেয়। আধুনিক মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ এই নিয়েই আধে আধুরে। মনস্তাত্ত্বিক নাটক, যেখানে সন্দেহ ঠাঁই নিয়েছে। আধুনিক হিন্দি থিয়েটারের সূচনা এই নাটক। 'নবান্ন' যে নাট্যবোধের জন্ম দিয়ে ছিল আমাদের সময়ে — সেই বোধ থেকে মনে হতেই পারে কেন একটা চরিত্রও এ নাটকের, যে সমাজে সে বাস করছে তার সম্পর্কে সচেতন নয় — অন্তত সে সচেতনতার প্রকাশ ঘটে না নাটকে? একটা সার্বিক সমাজ অবক্ষয়ের মধ্যেই তাদের এই দশা এমন কেন কেউ উপলব্ধি করে না নাটকে। আমি একবারও এ কথা বলতে চাচ্ছিনা যে সব নাটকেই একজন প্রবক্তা চরিত্র থাকবে যে এ সব কথা সোচ্চারে বলে উঠবে। কিন্তু নাটকের মধ্যে একটা বোধের জন্ম দেবে এটা প্রত্যাশা করা অন্যায় নয়। কিংবা এই চাওয়াটা কেবল বাঙালি সমাজেরই? আরও এক অনুভবের কথা বলি। ১৯৭০ সালে সম্ভবত বোম্বাই শহরে ছবিল দাস স্কুলের হলে আমরা জি.পি. দেশপাণ্ডের লেখা নাটক 'উদ্বাস্ত ধর্মশালা' নাটকের অভিনয় দেখি। শ্রীরাম লাগু সে নাটকের নির্দেশক এবং প্রধান অভিনেতা। সে প্রযোজনা দেখে, প্রায় নিরাভরণ পিক্‌চার ফ্রেমকে ভেঙ্গে দিয়ে, স্বাভাবিক

অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা মনে হয়েছিল। শ্রী রাম লাগুর অসাধারণ স্বাভাবিক অভিনয়ও সে প্রযোজনার অন্যতম সম্পদ। বহু বছর বাদে কলকাতায় সে প্রযোজনা এ্যাকাডেমিতে দেখে ভাল লাগার বোধ ম্লান হয়নি। কিন্তু একটা কথা পরে মনে হয়েছিল — অন্যত্র নিশ্চয়ই এরকম ঘটনা ঘটতে পারে — অন্তত ঘটার সম্ভাবনা ছিল — নচেৎ দেশপাণ্ডের মত রাজনীতি সচেতন নাট্যকার কেন এ নাটক লিখবেন। কিন্তু কলকাতায় বা এই বঙ্গের আমরা ভাবতেই পারিনা কোনও স্বভাববন্দী নাটকে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কোনও এক অধ্যাপকের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা জেনে তাকে পুলিশী কায়দায় জেরা করতে শুরু করবে, তাকে বিপর্যস্ত করে দেবে। শুধু উপাচার্য নয় তাঁর সহযোগী সে পীড়নের সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি(?)র সভা বৃন্দও। এ গুলি অবশ্যই বিচ্ছিন্ন উদাহরণ এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিমতও।

দশ পনেরো বছরের মধ্যে বাংলা থিয়েটার নিশ্চয়ই বদলেছে। বদলের ভাল মন্দ দুদিকই আছে। নির্ভেজাল ভালও নয় মন্দও নয়। একটা কথা বলা যায় যে এই বাংলা থিয়েটার— শিকড়ের সন্ধানের নাম করে সংস্কারাচ্ছন্ন। স্পেক্টাকেল কোনও নাট্য উপহার দিয়ে বিদেশের বাজারে বিক্রি করেনি। বরং আমাদের সমস্যা, আমাদের সময়, আমাদের সংকটকে সংস্কৃতির নানা বৈচিত্র্যকে আত্মসাৎ করে শিল্পধারার সমন্বয় করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে। মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় বোধহয় এই কাজটা করেছেনও। প্রচিন ভারতের মহাভারতীয় উপাখ্যান আজকের মঞ্চে অভিনয় করলেই যে ভারতীয়ত্ব অর্জন করে না বা প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনা তার নিদর্শনও আমাদের দেখা আছে।

মনোজ মিত্রের 'চাকভাঙ্গা মধু' নাটকে যে রগরগে মাটির গন্ধে সেই সঙ্গে নারীর আর্কেটাইপ জীবনের সৃষ্টিশীলতা, ক্ষুধা হিংসার রূপ আমাদের আজও মনে রাখতে বাধ্য করে— চন্দ্রশেখর কাম্বরের 'যোকুমার স্বামী'র মধ্যে একইরকম উপাদান থাকলেও চিত্তাকর্ষক হল না— সঙ্গীত ও নৃত্য সম্ভার যেখানে অলঙ্কারিক হয়ে গেল। এইখানেই বোধহয় দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ ঘটে যায়।

আমাদের কথাকলি নেই, কালারি নেই, মার্শাল আর্ট নেই, ভাওয়াই লোকনাট্যের বেশ নেই, পাণ্ডবাণী নেই এই সব নেই এর মধ্যেও যখন বালুরঘাটের হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এর নির্দেশনায় 'দেবাংশী', অভিনীত হয়, যখন বাংলাদেশের 'নূরুলদিন' দেখি 'কীত্তন খোলা' দেখি বা 'কেয়ামত মঙ্গলের' মতো এপিক দেখি তখন একটু গর্ব হয় বৈকি! আঞ্চলিক জীবন, লোকগাথা, প্রবাদ প্রবচনের চালচিত্রে সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম রূপ পায় তখন মনে হয় অতটা দরিদ্র নই আমরা।

এমন কথা কেউ যেন না ভাবেন যে আমি সেইরকম ব্যক্তি যে বাঙালির শ্রেষ্ঠতা নিয়ে মশগুল থাকি। মোটেই তা নয়। এখানে আগেই বলেছি কিছু কিছু প্রবণতার কথা মাত্র উল্লেখ করবো। এবং তাও বিচ্ছিন্ন কিছু অভিজ্ঞতা থেকে। আমার জানার বাইরেও যে অসংখ্য কাজ হচ্ছে নাট্যের ক্ষেত্রে — ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও যেমন সমাজ মানুষ, তার সমস্যা সংকট নিয়ে কাজ হচ্ছে — তার কিছু কিছু খবর পাই।

তবে এ কথাও মানতে পারবো না — যেমন শ্রী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় মহারাষ্ট্রের এক আলোচনা সভায় বলেছেন (পানহালা কর্মশালায়) বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে। অনুবাদ না করে ইংরেজি প্রতিবেদনটিই তুলে ধরি: "At the Panhala seminar, Samik Bandyopadhyay, speaking about theatre in Bengal, omitted any reference at all to the last ten years or so of its history. Later he stated that nothing worth while had happend there in recent years. The important figures in Bengali theatre were still Badal Sirkar and Utpal Dutt, one old, one no more, and both men of the sixties and seventies generation.

"One would be willing to grant that the seventies generation, including Bandyopadhyay, were looking at the work of younger theatre practitioners from an old slant that had no relevance for them." (Marathi Rangabhoomi—by Shanta Gokhale—in 'Yatra' 1994) শান্তা গোখলে এ প্রশ্ন ও তুলেছেন, পুরোনো ধ্যান ধারণা থেকেই এ মন্তব্য করা হয়েছে। এমন অভিযোগ হলের নাট্যকর্মীরা করতেই পারেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে তাদের কাজ, ভাবনা, লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় গত দশ বছরে বাংলা নাট্যক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য কিছু ঘটেছে বলে বিশ্বাস করেন না। তা তাঁর বিশ্বাস নিয়ে তিনি থাকতেই পারেন। কিন্তু বাস্তব বলেছে, নাট্যক্ষেত্রে, নাটক লেখা এবং প্রযোজনায় কিছু উল্লেখযোগ্য কাজও হয়েছে এই পোড়া দেশে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় কিছুকালের নীরবতার পর এই দশ বছরেই আবার নাট্যক্ষেত্রে সক্রিয় হয়েছেন। মনোজ মিত্র, দেবাশীষ মজুমদার, চন্দন সেন ও নতুন নতুন নাটক লিখে চলেছেন। আর প্রযোজনার ক্ষেত্রে অনেকগুলি নাট্য প্রযোজনা সাফল্যের স্বাদ পেয়েছে। মনোজের 'অলকানন্দার পুত্র কন্যা', 'শোভাযাত্রা' 'গল্প হেকিম সাহেব', তো এই দশ বছরের মধ্যেই প্রযোজিত হয়েছে। 'কিনু কাহারের থেটার'-ও এই পর্বেরই। হোক না বিদেশি নাটকের বঙ্গীয়

সংস্করণ — 'আগুনের পাখি', 'তখন বিকেল', 'নিন্দাপঙ্কে', 'নীলাম নীলাম' কি অনুল্লেখ্য প্রযোজনা? 'মাধব মালঞ্চী কন্যা', 'নাথবতী অনাথবৎ', এর সাফল্য হয়তো শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে আসেনি। বিগত দশ পনেরো বছরে বাংলা থিয়েটারে যা কিছু হয়েছে তাতে ত্রুটি নেই — এমন কথা কেউ বলবেন না কিন্তু এটাতো ঠিক যে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার মতো কাজ নয় বরং একটা দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হয়েছে এবং কাজের মধ্যে বুদ্ধি, যত্ন নেওয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে এবং অভিনয় সমৃদ্ধ প্রযোজনার সাক্ষ্য বহন করেছে। ওই একই আলোচনা সভায় মহেশ এলকুনচয়ার এবং সতীশ আলেকর বলেছিলেন মারাঠি থিয়েটারে বর্ত্তমানে— 'an acute sense of loss at the absence, in the threatre world of Maharastra, of a Visionary."—বস্তুত এই Visionary-র অভাব সর্বত্রই। আমাদের এখানে শেষ Visionary শ্রী শম্ভু মিত্র। কাজেই এই সংকট হয়তো সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে। সে আলোচনা অন্যস্তরের। আমাদের এবং ভারতের অন্যত্রও নাট্যশিল্পকে পারফরমেন্স-এর লক্ষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হয়েছে এ কথাও ঠিক।

মহারাষ্ট্রে এবং অন্যত্রও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যাঁদের নাম, আমরা নাট্যক্ষেত্রে শুনতে পাই তাঁরা অনেকেই থিয়েটারকে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে এখানকার মতো 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ' তাড়ানর মত নাট্যদলের সংখ্যা নগণ্য। এখানে যে কোনও বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদ পত্রে বিনোদনের পাতার বিজ্ঞাপন দেখলে বোঝা যাবে এই সব নাট্যদলের বিজ্ঞাপনই বেশি। বোম্বাই-এর সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বাণিজ্যিক থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়াটা আশ্চর্য্যের নয়। সেখানে বানিজ্যিক থিয়েটারের সর্বোচ্চ টিকিটের দাম ১০০ টাকা থেকে ৩০ টাকা। ১০০ টাকার অঞ্চলে অবশ্য সমান্তরাল থিয়েটার কোনঠাসা হয়েই আছে। তাদের দশা আমাদের থিয়েটারের মতই।

আমাদের এখানেও অবস্থাটা হয়তো অচিরেই সেইরকমই হবে। কেরলে কিংবা কর্ণাটকে যখন ট্র্যাডিশনের দিকে অধিক মনোযোগী তখন মহারাষ্ট্রে (আমাদের এখানেও হয়তো সেই লক্ষণ ফুটে উঠবে) ঐতিহ্যের বা লক্ষ্যের কথা আর কেউ ভাবছেনা। তারাই যেন নাট্যক্ষেত্রে চাষ আবাদ প্রথম শুরু করেছেন। আজকের আর্থসামাজিক অবস্থাটা যেন আর বিবেচনার বস্তু নয় নাটকের ক্ষেত্রে। এতোদিনের অভিজ্ঞতায় কোনটা গ্রহণীয় কোনটা বর্জনীয় সেটাও যেন আর খেয়াল রাখবার নয়। তাঁদের কাছে দায়বদ্ধতার অর্থ নাটককে শেকলে বাঁধা। তাঁরা প্রশ্ন তুলতে পারেন (এখানেও হয়তো সেই প্রশ্ন কেউ ওঠাবেন) যে পরীক্ষা নিরীক্ষার দিন শেষ হয়েছে। কেউ হয়তো এই প্রশ্ন আর করবেনা যে এতোদিন যে সমান্তরাল থিয়েটারের কথা বলা হল — তা কেন ক্রমশই বাণিজ্যিক থিয়েটার যা করছে সে পথে হাঁটবে? আবার ভাবাবেগে ভেসে যাওয়া স্বভাববন্ধী থিয়েটার এর রাস্তা তৈরী হচ্ছে।

এসব কথা যখন বলা হচ্ছে তখন হয়তো ভবিষ্যতে সারা ভারতে থিয়েটারের লক্ষ্য এক হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন প্রান্তিয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে থিয়েটার আলাদা আলাদা রূপে আমাদের ভাবায় মুগ্ধ করে সেটাও মনে রাখতে হবে। একসময় মনে হত সমাজ রাজনীতি নাটকের মধ্যে চর্চা আমাদের একচেটিয়া। কিন্তু না, যখন দেখি বিজয় তেন্ডুলকর তার 'কন্যাদান' নাটকে আধুনিক মানুষের প্রগতিশীলতার গোড়ায় ধাক্কা দিচ্ছেন। মহেশ এলকুনচয়ার একসময় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতই এ্যাবসার্ড বা কিমিতিবাদী নাটকের চর্চা করতেন — তিনিই যখন 'ওয়াড়া চিরেবন্দী' নাটকে তাঁর স্বভাববাদী মধ্যবিত্তের ইতিহাস বীক্ষা তুলে ধরেন কিংবা থিয়েটার এ্যাকাডেমির 'পড়গম'। এক ছাত্র নেতার মন্ত্রীত্বের উন্নতির কাহিনী ঘিরে এক রাজনৈতিক প্রহসন অভিনীত হচ্ছে তখন এ ব্যাপারে আমাদেরই একমাত্র অধিকার একথা ভাবতে পারি না। তবু প্রশ্ন একটা থেকেই যায় যে মোহিত চট্টোপাধ্যায় এর 'রাজরক্ত' কিংবা উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার'; মনোজমিত্রের 'রাজদর্শন', বাদল সরকারের মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে তুলে ধরতে 'বাকি ইতিহাস'-এর সঙ্গে এ সব নাটককে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। বাণিজ্যিকতার লক্ষ্য অন্য নাটকগুলিতে স্পষ্ট — যা উপরিউক্ত বাংলা নাটকের প্রযোজনায় দুর্লক্ষ্য।

কিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলাই আমার এ প্রবন্ধের কাজ। সিদ্ধান্ত নিতে চাই না — কেননা সহজ সরল সিদ্ধান্তে স্থির হওয়ার সময় এখনো আসেনি। তবু সর্বভারতীয় নাট্যচর্চার সূত্রে বাংলা নাটকের, নাট্যচর্চার মানসিকতা কী ভাবে তৈরি হয়েছিল আধুনিক কালে সেটা উল্লেখ করা যায়। মানসিকতা তৈরির পটভূমি তৈরি হয়েছিল সেই প্রাক স্বাধীনতার দিনে। ইওরোপীয় নাট্যধারার বৃত্ত থেকে আমরা যতদিন মুক্ত হতে পারিনি তখন ভারতবর্ষের থিয়েটার চর্চার কেন্দ্র গুলিতে খুব একটা প্রভেদ ছিলনা। কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে ক্রমান্বয়ে লোকনাট্যের উপকরণ ব্যবহার এবং ঐতিহ্যের মধ্যে যে নাট্যচর্চা আছে তার ব্যবহার বৃদ্ধি ঘটল। এখানে স্বাধীনতার আগেই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মর্মন্তুদ মৃত্যু, বন্যা একই সময়ে ঘটে যাওয়া এই সব কার্য কারণে থিয়েটার অন্য এক রূপে প্রকাশের অনিবার্যতা দেখা দিয়েছিল। ভারতের অন্য প্রান্তে সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। থিয়েটারেও তার প্রকাশ ঘটেনি। সেই ধারাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহাল ছিল। তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাটককে মঞ্চে পুনরাবিষ্কারের ঘটনাটি ঘটল।

এইখানেই শ্রীযুক্ত শম্ভুমিত্রের পারদর্শীতা। বাংলা থিয়েটার এরই মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক থিয়েটারের ও প্রবক্তারূপী উৎপল দত্তের কাজও প্রভাবিত করেছিল এখানে। এ সব ঘটনার কোনওটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় আজকের ভারতীয় থিয়েটার। সে থিয়েটার স্বাধীনোত্তর কালে গড়ে উঠেছে নিজের নিজের এলাকায় আলাদা আলাদা সচেতনতার ফলে। আমি জানিনা এখনো হিন্দি থিয়েটার (এটা আমার অজ্ঞানতা হতে পারে) সমাজ জীবনের অংশ হতে পেরেছে কিনা — অন্তত দিল্লিতে প্রধান নাট্যচর্চার কেন্দ্রের ফসল দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্র এবং বাংলা এখনোও থিয়েটার চর্চা জীবনেরই অংশ — সামাজিক এক ক্রিয়া। চল্লিশের দশকের ঘটনাবলী, তার মধ্যে দেশভাগ এবং স্বাধীনতা, দাঙ্গা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল — পাঞ্জাব এবং বাংলা ছাড়া সামাজিক জীবনে এত বড় ধাক্কা তো আর কোথাও লাগেনি জীবনে। তাই নাটককে শুধুমাত্র নাটক হিসেবে দেখাটা বা প্রযোজনার সার্থকতার মধ্যে দেখাটা ঘটে ওঠেনি এখানে। গিরিশ কারনাড যে ভাবে মৌলিক মানবিক সমস্যা তুলে ধরতে পারেন রাজনীতি বাদ দিয়ে — এখানকার নাটাকাররা তা পারেন না। তাই বাদল সরকার শুরু করেন — 'বড় পিসিমা,' 'সল্যুশেন এক্স' দিয়ে কিন্তু চলে আসেন — 'বাকি ইতিহাস', 'থ্রিংশ শতাব্দী', 'শেষ নেই' — কিংবা 'ভোমা' বা ''স্পার্টাকাস'-এ। বিজন ভট্টাচার্যের পথটা প্রসারিত হয়ে দীপ্ত হয়ে ওঠে শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্রের ধ্রুপদী নাটক চাঁদ বণিকের পালায় — যেখানে ধরা পড়ে, মঙ্গল কাব্যের দিন যাপন নয়, — আজকের রাজনৈতিক, সামাজিক ইতিহাস। সে ব্যাপ্তি রবীন্দ্রনাথের মতো হয়েও যেন সমকালীনতার আকাঙ্খা প্রকাশে যত্নবান। এখানেও মানুষের মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসার সম্মুখীন হতে হয়।

আগেই বলেছি এ আলোচনা তুলনামূলক মূল্যায়নের অভিপ্রায়ে নয় — শিল্প প্রকাশের ধর্মের বা আঙ্গুল তুলে তফাৎ দেখানোর জন্যও নয়। নাট্যধর্ম বিকশিত হয় আপন পরিমণ্ডলে — যে পরিমণ্ডলে সমাজ, মানুষের বাঁচার ধরন, তার স্মৃতি ও স্বপ্নের অবস্থান এবং তাই দিয়েই সে ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। এই জাতীয় আলোচনায় বোধকরি সেটাই সীমা নির্দেশক। □

.....Nation State-এর মতাদর্শ ধুঁকছে, কিন্তু আমাদের ঘাড় থেকে নামতে চাইছে না।' — এই বক্তব্যকে বিশদ করে চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখছেন অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ)। বক্তব্যটি তাঁরই মুদ্রিত ভাষণ 'এ রথ অযুত বিদ্রোহ পার হবে'— থেকে উদ্ধৃত।

কলকাতার হিন্দি নাট্যচর্চার একটি ভিন্নধারা

ঊষা গাঙ্গুলীর নাট্য-অভিজ্ঞতার পরিচয়

মহাভোজ (১৯৮৪), লোককথা (১৯৮৭), হোলি (১৯৮৯) কোর্ট মার্শাল (১৯৯০), রুদালী (১৯৯৩), 'খোঁজ' (১৯৯৫)। মাত্র দশ বছরেই আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের আকাশে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এসে জায়গা করে নিল। নক্ষত্রের জন্মের জন্য বিস্ফোরণ প্রয়োজন। ঊষা গাঙ্গুলী পরিচালিত নাটকের প্রতিটিই যেন এক একটি বিস্ফোরণের সমগোত্রীয়। জন্মসূত্রে হিন্দিভাষী, নাটকের ভাষাও হিন্দি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে এই বাংলাভাষী রাজ্যেও জনপ্রিয়তম নাট্য ব্যক্তিত্বের নাম ঊষা গাঙ্গুলী। পেশায় অধ্যাপিকা এই সংবেদনশীল মহিলার নাট্য-বোধ এবং চেতনার যাবতীয় অণুপরমাণু সংপৃক্ত হয়ে আছে সামাজিক দায়বদ্ধতায়। আর এই দায় বোধই তাঁকে প্রেরণা যোগায়—প্রতি মুহূর্তে আশাবাদী করে তোলে। চারিদিকের সার্বিক অবক্ষয় আর বিভ্রান্তির সময়, যখন একদা দায়বদ্ধ গ্রুপথিয়েটারের শীর্ষ ব্যক্তিত্বরাও ভিন্ন মিডিয়ার প্রলোভনের পঙ্কিল জমিতে মুখ থুবড়ে পড়ছেন, নিজের লক্ষ্য বা 'মক্‌সদ্' সম্পর্কে ঊষার গভীর নিষ্ঠা নজর কাড়ার মতো। মঞ্চ নাটকে আকাশচুম্বী সাফল্যের পরও তাই ঊষা তৃপ্ত নন—বৃহত্তর জনগণের মুখ চেয়ে থিয়েটার করার জন্য আজ, এই মুহূর্তে, তিনি 'নুক্কড়ে' নেমে আসতে চান। আজকের এই সর্বাত্মক ভোগবাদী প্রেক্ষাপটে ঊষা গাঙ্গুলী তাই নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক স্তম্ভ।

ভারত নাটামের ছাত্রী ঊষার নাটকের জগতে প্রবেশ ১৯৭০ সালে। নাটকের নাম—'মিট্টি কী গাড়ী', এরপর আমরা ঊষাকে দেখি 'মুচ্ছকটিক', 'আষাঢ় কা একদিন', 'কিসি এক ফুল কা নাম লো', 'এক আউর দ্রোণাচার্য' এবং 'জসমা ঊড়ান' নাটকে। প্রশংসিত বা পুরস্কৃত হলেও ঐ পর্যায়ের নাটাচর্চা ঊষাকে তৃপ্ত করেনি। তারই ফলস্বরূপ ১৯৭৬ সালে তৈরি হল রঙ্গকর্মী। রঙ্গকর্মীর প্রথম দিকে ঊষা ছিলেন মূলতঃ অভিনেত্রী এবং সংগঠক। এই সময়ে তিনি কাজ করেছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শারদ পেঠ, তৃপ্তি মিত্র, এম. কে. রায়না, কৃষ্ণ কুমার এবং বিভাস চক্রবর্তীর সঙ্গে। একটা টোটাল থিয়েটার চেতনার ভিত দৃঢ় হবার পরই হাল ধরেন ঊষা। সেটা ছিল ১৯৮৪ সাল। রঙ্গকর্মীর প্রযোজনায় ঊষার পরিচালিত প্রথম নাটক 'মহাভোজ' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচারে সে বছরের শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে বিবেচিত হয়। এর পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি ঊষাকে।

পূর্ণাঙ্গ থিয়েটার ব্যক্তিত্ব বলতে যদি কিছু থাকে ঊষা গাঙ্গুলীর দিকে তাকালেই আমরা তার পরিচয় পাব। একাধারে নাটাকার, পরিচালক, সংগঠক, সমালোচক এবং অভিনেত্রী।

এহেন বর্ণময় জ্যোতিষ্কের কাছেই প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম— ৬ই মার্চ ১৯৯৬-এর সন্ধ্যায়। সেই সাক্ষাৎকার নিঃসন্দেহে এই সময়ের বাংলা এবং ভারতীয় থিয়েটার-এর দৃষ্টিকোণ থেকে নানা ভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্র: ১৯৭৬ সালে রঙ্গকর্মী প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই আপনি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। প্রারম্ভিক পর্যায়ের সেই নাটাচর্চা কি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি ? — যার ফলে রঙ্গকর্মীর জন্ম ? নাকি ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে উন্মুক্ত করার তাগিদেই এই নতুন দল গঠন ?

উ: ১৯৭৬-এর আগে যে ধরনের থিয়েটার করছিলাম তা আমাকে বৃহৎ জায়গায় নিয়ে যায়নি। তাছাড়া একটা সামাজিক বোধের বীজ বোধহয় ছিল আমার মধ্যে। যখন নাচতাম তখনও মনে হত একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে আছি, বৃহত্তর দর্শকদের সঙ্গে কোন communication হচ্ছে না।

সেই সময় আমার মনে হয়েছে যে যদি বহু মানুষের কথা থিয়েটারে বলতে পারতাম! কিন্তু সেই জায়গাটা বোধ হয় আমি পাচ্ছিলাম না।

সেখানে কিছু মেম্বারদের জন্য নাটক হত। হাজার বা দু হাজার। সেই দুহাজারও কিন্তু একটা বিশিষ্ট বর্গ—প্রায় সবাই upperclass-এর লোক। তারা আসতেন পপ কর্ন-এর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে।

আমার মানসিক খিদের যে ব্যাপারটা ছিল—বহু মানুষকে নিয়ে থিয়েটার করা, সেটা ওই জায়গায় করতে পারছিলাম না। সেই জন্যই আমি বেরিয়ে এসে রঙ্গকর্মী গঠন করলাম।

প্র: আপনার থিয়েটার কেরিয়ারকে তিনটি সুনির্দিষ্ট পর্বে ভাগ করা যায়।— প্রাক রঙ্গকর্মী পর্ব, রঙ্গকর্মী প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৮৪ আর ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৬। এই তিনটি পর্বে আপনার থিয়েটার চেতনার বিবর্তন কিভাবে হয়েছে?

উ: এই প্রশ্ন বোধ হয় আমাকে আগেও করা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি আমি থিয়েটারে এসেছিলাম একটু হঠাৎই। সন্ধের সময় কিছু করার ছিল না, এর আগে নাচও ছেড়ে দিয়েছিলাম। এমন একটা সময়ই আমি থিয়েটারে আসি। নাচ জানতাম বলে 'মৃচ্ছকটিক'-এ অভিনয় করেছিলাম।

কিন্তু আমি বললাম না, কোথায় যেন একটা সামাজিক দায় লুকিয়ে ছিল। কিন্তু এই অদৃশ্য চেতনাটা প্রথম দিকে আমি নিজেও খুঁজে পাইনি। অনেকগুলো বছর ধরে আস্তে আস্তে অবচেতন থেকে চেতনার স্তরে একটা পলিটিকালাইজেশন হয়েছিল আমার ভেতর। এম.এ. পাশ করা সত্ত্বেও থিয়েটারের মধ্যেই আমার রিয়াল এডুকেশন হয়।

সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হল বেসিকালি আমি কিন্তু খুব জিজ্ঞাসু মানুষ—As a person I always question myself. Sometimes I question this society, the friends around me. আমার এই প্রশ্ন করার মানসিকতাই বোধহয় অনেক অভিজ্ঞতা থেকে আমায় এই জায়গায় আনতে পেরেছে।

আমি সব সময়ই বড় টিম নিয়ে কাজ করেছি। পঞ্চাশ ষাট জন লোকের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে, invent করতে গিয়ে বুঝেছি এটা একটা process। বিভিন্ন সময় নতুন নতুন batch পাশে পেয়েছি। অনেক রকমের অবহেলা পেয়েছি, বোধহয় অপমানও। Face করেছি অনেক রকম obstacle। এগুলো কিন্তু বারে বারে আমাকে অনেক বেশি দৃঢ় করেছে, আরো বেশি পুষ্ট করেছে— সে সব বললে একটা বড় বই হয়ে যাবে। প্রত্যেক বারই যখনই এরকম সংঘর্ষ বা লড়াই এর সামনে পড়েছি, তখনই আরো বেশি দুরন্ত হয়ে আরো বেশি কাজ করার চেষ্টা করতাম।

তাছাড়া কাজ করতে করতেই natural way'তেও অনেক কিছু grow করেছে আমার মধ্যে। আমার মনে আছে যখন 'লোককথা' করি তখন এই নাটকে একটা বিশেষ form কে invent করার চেষ্টা করেছি। আবার জার্মান নাট্যকার ক্রোয়েগস্-এর request concert বা অনুরোধের আসর যখন করলাম তখন আমি একা। আমার কাছে কোন dialogues নেই শুধু movement দিয়ে একজন exploited নারীর যাবতীয় একাকীত্বকে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে শুধু শারীরিক আন্দোলন বা গতির মধ্যেই পুরো ব্যাপারটা করতে হয়েছে। একদিকে ক্রোয়েগস্-এর request concert আর এক দিকে 'লোক কথা', 'মহাভোজ' বা 'কোর্ট মার্শাল'। একটা total army'র structure কে যখন তুলে ধরতে হয়েছে 'কোর্ট মার্শাল'-এ অথবা সম্পূর্ণ মানবিক অনুপ্রেরণা থেকে শনিচরীর hunger টাকে যখন বের করতে হয়েছে 'রুদালী'তে তখন একটা কথা অস্বীকার করার উপায় থাকে না এরা প্রত্যেকেই বোধহয় কিছু কিছু দিয়ে চলেছে আমার থিয়েটার চেতনাকে। আর এই অভিজ্ঞতা সংগ্রহের কোন শেষ নেই। I am always like a student.

আর একটা কথা, এসব experience কিন্তু শুধু আমার একার হয়নি। There was always a strong group beside me—যারা আমাকে হাতে হাতে সাহায্য করেছে। আমি কখনো একা কোন কাজ করিনি। In the real sense আমাদের রঙ্গকর্মী একটা গ্রুপ; একটা সমুদয় যাকে বলে। A powerful group was always around me all the time assisting me, helping me to question the society.

প্র: আপনার নাট্যচর্চার ক্ষেত্র কলকাতা শহর হলেও ভাষাগত কারণেই এর একটা সর্বভারতীয় আবেদন আছে। 'মহাভোজ' থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম 'খোঁজ'— আপনার নির্দেশিত এই নাট্য পরিক্রমাতেও বৃহত্তর ভারতই উঠে এসেছে বার বার। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই আপনার নাটকের প্রদর্শন হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোতে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দর্শকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

উ: পাঁচ সাত বছর আমি খুব travel করেছি। প্রথম বার আমি মহারাষ্ট্রে গিয়েছিলাম। মহারাষ্ট্র আর পশ্চিম বাংলা, এই জায়গার দর্শকের মধ্যে দেখলাম খুব মিল। এটা বোধহয় rich theatre tradition' এর জন্য। এই দুটো জায়গাতেই টিকিট কেটে দর্শক আসে। Middle class' এর দর্শকই বেশি। তারা যাকে বলে একটা concious দর্শক। মহারাষ্ট্রে আমাদের অভিজ্ঞতা অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের মতই ছিল। আর উত্তর ভারতে আমি দর্শকের মধ্যে একধরনের excitement অনুভব করেছি। তাদের নিজেদের ভাষায় expressionটা তাদের মধ্যে একটা excitement সৃষ্টি করে। তাদের কাছে এটা একটা নতুন ধরনের থিয়েটার। ওখানে এ ধরনের থিয়েটার হয় না। আমাদের total proffessional approach, অভিনয় তাদের attract করে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা মাদ্রাজ গিয়েছিলাম। এর আগে আমরা

কখনো south'এ যাইনি। ছোট বেলায়, কলেজে পড়াকালীন, মনে হোত অহিন্দি প্রদেশে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই হিন্দি বিরোধী। তামিলনাড়ু সম্পর্কেও আমরা একই কথা শুনেছিলাম। কিন্তু National Women's Theatre'এর inauguration-এর জন্য মাদ্রাজে গিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা হল। Inauguration 'রুদালী' দিয়ে হয়। হল ভর্তি তামিল ভাষী লোক। তাদের আশী ভাগ শুধুমাত্র তামিল বোঝে। But they were so excited with this production. নাটকের শেষে তারা আমায় বলে যে তারা সব বুঝেছে। ভাষার কোন সেতু তাদের দরকার হয়নি। শনিচরী বা রুদালীর পুরো ব্যাপারটা তারা বুঝেছে। ভাষাগত বাধা মানুষের তৈরি বলে আমার মনে হয়। আসল মানুষ এগুলি মানে না। যখন কোনও সর্বজনীন অনুভূতি প্রকাশিত হয়— they take it. এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা আমাকে বলতেই হবে। পশ্চিমবাংলা অহিন্দি ভাষী রাজ্য হলেও এখানকার বাঙালি দর্শক ভাবেই না যে আমরা অন্য ভাষায় থিয়েটার করি। মনে করে রঙ্গকর্মীর থিয়েটার তাদের নিজের জমির থিয়েটার।

প্র: আপনি যে সময় থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সেই সময়ে কলকাতার হিন্দি নাট্যচর্চার সঙ্গে বর্তমান চর্চার কোন গুণগত পার্থক্য আছে কি? কলকাতার বাইরের হিন্দি নাট্যচর্চা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উ: যখন আমি থিয়েটার করতাম না, ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, তখন দেখেছি অনামিকা খুব কাজ করছিল। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের উপর নাটক করছিল। তারা 'গোদান' করেছিল, মোহন রাকেশের নাটক করেছিল কিন্তু আমার কেবলই মনে হত যে বৃহৎ পরিবেশে যাবার কোন ইচ্ছে ওদের নেই। একটা বিশেষ শিবিরের দর্শক নিয়েই ওরা খুশি ছিল। আর একটি দল ছিল 'সঙ্গীত কলা মন্দির'। ওখানে আমি কিছুদিন থিয়েটার করেছিলাম। এখানে বেশিরভাগ বাংলায় করা নাটকগুলোই এরা করত। শম্ভু মিত্র 'পাগলা ঘোড়া' করছেন তো এরাও 'পাগলা ঘোড়া' করছে, ওরা 'রাজদর্শন' করছে তো এরাও 'রাজদর্শন' করছে। এভাবেই চলছিল। 'রঙ্গকর্মী'ও প্রথমদিকে তাই করত। বাংলায় 'পুতুল খেলা' হল তো এরাও 'গুড়িয়া ঘর' করল। কিন্তু আমি যখন নির্দেশনা দেওয়া শুরু করি তখন এই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসি। আমাদের ছটা নাটকের মধ্যে কোনও নাটক বাংলার repeat করা নয়। আমরা বিশ্বাসই করি না যে দুটো নাটকের দর্শক আলাদা। দর্শককে এক করার ইচ্ছে বোধহয় ভিতরে ভিতরে আমার ছিল। একটা বৃহৎ দর্শকের কাছে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল। শিক্ষক হোক, শ্রমিক হোক, শহরতলির বাসিন্দা হোক—এই সাধারণ দর্শকের কাছে যাবার ইচ্ছে। 'রঙ্গকর্মী' সব সময়ই একটা হিন্দি থিয়েটারের দর্শক তৈরি করার চেষ্টা করেছে। সেই সময় দেখেছি অনেক নতুন দল তৈরি হল। তাদের অনেকেই কোথায় হারিয়ে গেল। তারা এখন নেই। কেন নেই? তারা কি জানত না তারা কোথায় যাবে?

'অনামিকা'র মত active দলও আজ আর সক্রিয় নেই। 'অনামিকা'তে গিয়ে শ্যামানন্দ জালান এক ধরনের থিয়েটার করলেন। থিয়েটারের মাঝে আবার নাচ ঢুকে পড়ল। থিয়েটার Secondary হয়ে গেল।

আমার মনে হয় 'রঙ্গকর্মী'র মত দল যদি আরো তিন চারটে থাকত— সেটা হিন্দি থিয়েটারের পক্ষে খুব ভাল হত।

প্র: ঠিক এই সময় রঙ্গকর্মী ছাড়া যারা হিন্দি থিয়েটার করছেন তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি কোন optimistic চিত্র দেখতে পাচ্ছেন না?

উ: না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দল বেরিয়ে এসে 'কবিরা খাড়া বাজার মে' করে। ভাবলাম যাক ভাল একটা দল তৈরি হল। কিন্তু আজকাল থিয়েটার করা খুব কঠিন হয়ে গেছে। বেশির ভাগ সময়ই যখন University'র একটা দল থিয়েটার গ্রুপ করে তাদের সে ধৈর্য বা সংযম থাকে না যা দিয়ে লড়াই করে অনেক বছর একটা ব্যাপার টেকাতে পারবে। ছ সাত মাস পরেই দলটা ভেঙে যায়। এদের কোন consistency নেই। Young generation-এর problem—এরা অপেক্ষা করতে চায় না। এই problem টাই হিন্দি থিয়েটারকে affect করেছে।

প্র: বেশ কিছুদিন আগে 'নাট্য চিন্তা' বলে একটি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে আপনি লিখেছিলেন "কলকাতার হিন্দি থিয়েটার চালাচ্ছে ব্যবসায়ীরা"—আজও কি আপনার এই কথা মনে হয়? অন্ততঃ আপনার নাট্যদল রঙ্গকর্মী প্রযোজিত নাটকগুলি দেখবার পর দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কিন্তু ভিন্ন। এ ব্যাপারে আপনি যদি কিছু বলেন।

উ: এটা 'রঙ্গকর্মী'র ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য নয়। 'রঙ্গকর্মী' কলকাতার একমাত্র হিন্দি থিয়েটার গ্রুপ যেখানে নিম্নমধ্যবর্গের লোকেরা আসে। আমাদের কুড়ি বছর টিকে যাবার কারণও হচ্ছে সাধারণ মানুষের Support. কিছু হিন্দি থিয়েটার দেখবে যেখানে এক লক্ষ টাকার একটা পর্দা লাগানো হয়েছে। কিছু নাটক দেখবে— আকাদেমিতে হচ্ছে— দুশো টাকার টিকিট। কারণ নাটকে ফিল্ম-অভিনেতা আছে। এটা কিন্তু হিন্দি থিয়েটারেরই হয়।

এরা ভাবে যদি টাকা ঢেলে নাটকটাকে কোন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়! 'রুদালী', 'কোর্ট মার্শাল'এর popularity দেখে ওরা বোধহয় ভাবে কিছু একটা নতুন করলেই বোধহয় popularity পাবে। It's not so easy!

প্র: আপনার নাটকে প্রায়ই যে ক্রোধ এবং ভায়োলেন্সর প্রকাশ আমরা দেখি তা সমকালীন অন্য পরিচালকদের মধ্যে অনুপস্থিত। আপনি এত রাগী কেন? সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে এই প্রশ্নটা করলাম।

উ: না রাগ না। আমার নাটকে কিছু violent situation আছে। 'লোককথা'য় তো আছেই। 'কোর্ট মার্শাল' এও আছে তবে তা ভীষন restrained—totally coming from words not situations.

এটা আমার ব্যক্তিত্বেও আছে। I don't compromise. I always question my world, my society.

একটা মানুষ দু রকম কথা বললে আমি খুব disturbed হই। যদি দেখি একজন মহিলাকে অপমান করা হল। কেউ কথা বলছে না। ভাবি পুরো সমাজটা এরকম নপুংসক হয়ে যাচ্ছে কেন? Why people are not reacting, questioning? শুধু সহ্য করে যাচ্ছে!

আসলে তথাকথিত liberalisation, globalisation সব কিছু ভেঙে দিচ্ছে। যে আড়াই বছরের শিশুর পূর্ণ বিকাশ হয় নি সেও অশালীন গানের সঙ্গে নাচছে। ষোল বছর বয়সে পৌঁছে সে কি হবে আমি জানি না।

People are not reacting. They are not questioning the media—the violence coming out through it. প্রত্যেকটা শহরে নিপীড়নের ঘটনা ঘটছে। অথচ মানুষ চুপ করে আছে।

টি.ভি.'তে যা সাধারণ হলে যে সব সিনেমা দেখানো হচ্ছে সে সম্পর্কে কোনও সাংসদকে দেখেছ লোকসভায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে? আমাদের মানসিক বিদে মেটানোর জন্য সরকার আমাদের কি দিচ্ছে?

সব জায়গায় corruption, ঘুষ। সবচেয়ে আশ্চর্য সবাই এটাকে সহজভাবে মেনে নিয়েছে। কিন্তু আমি পারিনা। যেদিন পারব সেদিন creat'ও করতে পারব না। আমার creation'এ কোন স্ফুলিঙ্গ বেরোবে না। আমি অন্য মানুষের মত হয় যাবো।

প্র: বেশ কিছুদিন ধরেই সর্বভারতীয় থিয়েটারের ক্ষেত্রে লোকনাট্যের পুনরুত্থানের এক প্রয়াস চোখে পড়ছে। হাবিব তনবির, রতন থিয়াম এমনকি কলকাতার কয়েকজন পরিচালক যেমন বিভাস চক্রবর্তী এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছেন। নাটচর্চার এই ধারাকে আপনি কি চোখে দেখেন?

উ: I always go for experiments. কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব ভয় পাই। এই folk চর্চা যেন শুধুমাত্র চমক দেওয়ার জন্য না হয়।

মাটির মানুষের কাছ থেকে বেরিয়ে আসে যে লোক সংস্কৃতি সেটাকে যদি আমরা আমাদের শহুরে জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারি তো ঠিক আছে। কিন্তু যেন দুটো আলাদা না থেকে যায়।

প্র: সেই চমক দেওয়ার tendency কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন?

উ: হ্যাঁ পাচ্ছি।

প্র: আপনার থিয়েটার চর্চার মাধ্যম হিন্দি হলেও আপনি আমাদের এই কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ভ। আপনার কি মনে হয়— গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন তার অঙ্গীকার (commitment) থেকে অনেক দূরে সরে যায়নি? এই মুহূর্তে কলকাতার বিখ্যাত নাটদলগুলি যে ধরনের প্রযোজনায় আগ্রহী তা কি অনুপুঙ্খ বিচারে নিছক মনোরঞ্জন ধর্মী নয়?

উ: No comments.

প্র: আচ্ছা গুণগত বিচারে এই সব প্রযোজনাকে কি ব্যবসায়িক থিয়েটার আখ্যা দেওয়া যায় না?

উ: আমি একটু স্পষ্ট কথা বলি। আসলে কি জান এই কমার্শিয়াল থিয়েটার আর গ্রুপ থিয়েটারের মাঝখানের দেওয়ালটা খুব সূক্ষ্ম। কে কখন টপকে ওদিকে চলে গেল আবার এদিকে চলে এল সেটা আমরা বুঝতে পারি না তা নয় কিন্তু বলার সাহসটা নেই। সব কিছুই প্রচারধর্মী হয়ে গেছে।

আসলে সব কিছুই saleable. Theatre is today no more than a commodity.

কিন্তু আমার মনে হয় এভাবে আর যাই হোক থিয়েটার হয় না। প্রতি মুহূর্তে যদি ভাবা হয় কি করে নাটক click করবে, কি করে saleable হবে— তাহলে এরকমই হবে যা তুমি দেখছ চারদিকে।

প্র: তাহলে গ্রুপ থিয়েটার বলে আমরা যে সব কথা বলি সে সবই কি আসলে মুখোশ?

উ: আমার মনে হয় না কোন মুখোশ আছে। সবাই জানে কে কি করছে। শুধু বলার সাহস নেই।

তবে একটা কথা, আমি কিন্তু খুব আশাবাদী। ইতিহাস এ সময় থেকে শুধু স্লেটকুই রেখে দেবে যা তার প্রয়োজন। বাকি সব হারিয়ে যাবে। পুপুলার আবেদনের কোন স্থায়িত্ব নেই। এ ধরনের গান বা নাচ দেখবে, এদের চিন্তন কোনও ব্যাপার নেই যে মানুষকে সব সময় নাড়া দেবে।

কিন্তু আমার মনে হয় এই সস্তা থিয়েটারের বাইরেও অনেকে কাজ করছেন। ছোট দল, মাঝারি দল আছে। মহানগরীর বাইরেও আছে। একটা movement উঠে আসবেই। □

সাক্ষাৎকার : অভিজিৎ করণ্ডগু

ক্যান্ডির বৌদ্ধ ভিক্ষু

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

এ লেখা কারুর জন্য নয়। এমন কি নিজের জন্যও নয়। তবে লিখছি কেন? জানি না। একটা কেমন তাগিদ আসছে যা মনে আছে তা লিখে ফেলার জন্য। হয়ত, তাই।

১৯৭৫ সনের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে কলম্বোতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শ্রম মন্ত্রীদের সম্মেলন ছিল। আহ্বায়ক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা। ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব হিসাবে শ্রম মন্ত্রীর সঙ্গে গেছি কলম্বোতে। বছর কয়েক আগের জে ভি পি-র সন্ত্রাসের রেশ তখনও চলছে। সুরক্ষা ব্যবস্থার কড়াকড়ি খুব। শ্রম মন্ত্রীর পি.এস.ও হয়ে এলেন শ্রীলংকার সামরিক বাহিনীর ইনটেলিজেন্সের এক মেজর। খুবই চৌকস ব্যক্তি। ছোট দেশে যেমন হয়ে থাকে, সমাজের ওপর তলার সবাই সবাইকে চেনেন। কারুর সঙ্গে আত্মীয়তা, কেউ স্কুল কলেজের সাথী, কারুর সঙ্গে পারিবারিক বন্ধুত্ব বা শত্রুতা—কিন্তু কারুর অজানা কেউ নন। তখন দেশের প্রধান মন্ত্রী বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান চন্দ্রিকা দেবীর মা সিরিমাভো বন্দরনায়েকে। চন্দ্রিকা দেবী তখন অল্প বয়স্কা তরুণী। বিয়ে হয়নি। ভূমি সংস্কার ও পল্লীসমাজ উন্নয়নে ব্যস্ত। জে. ভি. পি.-র তাণ্ডবের পর দেশের কৃষক সমাজে পার্টির বেস্ তৈরির প্রচেষ্টা। উদ্দেশ্য যাই হোক কাজ ভাল করছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর জাতীয়করণের ঢেউ তখন আশে পাশের দেশগুলিতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শ্রীলংকা সরকারও অন্যান্য কিছু শিল্পের সঙ্গে চা বাগিচা, যেগুলি সবই ব্রিটিশ মালিকানায় ছিল, জাতীয়করণ করেছেন।

জাতীয়করণের ফলে চা শিল্পে সমস্যা সুরাহা হওয়ার চেয়ে বৃদ্ধি পেল। কিছুটা প্রত্যাশিত। সমস্ত পশ্চিমী শক্তিগুলি শ্রীলংকার ওপর মহা ক্ষাপ্পা, তাদের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তিতে প্রচণ্ড আঘাত দেবার জন্য। কিন্তু আর একটি কুফল দেখা দিল যার জন্য শ্রীলংকা সরকার একেবারেই তৈরি ছিলেন না। শ্রীলংকার চা বাগানের শ্রমিক বেশির ভাগই ইনডেনচারড তামিল। উনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায় এঁদের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে নিয়ে আসা হয়—অনেক সময় জোর করেই। যে ভাবে ভারতীয় শ্রমিকদের ফিজি ও ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে সময়। চা বাগানের তামিল শ্রমিক অনেকেই এখন অধুনা শ্রীলংকার নাগরিক। যদিও বেশ কিছু আছেন যাঁদের কোন দেশেরই নাগরিকত্ব নেই। সুপারভাইসরি স্ট্যাফ ও অফিসার যাঁরা স্বাধীনতার আগে সবই বিদেশী ছিলেন—স্বাধীনতার পর তাঁদের বদলে সিনহালাদের নিয়োগ করা হয়। এঁরা সবাই কলম্বো সমাজের উঁচু তলার লোকজনদের আত্মীয়স্বজন, পরিবার বর্গ। টপ ম্যানেজমেন্ট অবশ্য ব্রিটিশদের হাতেই ছিল। এথনিক দিক থেকে দেখতে গেলে, নীচু তলার শ্রমিক তামিল। মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্তীয় অফিসার সিনহালা এবং মালিকানা ও সর্বোচ্চ ম্যানেজমেন্ট ব্রিটিশ। এই সময় শ্রমিক বিরোধের একটা কারণ ছিল তামিল শ্রমিক ও সিনহালা অফিসারদের মধ্যে গোষ্ঠী বিভাজন। কিন্তু ব্রিটিশ মালিকানা থাকা পর্যন্ত সাহেবরা শিল্প বিরোধকে শিল্প বিরোধ হিসেবেই দেখতেন এবং গোষ্ঠী বিভাজনকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেন নি। তাঁরা শিল্প শান্তির জন্য এথ্‌নিক দ্বন্দ্বকে যতটা পারতেন চাপা দিয়ে রাখতেন। এতে দুপক্ষই অখুশি হলেও, সিনহালা অফিসাররা বেশি রেগে যেতেন। জাতীয়করণ ও ব্রিটিশ মালিকদের প্রস্থানের পর চায়ে শিল্প অশান্তির মূল কারণ হলো এই এথ্‌নিক বিভাজন। এতে উৎপাদন বিঘ্নিত হতে লাগলো। সরকার খুবই চিন্তিত হলেন। এবং চা য়ুনিয়নের নেতা তামিল ভাষী শ্রী থণ্ডোমান, যিনি পরে শ্রী জয়বর্ধন সরকারে বহুদিন মন্ত্রী ছিলেন, খুব শংকিত হয়ে পড়লেন। ভারতের শ্রমমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রীসভায় জাতীয়করনের এক মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন। শ্রী থণ্ডোমান

ও শ্রীলংকা সরকারের শ্রম মন্ত্রী ও শিল্প মন্ত্রী ওঁকে অনুরোধ করেন যে স্ট্রেটন হাইলাণ্ডে যেখানে বহু চা বাগান আছে সেখানে বেড়াতে গিয়ে স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের একটু বুঝিয়ে বলতে যে জাতীয়করণ শ্রমিক ও দেশের স্বার্থে কত প্রয়োজন এবং তাঁদের অনুরোধ করতে যে নিজেদের ও দেশের স্বার্থে তাঁরা যেন উৎপাদন বাড়াতে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

ঠিক হলো যে সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ভোর বেলায় বেরুন হবে এবং স্ট্রেটন হাইল্যান্ড ঘুরে দু রাত্রি ও একদিন ক্যান্ডিতে থেকে কলম্বো ফেরা হবে। শ্রম মন্ত্রী আমাকে তাঁর সঙ্গে নিলেন।

ক্যান্ডি বিখ্যাত শুধু তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যেই নয়। এখানে এক প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির আছে যাতে গৌতম বুদ্ধের একটুখানি অস্থি অতি ভক্তিভরে ও সযত্নে সংরক্ষিত আছে। তা দেখার জন্য সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু বৌদ্ধ তীর্থে আসেন ক্যান্ডিতে। সপ্তাহে একদিন এই মন্দির বন্ধ থাকে। সেদিন বাইরের কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয় না। দুর্ভাগ্য বশতঃ যে দিনটা আমরা ক্যান্ডিতে ছিলাম সেটা বন্ধের দিন। আমাদের বেশ মন খারাপ যে ক্যান্ডিতে এসে ওই মন্দিরে যাওয়া যাবে না এবং ভগবান বুদ্ধের অস্থি দেখার সৌভাগ্য হবে না।

পৃথিবীর সব দেশেই রাষ্ট্রীয় অতিথিদের খুব খাতির। বিশেষ করে আমাদের শ্রম মন্ত্রী যখন শ্রীলংকা সরকারের বেসরকারী অনুরোধে এই ভ্রমণ করছেন তাঁর খাতির আরও একটু বেশি। সকালে ব্রেকফাস্টের পর আমাদের সঙ্গী সেই টোকস মেজর সাহেব কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে গেলেন। খানিক পরে ফিরে এসে বিগলিত হাসির সঙ্গে জানালেন যে উনি মন্দিরের প্রধান ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা করে সেদিন বিকেলে মন্দিরে যাবার এবং অস্থি দেখার ব্যবস্থা করে এসেছেন।

যথা সময়ে আমরা হাজির হলাম। সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে পাশের এক প্রাইভেট প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। মাঝ বয়সী এক সৌম্য কান্তি বৌদ্ধ ভিক্ষু আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমার মন্ত্রী সৌজন্যমূলক ভাবে বন্ধের দিন ওঁদের বিব্রত করার জন্য লজ্জা প্রকাশ করলেন। ভিক্ষু জানালেন যে লঙ্ঘিত হবার কিছু নেই কেননা বন্ধের দিন ওঁদের ছুটি থাকে না। সারা সপ্তাহ দর্শনার্থীদের ভিড় কোলাহলে তাঁদের ধর্মীয় ক্রিয়া কর্মের বেশ বাধা হয়, তাই বন্ধের দিন তাঁরা বিশ্রাম না নিয়ে ঐ সব কাজে ব্যস্ত থাকেন।

ভিক্ষু মহাশয় খুব সুন্দর ঝরঝরে ইংরেজি বলেন। পালি ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত। ভারতের সব বৌদ্ধ তীর্থে বহুবার গেছেন। কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে। ভাল হিন্দি বলতে পারেন। আমি বাঙালি শুনে বললেন যে সিনহালারা তো নিজেদের বাঙালিদের বংশধর বলে মনে করেন। আমার গোত্র জানলে উনি বলতে পারবেন আমিও সগোত্রীয় আত্মীয় কিনা। আমার গোত্র বলার পর একটু ভেবে সহাস্যে বললেন যে বহু যুগ পূর্বে বৌদ্ধ হবার আগে তাঁদের পূর্বপুরুষদের এই গোত্রই ছিল তা উনি ওঁর পরিবারের বৃদ্ধ গুরুজনদের কাছে শুনেছেন। তাই ভিন দেশের সগোত্রীয় ভাইকে দেখে ওঁর বেশ মজাও লাগছে ও আনন্দ হচ্ছে।

সৌজন্যমূলক আলাপের পর উনি আমাদের বিহার দেখাবার জন্য উঠলেন। উঠার আগে বললেন যে যদিও উনি নিজে বিশ্বাস করেন না, তাও যেহেতু কিছু ভারতীয় হিন্দু দর্শনার্থীদের কাছ থেকে পরে শুনেছেন তাই বলছেন ভবিষ্যতের কোন রকমের অপ্রীতিকরতা এড়াবার জন্য। উনি শুনেছেন যে বুদ্ধদেবের অস্থি দর্শনের পর ওঁদের কারুর কারুর পরিবারে অমঙ্গল ঘটেছে। উনি অবশ্য একথা একেবারেই মানতে রাজি নন— কেননা শান্তি, মোক্ষ, ও নির্বাণের প্রতিমূর্তি ভগবান বুদ্ধ কখনও কোনদিন কারুর অমঙ্গল বা ক্ষতি করতে পারেন না। যা শুনেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে হয়তো সেগুলি কার্যকারণ বিহীন "কয়েনসিডেন্স"।

উনি খুবই যত্ন করে সব দেখালেন। ঘন্টা দেড়েক ঘোরার পর জলাহারে আপ্যায়ন করে আমাদের বিদায় দিলেন। তারপরের দিন ভোর বেলায় রওয়ানা হতে হবে কন্‌ফারেন্সে সময়মত পৌঁছবার জন্য। তাই তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে শুয়ে পড়লাম।

সাধারণত আমি বিছানায় শুলেই ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সেদিন কিছুতেই ঘুম আসছিল না। যদিও কোন কারণ নেই, তবুও মনটা খুব আনচান করতে লাগলো। এই করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা।

মনে হোল আমার বাবা আমাকে বলছেন যে "শরীরটা বড় খারাপ, পারলে তুই একবার ঘুরে যাস। তাহলে দেখা হবে।" ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মনে পড়ে গেল আগের দিন বিকেলে বৌদ্ধ ভিক্ষুক কথা। বাবা অসুস্থ ছিলেন বেশ অনেকদিন থেকেই। প্যারাব্রেজিয়া— নার্ভাস সিস্টেমের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন ক্রমশঃ। আসার দুদিন আগে বাড়িতে কেমন আছেন জেনে তবে রওয়ানা হয়েছি। এ কদিনে কি হতে পারে? ততক্ষণে অন্ধকার পাতলা হতে আরম্ভ করেছে— আর না শুয়ে কলম্বো ফেরার জন্য তৈরি হতে আরম্ভ করলাম। মন বেশ খারাপ। খচ খচ করতে লাগলো— কেনই বা ছুটির দিনে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে অস্থি দেখে এলাম। যদি কোন অঘটন ঘটে যায় আমাকে খবর পাঠানো মুস্কিল হবে।

কলম্বো পৌঁছেই বাড়িতে ফোন করলাম। মার সঙ্গে কথা হলো মা বললেন যে আমি যেদিন দিল্লি থেকে রওয়ানা হয়েছি সেদিন বিকেল থেকে হঠাৎ বাবার শরীর বেশ খারাপ হয়।

পারিবারিক চিকিৎসক ভয় পেয়ে তাঁর সিনিয়র বিশেষজ্ঞকে ডেকে তাঁর পরামর্শে চিকিৎসা আরম্ভ করেছেন। তীব্র শংকার ভাব কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কাজেই আমাকে তক্ষুণি ছুটে আসতে হবে না। তবে দিল্লি ফেরত গিয়ে সম্ভব হলে একবার কলকাতা এলে ভাল হয়। মার মনের জোর খুব বেশি এবং দারুণ সাহসী ও কর্মঠ। কাজেই বিদেশে আমাকে ভয় পাওয়াবেন না ব'লে যতখানি ভাল বলা যায় তাই বলেছেন। কিন্তু ব্যাপার যে খুবই গুরুতর তা বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না।

মন্ত্রীমশায়কে গিয়ে বললাম বাড়ির খবর। শুনেই তিনি বললেন যে সেদিনই মাদ্রাজ রওয়ানা হয়ে পরের দিন ভোরে কলকাতায় যেতে। আমাদের নির্ধারিত সময়সূচী মত সেদিন থেকে তৃতীয় দিনে কলম্বো ছাড়ার কথা। মাসের শেষ। হাত খালি। দিল্লিতে স্ত্রী ও কন্যা রয়েছেন। তাদের হাতেও বেশি কিছু থাকার কথা নয় এবং কি থাকতে পারে তার আন্দাজ আমার আছে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি দিল্লি হয়ে মাইনের টাকা হাতে নিয়ে ক'লকাতায় যাওয়া যায়। কন্‌ফারেন্সে শেষ পর্যন্ত থাকবো না, কিন্তু দিল্লি হয়ে যাবো এই ঠিক করে টিকিটের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলাম।

কনফারেন্স শুরু হবার একটু পরেই দেখি শ্রীলংকায় ভারতীয় রাজদূত আমার মন্ত্রীর হাতে একটা কাগজ দিলেন। কাগজটি পড়ে বেশ ব্যস্ত হয়ে মন্ত্রী আমার খোঁজ করলেন। কাছেই ছিলাম তাড়াতাড়ি হাজির হলাম। শুনলাম প্রধানমন্ত্রী কাল সকালের মধ্যে ওঁকে দিল্লিতে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। তখন এমারজেন্সি চলছে। এই হঠাৎ ডেকে পাঠানোর অর্থ জেল, বাড়িতে নজরবন্দী, বরখাস্ত, পদোন্নতি যা কিছু হতে পারে। মন্ত্রী একটু ম্লান হেসে বললেন যে ভিক্ষু যা বলেছেন তার পরীক্ষা আগামী কাল দিল্লিতে হবে। তবে ভিক্ষুর কথার প্রক্রিয়া একেবারে রাত না পোহাতেই শুরু হবে সেটা ভাবতেই পারেন নি। যাইহোক সেদিন সন্ধ্যেয় মাদ্রাজ হয়ে পরের দিন সকালে দিল্লি পৌঁছলাম।

দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি পৌঁছে তৈরি হয়ে অফিসে যেতে সেদিন একটু দেরি হয়ে গেল। গিয়ে শুনলাম মন্ত্রী দপ্তরে এসে গেছেন। একটু ভয়ে ভয়ে ওঁর একান্ত সচিবকে জিজ্ঞেস করলাম মন্ত্রীর মেজাজ কেমন? ওর সপ্রতিভ উত্তর "বেঁচে বে মজেমে হেঁ।" এই শুনেই আমি ওঁর ঘরে ঢুকে পড়লাম। আমাকে দেখে হেসে বললেন ভয়ের কিছু নেই। একটা গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক কাজে প্রধানমন্ত্রী ওঁকে বাইরের কয়েকটা দেশে যেতে বলেছেন এবং উনি পরের দিনই রওয়ানা হচ্ছেন। উনি বাড়িতে ফিরেই খবর পান যে ওঁকে তখনি ১নং সফদারজঙ্গ রোডে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি যেতে হবে। উনি সেখান থেকে ঘুরে অফিসে এসে আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আমার কলকাতা যাবার ব্যবস্থাও যতদিন দরকার হয় সে ছুটি মঞ্জুর করে উনি বাড়ি ফিরবেন বিশ্রামের জন্য। ঘর থেকে বেরুবার সময় বললেন যে ভিক্ষুর কথা যেমন ওঁর বেলায় ফলে নি তেমনি আমার বেলাও খাটবে না। আমার মনে সত্যিই বেশ সাহস ফিরে এলো এবং মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল।

কলম্বোতে খবর পাবার চতুর্থ দিনে আমি বাড়িতে এলাম। বাবা তখনও শয্যাশায়ী— ড্রিপ চলছে। আমার পৌঁছবার সময় আন্দাজ করে মা আমাদের পারিবারিক ডাক্তারকে আসতে বলেছেন। তিনি আবার তাঁর সিনিয়র ডাক্তারকেও ডেকে এনেছেন। একটা মেডিক্যাল কনসালটেশন কনফারেন্স হলো। যা শুনলাম বাবার অবস্থা বেশ খারাপ হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসায় রেসপণ্ড করায় এ যাত্রায় টাল সামলে উঠেছেন। এখন আংশিক নিরাময়ের পথে। সব নির্দেশ ঠিকমত মানলে দিন দুয়েকের মধ্যে বিছানা ছেড়ে দুইল চেয়ারে বসানো যাবে এবং পড়ার টেবিলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন যে আমি যেন কদিন থেকে যাই এবং ওঁকে জিজ্ঞাসা না করে যেন না ফিরি। আমার উপস্থিতিতে বাবার মনোবল অনেক বেড়ে যাবে যাতে আসল অসুখটা না কমলেও আনুষঙ্গিক অসুখগুলো তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

দুদিন পরে বাবাকে দুইল চেয়ারে বসানো হলো। সকালে পড়ার টেবিলে গিয়ে খবরের কাগজ ও চিঠিপত্র যা এসেছিল সেগুলো সব পড়লেন। তারপর স্নান করিয়ে খাইয়ে শুইয়ে দেওয়া হলো। বিকেলে বাবাকে নিয়ে গেলাম বাইরের বারান্দায় দুইল চেয়ারে করে। বাবার বহির্গত তখন ঘরের সামনে বারান্দাটি। বাবার মন বেশ প্রফুল্ল। এমারজেন্সির ওপর অনেক প্রশ্ন করলেন। দিল্লির রাজনৈতিক অবস্থার ওপর অনেক জিজ্ঞাসা ছিল ওঁর। খবরের কাগজে সেন্সরশিপ চলছে। খবর পাওয়া যাচ্ছেনা। তাই এত প্রশ্ন।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করলেন আমি সম্প্রতি কালে কোন বৌদ্ধ শ্রমনের সঙ্গে দেখা করেছি কিনা? প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম "কেন বলুন তো?" বাবা বললেন অসুখের ভেতর, কোন দিন তা মনে নেই, আমি কেমন আছি এবং কোথায় আছি এই নিয়ে ওঁর খুব চিন্তা হচ্ছিল। তিনি তখন ওষুধের ঘোরে ও রক্তে যুরিয়ার আধিক্যে বেশ আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। সেই আচ্ছন্নের ঘোরেই ওঁর মনে হলো এক সৌম্যকান্তি বৌদ্ধ ভিক্ষু অভয়মুদ্রায় হাত দেখিয়ে বাবাকে আশ্বস্ত করছেন যে আমি ভাল আছি। ঘুমের

ঘোরটা কেটে যেতেই বাবা দেখেন যে একজন ডাক্তার তাঁর হাতটা বাবার চোখের খানিকটা ওপরে নাড়াচ্ছেন আর জিজ্ঞাসা করছেন যে হাত নাড়াটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন কিনা।

পরে বাবা ও মাকে অনেক প্রশ্ন করে যা বুঝলাম তা হচ্ছে যে আমরা সে বিকালে ক্যান্ডির বৌদ্ধ বিহারে যখন সেই ভিক্ষুর সঙ্গে কথা বলছি—সেইদিন সেই সময়ে বাবা আচ্ছন্ন অবস্থায় এক ভিক্ষুর কাছ থেকেই আমার কুশল সংবাদ পাচ্ছেন। কোথায় শ্রীলংকার ক্যান্ডির বৌদ্ধ মন্দির আর কোথায় কলকাতার নিউ আলিপুরে আমাদের বাড়ির একতলায় রোগ শয্যায় আমার বাবা। ভিক্ষু ঠিকই বলেছিলেন যে ভগবান বুদ্ধের অস্থি দর্শনে কারুর অমঙ্গল হয় না। যদি কিছু হয় তা হচ্ছে অমঙ্গলের সংকেত আগে পাওয়া যায় তার সম্ভাব্য প্রতিকারের জন্য।

বাবার সঙ্গে আমার এই কথা হয়েছিল ৪ঠা অক্টোবর ১৯৭৫ সন—পূজোর সময়। সে বছরেই ১লা ডিসেম্বর বাবা চলে যান। এ বছর—১৯৯৫ সনে ৪ঠা অক্টোবর বিকেলে সেই সময়, সেই বারান্দায়, সেই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম। বর্ষণ সবে একটু ধরেছে। ছেঁড়া মেঘের ভেতর দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে বারান্দায়। হঠাৎ স্মৃতি পটে জ্বলজ্বল করে ভেসে এলো সেই কুড়ি বছর আগের ঘটনা। □

বাংলাদেশে চতুরঙ্গের পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ, ১৭/এ, আজিজ মার্কেট,
শাহবাগ, ঢাকা

শব্দানুষঙ্গে কাব্যবিচার

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আর্টের বাংলা প্রতিশব্দ হলো শিল্পকলা। আর্টের লক্ষ্য হলো সুন্দরকে সৃষ্টি করা। সে সুন্দর প্রকৃতির অনুকরণ নয়। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে শিল্পীর ধারণা, অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তি শিল্পকর্ম রচনায় সাহায্য করে। তাই প্রচলিত অর্থে যা সুন্দর বলে স্বীকৃত অর্থাৎ আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিশুকাল থেকে যে সব নয়নাভিরাম ও শ্রুতিমধুর বস্তুকে সুন্দর বলে আমাদের মনে গেঁথে দেয়, শিল্পী সব সময় তা যে মানা করেন, তা নয়। বরং যে রচনার মধ্যে তিনি তাঁর আবেগকে সম্পূর্ণভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে ঢেলে দিতে পারেন, তিনি তাকেই শিল্প বলবেন। এই যে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, তার পেছনেও আছে অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তি। এবং তারও পেছনে হয়তো আছে অতীত স্মৃতি যা উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি বহন করছেন। আবেগকে প্রকাশ করলেই হলো না, আবেগকে সঞ্চারিত করাও শিল্পের উদ্দেশ্য।

এর জন্য শিল্পীকে এক-একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এক একটি মাধ্যমকে ধরতে হয়। আর, সেই মাধ্যম ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। অতএব শিল্পসৃষ্টির কাজে প্রতিভার পাশাপাশি দক্ষতারও একটা বড়ো ভূমিকা থাকছে। চিত্রকরের হাতে যেমন রং আর ড্রইং। ভাস্করের আয়ত্তে যেমন কাদা, ধাতু, পাথর আর অভ্রান্ত আঙুলের প্যাঁচ। সঙ্গীতকারের দখলে যেমন সুর আর লয়। এর অভিঘাত সরাসরি শ্রোতা বা দর্শকের কাছে পৌঁছে যায়। চোখ কান খোলা রাখলেই যে ভোক্তা, তার উপভোগের দরোজা খুলে যায়। সৃষ্টি হয় মাধুর্য।

সাহিত্য হলো শিল্পসৃষ্টির আর একটি পথ বা পদ্ধতি। এর অবলম্বন হলো ভাষা। ভাষা কী? না, বিভিন্ন শব্দ দিয়ে তৈরি একটি সংকেতের কোষ। শব্দগুলি আবার কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি। অক্ষরগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়মে, যে-নিয়মের নাম ব্যাকরণ, একত্র করলে অর্থব্যঞ্জক শব্দ পাওয়া যায়। ব্যঞ্জক বললাম এই কারণে যে, শব্দের অভাবে কোনো অর্থ নেই, অর্থ তার ব্যঞ্জনায়। যেমন, ধরা যাক, গরু। 'গ' আর 'রু'—এই দুটি অক্ষর পাশাপাশি বসিয়ে যে শব্দটি তৈরি হলো, তার সঙ্গে গরুর চেহারার কোনো মিল নেই। বা, 'ভালোবাসা' আকার-ওকার মিলিয়ে বিচিত্র নক্‌শার চারটি অক্ষর ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেও ভালোবাসা বলতে আমরা যা বুঝি, তার ইংগিত পাওয়া যাবে না। এগুলো সংকেতচিহ্ন বা কোড। মুখের কথাকে লিখে জানাবার একটি প্রক্রিয়া, যা আমাদের অনেক পরিশ্রম করে শিখতে হয়। পাঠ করার সময় প্রকৃতপক্ষে সঙ্গে সঙ্গে পাঠোদ্ধার করতে হয় আমাদের। সংকেত থেকে অর্থে অনুবাদ করতে হয়। এক ভাষাভাষী মানুষ যে আর এক ভাষার সাহিত্য উপভোগে অক্ষম, তার কারণ এই সাংকেতিকতা।

যে কথা আমরা কোনোভাবে বোঝাতে পারি না, তাই কবিতায় বোঝাবার বা বলবার চেষ্টা করি। সুতরাং আর যে-সব পাঠ্যবস্তু আছে—যেমন, সংবাদ, বিজ্ঞাপন, গল্প বা উপন্যাস—বা প্রবন্ধ—সেখানে ভাষার কাজ মূলত বর্ণনা করা, জানানো। দু-কথায় না শানালে চারকথায় বললে চলে। ব্যাখ্যা করে দিলে পাঠক অর্থটা ধরে ফেলে। বুদ্ধির উপস্থিতির দিয়ে এদের গমনাগমন। কবিতার গতায়াত অনুভব থেকে অনুভবে। তাই ভাষার কাজ সেখানে সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট খানিকটা। ভাষার ব্যবহার সেখানে গদ্যের মতো অপরিমিত না। ব্যাখ্যা করার ঢালাও ব্যবস্থা কবিতায় নেই। আকারে সে ছোট, আঁটোসাঁটো। গদ্যের মতো এলানো নয়। অবারিত নয়। শিল্পী হিসেবে কবি আবার তার মধ্যে নানান কৌশল ঢুকিয়ে দেন। শব্দকে, বাক্যকে এদিক ওদিক টিপেটুপে দেন, পাঠক যাতে রহস্যের গন্ধ পায়। বারবার পড়ে। তিনি যে অত্যন্ত গোপন উপলব্ধির কথা বলছেন,

হয়তো কোনো নিষিদ্ধ ব্যক্তিগত অনুভবের কথা, স্বপ্নের কথা! লিখিতভাবে তো ফিশফিশ করা যায় না। তাঁকে একটু লুকোচুরি খেলতেই হয়। অতএব শব্দ ব্যবহারে, শব্দের সঙ্গে শব্দের অন্বয়ে— তিনি ভারি সতর্ক।

কবির সঙ্গে পাঠকের এই লুকোচুরি খেলা অনেকদিন ধরেই চলছে। পাঠক চাইছে কবিকে সম্পূর্ণভাবে ধরতে, বুঝতে, তাঁর অভিপ্রায় পুংখানুপুংখরূপে জানতে। এক-একজন পাঠক এক এক রকম মানে করছে কবিতার। কবি আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসছেন মিটিমিটি, কিছুতেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন না। দিলেও যে খুব একটা সুবিধে হয়, তা নয়। কেন না, লেখার সময় চূড়ান্ত মনোযোগ আর চূড়ান্ত কল্পনার সমন্বয়ে যে তৃপ্তী মনোভাব তৈরি হয়, পরে তা আর বজায় থাকে না। লেখা সারা হয়ে গেলে কবি স্বভাবতঃ সেই অসহ্য কষ্টের জায়গা থেকে সরে আসেন। পালিয়ে আসেন বলা যায়। পুনরায় সেখানে ফেরা আর সম্ভব নয়।

সরল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সমস্যার সমাধান হবার নয়। যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত পরীক্ষা করে বলা যায়, তার মধ্যে শ্বেতকণিকা কত, তার মধ্যে শর্করা আছে কিনা। রোগের জীবাণু থাকলে তাও শনাক্ত করা যায় অনুবীক্ষণের সাহায্যে। কিন্তু কবিতা রক্তের চেয়েও গাঢ় ও জটিল এক যৌগ। তার মধ্যে বস্তু আছে, মন আছে। উপরন্তু, তা যে সাংকেতিক পদ্ধতিতে লেখা। রং বা সুর দিয়ে আঁকা নয়। যে প্রক্রিয়ায় কবি কাজ করেন, তাতে 'চাঁদ' বললে 'মুখ' বোঝাতে পারে। 'পাখির বাসা' বললে 'প্রিয়তমার চোখও' বোঝায়। সেখানে অনেক সময়ে 'হ্যাঁ' মানে 'না'। 'যাও' মানে 'এসো'।

কিন্তু বিজ্ঞান তো হাত ছেড়ে দিয়ে চুপ করে থাকার বান্দা নয়। সে তার অনুসন্ধানের নাকটি মনের দিকেও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মানুষের মন বড়ো জটিল। কিসে কী প্রতিক্রিয়া হয়, আগে থেকে বলা যায় না। লোকে বলে রহস্যময়। কেউ বলে কুহেলিকা। কেউ বলে, তল পাওয়া ভার। স্ত্রীলোকের মন সম্পর্কে পুরুষদের চিরকালীন অভিমত, দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ! পুরুষদের সম্পর্কে অনুযোগ। পেটে পেটে দুষ্টু বুদ্ধি, মুখ দেখে মনে হয়, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। বাবা বলে, এত কষ্ট করে পড়লাম, ক্লাসে প্রথম হতে পারলে না? অমনি মেয়ে আসিস খেয়ে আত্মহত্যা করলো। একমাত্র সন্তান, বাপমায়ের চোখের মণি, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে রেলস্টেশনে শুয়ে থাকে। চারদিকে খেলনার পাহাড়, মাঝখানে বসে শিশু কাঁদে। এসবই মনের মধ্যেকার রহস্য— রহস্যের আর এক নাম অজ্ঞতা। যখন আমরা সূর্য প্রণাম করতে শিখেছি, তখন ভাবতাম, সূর্যই বুঝি পূব আকাশে উদিত হন। পশ্চিম আকাশে অস্ত যান। সূর্যের ঘোড়া, সূর্যের রথ, নিয়ে কত গল্প আছে। মহাকাশ বিজ্ঞান এসে একে একে অনেক রহস্য মোচন করে দিয়েছে। মনস্তত্ত্ব এসে খোঁজাখুঁজি করছে সচেতন, অবচেতন আর অচেতন স্তরের গলিঘুঁজি।

আগে আমরা কারুর মধ্যে খুব বেশি অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখলে এক কথায় বলে দিতাম, লোকটা পাগল। অল্প স্বল্প হলে বলতাম, ছিটগ্রস্ত। মনস্তত্ত্ব এসবের অবস্থা ও কারণ নির্ণয় করে, এখন বলে, পাগল বা ছিটগ্রস্ত বলে মনোরোগীকে খারিজ করে দেওয়া সংগত নয়। অস্বাভাবিকতারও একটা ধরন আছে। রকম ফের আছে। নানা শ্রেণীতে তাদের শনাক্ত করা যায়। চিকিৎসা করা যায়। যেমন, উদাহরণ দিয়ে বলি, উদ্বেগে যারা ভোগে, তারা চার রকম।

উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ কী? উদ্বেগ হলো পরিবেশ থেকে গজিয়ে ওঠা, মনের ওপর একটা চাপ, একটা পীড়ন, সূক্ষ্ম পীড়ন— মানুষটি যা সামলে দিতে পারে না। তাই অসহায় বোধ করে। এই রকম চলতে থাকলে ওই ভাঙ্গনকৃ মনের অবস্থা তার স্বভাবে এসে দাঁড়ায়। কেউ সব তাতেই উদ্বিগ্ন বোধ করে, কারণটা তুচ্ছ হোক বা গুরুত্বপূর্ণ হোক। কেউ আবার কোনো একটা অবস্থান থেকে উদ্বেগ কুড়িয়ে নেয়। তা হলে কী হবে? এই আতঙ্কে তার বুক ধড়ফড় করে, দম বন্ধ হয়ে আসে, ঘাম হয়, রাত্রে ঘুম হয় না। কেউ বদ্ধ ঘরে থাকলে বা উঁচু জায়গায় উঠলে বা অপরিচিত লোকের সামনে এসে পড়লে অস্বস্তি আর উদ্বেগে কষ্ট পায়। কারুর আবার মাথায় একটা চিন্তা ঢুকে গেলে তা বেরোতে চায় না। বেড়াতে বেরিয়ে মাসিমা যেমন কেবলই মেসোমশাইকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ গো, বাইরের দরোজার তালাটা টেনে দেখেছ তো? ভেতরের ঘরে খিল দিয়েছ তো? ফ্রিজটা বন্ধ করে এলাম কিনা মনে পড়ছে না। মেসোমশাই যদি বলেন, হ্যাঁ সব ঠিক আছে, এখন চলো তো, তাতে মাসিমা রেগে যান। পিসিমার আবার অন্যরকম বাতিক: পরিচ্ছন্নতা। নোংরা আর দূষণ থেকে বাঁচার চেষ্টা। সারাদিন ধরে বারবার হাত ধুচ্ছেন, পা ধুচ্ছেন, কাপড় ছাড়ছেন। জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে হাতে পায়ে হাজা হয়ে গেছে, বুঝছেন এটা বাড়াবাড়ি, তবু না করে পারছেন না।

এর প্রত্যেকটি মানসিক রোগ। এবং এদের চিকিৎসা আছে। অসুখ শনাক্ত না করলে তো আর চিকিৎসা করা যায় না। মনস্তত্ত্ববিদ্ যাঁরা, তাঁরা ক্রমে ক্রমে এইরকম ঢের মনের বিকার শনাক্ত করেছেন। মনের আকারও শনাক্ত করেছেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও মানবগোষ্ঠীর মধ্যে। এই কাজে তাঁদের সহায়তা করেছে যত না রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার চেয়ে বেশি সংখ্যাবিজ্ঞান বা statistics। অনেক লোকের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে একটা ঝোঁক তাঁরা ধরতে পারেন। তা থেকে কোনো একটা গূঢ় কারণ আবিষ্কৃত হয়ে যায়। শুধুমাত্র আদম সুমারি বিশ্লেষণ করে সমাজের মধ্যেকার কত নিহিত সত্য যে সংখ্যাতাত্ত্বিকদের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আজ সর্বত্রই এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, যারা কবিতা লেখে তারা সবাই অপ্রকৃতিস্থ না হলেও কবিদের এক-এক দিকে ঝোঁক থাকে। তা থেকে তাদের মানসিকতা বোঝা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, ফলিত অংকের এই প্রক্রিয়ায় শিল্পকলার কোনো বিচার কি সম্ভব? যে বস্তু বিমূর্ত, মনের গভীর স্তরে যে সৃষ্টির উৎস, যার ব্যাখ্যা হয় না, অঙ্কের আওতায় তার হিসেব নিকেশ কী করে হবে? কী সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে সংখ্যার সঙ্গে সংখ্যা মিলিয়ে? আমাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হলো, হবে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, অঙ্কের নিয়মে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে, প্রকৃতি আর প্রাণীর জীবনে, পুনরাবৃত্ত পরম্পরায় বিবর্তন ঘটেছে, তখন পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ই গভীরতম স্তরে অঙ্কের বিষয়। মন বা হৃদয়— যার অবস্থান বুকে নয় মস্তিষ্কে, সেই মস্তিষ্ক বা স্নায়ুকেন্দ্র তো আসলে একটি অতি জটিল কম্পুটর। আমাদের দুঃখ, বেদনা, আনন্দ জৈব তাড়না, মৃত্যুচিন্তা— সবই আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গ্রন্থিগুলির সঙ্গে যুক্ত ওই স্নায়ুকেন্দ্রেই পরিচালনা করছে। আমাদের এই দেহযন্ত্রেই সব আছে— আত্মা এবং ঈশ্বর অবধি— তা হলে, যন্ত্রগণেশ কেন নির্ণয় করতে পারবে না শিল্পকলার গূঢ়তা, গোপনতা, বিমূর্ততা? আসলে, আমাদের মাথার মধ্যেকার কম্পুটরকে পুরোটা জানা হয় নি। জানার চেষ্টা করছে বিজ্ঞান। আমাদের এই সব কথা শুনে যদি ভয় হয়, যেদিন সবটা জানা হয়ে যাবে, সেদিন শিল্পকলার আর প্রয়োজন থাকবে না। উঠে যাবে কবিতা। অবাক হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে আর কী দিয়ে কবিতা হবে? তখন থাকবে জ্ঞানপাপীদের জন্যে উপাদেয় সব বিজ্ঞান।

এত বড় করে আলোচনাটা ফাঁদলাম একটি সামান্য বিষয়ে কথা বলবো বলে। বিষয়টি হলো— কবিতার শব্দানুষঙ্গ, যাকে ইংরেজিতে বলছে concordance। Concordance-এর আভিধানিক অর্থ হলো, লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দাবলির বর্ণানুক্রমিক সূচি।

এই ব্যাপারে আমার প্রথম কৌতূহল জাগে একটি খবর পড়ে। খবরটি হলো, Indian Statisticasl Institute এর সভা ডাঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক রবীন্দ্রকাব্যের Concordance তৈরি করছেন টোকিও বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাহায্যে। ডাঃ মল্লিক রচিত অপরাধ জগতের শব্দকোষ তখন আমি সংগ্রহ করেছি। তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করে জানলাম, গীতাঞ্জলির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু প্রকাশিত হয় নি। কাজ চলছে। তারপর বিশ্বভারতীর কাজে শান্তিনিকেতনে এসে আর একটি কাজের সন্ধান পাই। এবং সেই কাজটি ঘাঁটতে গিয়ে জানতে পারি, ইতিপূর্বে তিন জন বিদেশী কবি—Mathew Arnold, W.B. Yeats, এবং William Blake-এর সমূহ কাব্যের Concordance গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ রচিত ইংরেজি কাব্য 'Savitri'-র ও একটি Concordance নাকি আছে। তা ছাড়া, অন্য সূত্রে আমি খবর পেয়েছি, স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত রচনা ও বক্তৃতার Concordance প্রস্তুতাধীন।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্র Concordance টি অসম্পূর্ণ। কম্পুটরে প্রস্তুত আটটি খণ্ডে 'কবিকাহিনী' থেকে 'সোনার তরী' পর্যন্ত প্রথম দিককার দশটি কাব্যগ্রন্থ— তার প্রতিটি শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা সেই শব্দবহী পংক্তি সহ মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডে শুধু স্বরবর্ণ। আর সেই সঙ্গে একটি ভূমিকা। ভূমিকায় পরিকল্পনাটির বিবরণ আছে। স্বাক্ষর করেছেন শ্রী নরেশ গুহ। Yeats এর বইটিও সেখান থেকে পেয়েছি। মিলিয়ে দেখেছি— প্রায় একই রকম তার ছক। কেবল সেই বইয়ের শেষে কোন্ শব্দ কতবার ব্যবহৃত হয়েছে কবির কাব্যে, তারও তালিকা আছে একটি, যা রবীন্দ্রগ্রন্থটিতে নেই। সুতরাং তিন হাজার পৃষ্ঠা ঘেঁটে আমার পছন্দের শব্দগুলি আমি নিজেই গুনে নিলাম।

ইতিমধ্যে দেশ পত্রিকার ৪/১১/৯৫ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত ভক্তিবাবুর একটি চিঠি থেকে আরো যে তথ্য পাওয়া গেল, তা হলো, ওই টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় গত বছরেই 'কথা ও কাহিনী'র শব্দ চয়ন পঞ্জি প্রকাশ করেছে— অধ্যাপক টি. নারার তত্ত্বাবধানে। এবং এই কাজে ভাষা বিজ্ঞানী সংখ্যাবিজ্ঞানী, কম্পুটার বিজ্ঞানী ও সংস্কৃত পণ্ডিতরা অনেকে যুক্ত।

তালিকা আছে অথচ নির্ণয় নেই। সেইটেই তো সবচেয়ে জরুরি। আমার কৌতূহল তো সেখানেই। কোন্ কোন্ শব্দের প্রতি কবির ঝোঁক। কেন? কতগুলি শব্দ নিয়ে কবি কাজ করেছেন? আমি সামান্য লেখক, গবেষক নই, বিজ্ঞানী তো নইই। তবু, আমার সীমিত সাধ্য আর সামান্য সময়ের মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ ধরার চেষ্টা করেছি। Yeats এর সম্পূর্ণ কাব্য বনাম রবীন্দ্রনাথের প্রথম দশটি।

একটি সাধারণ অভিধানে আমরা কতগুলি শব্দ পাই? কমপক্ষে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার। ইংরেজি ভাষার শব্দ সম্পদ বাংলার চেয়ে ঢের বেশি। দেখছি ইয়েট্‌স এবং আর্নল্ড

উভয়েই সর্বসাকুল্যে দশ হাজারের কিছু অধিক শব্দ নিয়ে তাঁদের কাজ করে গেছেন। মাত্র দশ হাজার! রবীন্দ্রনাথের বেলা সেটা সাত হাজারের মতো। যতি চিহ্ন আর বানান বিভেদের কারণে এক শব্দ বারবার এসেছে। অব্যয় ছাড়া শুধু মৌলিক শব্দ প্রয়োগ ধরলে হিশেবটা আরো কম হবে। হয়তো ছ'হাজারের মতো। তাই বা কম কী? ইংরেজির তুলনায় বাংলা ভাষা বেশ দরিদ্র। সমার্থক শব্দ তাতে খুব বেশি নেই, আমরা জানি।

ওই ক'টি রবীন্দ্রকাব্যে 'সুখ' শব্দটি আছে ৮৭ বার, 'দুঃখ' ৩২ বার মাত্র। 'জানি' ২৩ বার, 'জানি না' ৭১ বার, 'কী জানি' ৩১ বার। এ থেকে কি তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের কোনো হদিশ মিলবে? 'আমি' আর 'তুমি'—সেই সঙ্গে সহজাত 'মম', 'মোর', 'আমার' 'আমায়' এবং সেইভাবে 'তব', 'তোমার', 'তোর' প্রভৃতি মিলিয়ে শব্দগুলি প্রায় ২০০০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তমপুরুষ আর মধ্যমপুরুষ প্রায় সমান সমান। হৃদয় সংক্রান্ত শব্দ ৫৪৭ বার, ঘুম-সংক্রান্ত ২৪২। জাগো ৫ বার। Yeats এর কাব্যে একা ১২৩২ বার। যেখানে সম্মুখবর্তী You মাত্র ৭১৬। বাংলায় সর্বনাম ক্রিয়াপদকে বিকৃত করে। ইংরেজিতে প্রায়ই তারা তফাতে থাকে। রবীন্দ্রনাথে দাবিব্যঞ্জকে শব্দ 'দাও', 'দে', 'চাই' (তাকাই অর্থ বাদ দিয়ে) যেখানে ১৫২ বার, সেখানে অর্পন-ব্যঞ্জকে শব্দ 'নাও', 'লহ', 'নে' ('না' অর্থ বাদ দিয়ে) তিন মিলিয়ে সব গুচ্ছ ২৯ বার মাত্র। হাসি ও হাসিবদ্ধ শব্দ ৪৫৪ বার, অশ্রু মাত্র ২৭ বার। বিষাদ ১৯। ভাই শব্দটি সহোদর অর্থে ১২ বার, বন্ধু অর্থে ৩৭ বার।

ফুল নিয়ে বাড়াবাড়ি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে থাকবেই। তবে একা 'ফুল' শব্দটি আছে ১২১ বার। ফুলকে ব্যবহার করে সমস্ত শব্দ যোগ করলে হয় ৩৬০। ফুল নিয়ে যৌগশব্দ অনেক, যেমন ফুলদল, ফুলচয়, ফুলপরিমল, ফুলবালাদল, ফুলবাস, ফুলভার, ফুলমধু, ফুলরাণী, ফুলমালিকা, ফুলবন, ফুলকাঁদে, ফুলরেণু, ফুলহার। প্রভৃতি প্রায় ৫৫টি। আমি পুষ্প আর কুসুম বাদই দিলাম। এর পর যদি বলি, রূপ আর মাধুর্য সৃষ্টির দিকে তাঁর বিশেষ টান ছিল, তা হলে কি ভুল বলা হবে?

মন নিয়ে কথা হচ্ছিল। এই পঞ্জির মধ্যে 'মন' শব্দটি আছে ৯৯ বার, 'মনে' ৩১৫ বার, 'মনের' ৫৮ বার। সব মিলিয়ে ৪৭২ মন! আমার ধারণা ছিল কবি অন্ধকারের চেয়ে আলোকে বেশি পছন্দ করেন। কার্যত দেখছি তা ঠিক নয়। 'আলো' আর 'আলোক' যেখানে ১১১, সেখানে 'অন্ধকার' আর 'আঁধার— উভয়ে মিলে ২৩৫, ডবলেরও বেশি। 'কাছে' শব্দ 'দূরে' শব্দের তিনগুণ। রবীন্দ্রনাথ কাজের চেয়ে ছুটি চাইতেন বেশি বলে জনশ্রুতি। কিন্তু 'কাজ' আছে ৪৯ বার, 'ছুটি' মাত্র ১৩। এই ক'টি গ্রন্থে কবি দুই বানানে 'ভালোবাসা' ব্যবহার করেছেন ৭৪ বার, 'ভালোবাসি' ৩০ বার। ভাত মাত্র একবার। "চোখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।" মাছও একবার—"জেলে ধরিতেছে মাছ গিরিমধ্যপথে"—দুটিই সোনার তরীতে। মশা, মাছি, পতঙ্গ প্রভৃতি নিত্য পরিচিত শব্দ নেন নি, তেমনি 'মায়াবী'ও নেই। 'মায়া' আছে।

ওই বয়সে কবি 'না, নহে, নাই' জাতীয় নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করছেন 'আছে' শব্দের প্রায় চারগুণ। ১৫০৯ আর ৩৬১। সে কি যৌবনকালের অস্থিরতার জন্যে? তাই 'হায়' আছে ১১৭ বার? 'ভয়/ভয়ে' ৯৭ বার। 'প্রেম' ৭৯। 'বাথা' ৪৪। 'বেদনা' ২৩। এক একটি শব্দ একাধিক অর্থ-বহন করছে। তাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'ফিরে', 'বুঝি', 'ভুলে', 'নে', দুই বানানে 'কী/কি'। বনফুল কাব্যের পর থেকে 'কী', 'কি' এর থেকে ভিন্ন তাৎপর্যে প্রযুক্ত হচ্ছে।

Yeats এর কাব্যে দেখি নানা নামের পাখির দিকে তাঁর ঝোঁক। নানা নামের পশুর দিকেও। প্রিয় প্রাণীগুলি হলো ঘোড়া, হরিণ আর কুকুর। পেঁচা আর মৌমাছি। OLD শব্দটি ৫৭৫ বার। Man ৭৯৬। Love ৩৫৩, hate ২১। 'Come' বলছেন 'go' এর দ্বিগুণ। sad, sweet, peace প্রিয় শব্দ, happy, bitter, war ততো নয়। life আর death সমান সমান। শরীর আর প্রত্যঙ্গের উল্লেখে তিনি সরব। তবে body শব্দটি ১০৪ বার, যখন বহুবচনে eyes ২৪৪ বার, একবচনে ৮৬=৩৩০। Hair ১৩৮। lips ৮৮, আর breast মাত্র ৭৬। এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো আলোচ্য রবীন্দ্র কাব্যে 'অধর' আছে ২৬ বার, 'স্তন' মাত্র ৪ বার।

আমার নিজের সংগ্রহেও কিছু রসদ আছে। জীবনানন্দের রূপসী বাংলা। তার প্রধান অংশের ৬১ টি কবিতা তিনি লিখে গেছেন ধূসর পাণ্ডুলিপি পর্বে। একেবারে অন্য ধাঁচে। এবং সেগুলি প্রকাশ করেন নি। কবিতাগুলি খুটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এর পেছনে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল। এশিরিয়া, বেবিলন, পিরামিড, নীলনদ অধ্যুষিত বিস্তৃত পৃথিবীর স্তাবর বাতাবরণ থেকে তফাতে গিয়ে ব্রাত্য বাংলা ভূমিকে আনা। প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ ভাবুকের মতো না, সুলিপির সাহায্যে। তিনি বাংলার দরিদ্র সমাজের নিজস্ব সম্পদ যা, তাদের নাম তালিকা সংগ্রহ করলেন। তারপর বাংলার ইতিহাস-পুরাণ বলতে যা কিছু আছে—মঙ্গলকাব্য, সেন বংশের রাজত্ব, কতিপয় বীর ও কবি, আনলেন। যোগ করলেন পাঁচালির নয়, আর একটু দীর্ঘ পয়ারের ছন্দ—বাইশ মাত্রায় একটানা। তাতে দিলেন এ-কারান্ত মনকে মনের সুর। হারানো দিনের জন্য বিলাপ। আর, এক ঝাপসা স্বপ্ন— দৃশ্যময় সেই সোনার বাংলায় দুর্ভিক্ষ

নেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নেই। প্রাচীন এশিরিয়ার ধুলো আর বেবিলনের ছাইয়ের ওপর ভিজে গন্ধ নিয়ে জেগে থাকা মধ্যযুগের এই বাংলা। কয়েকটি নামাবলির উদাহরণ দিই—

গাছগাছালি : ফণী মনসা। মাদার। কাঁঠাল। জাম। বট। কলমিদাম। ডুমুর। কামরাঙা। সুপুরি। টেঁকিশাক। আতাবন। থোড়। হেলেঞ্চা। নাটাফল।

ফল-ফুল-পাখি প্রাণী : ভাঁটফুল। দ্রোণফুল। গুবরে পোকা। হইরাঙা হাঁস। কাঁচপোকা। শ্যামাপোকা। সরপুঁটি। তালশাঁস। ফলসা। বউ কথা কও। ঝিঁঝিপোকা। ধবল বক।

লোকায়ত পুরাণ-নাম : ঘুঙুর। মধুকর ডিঙা। গাঙুড়ের জল। সীতারাম-রাজারাম। বেহুলা। অমরা। রায়রায়ান। অন্নদামঙ্গল। সনকা। দেউল। গাজন। সাপমাসি।

আমার অভিমত, প্রাকৃত শব্দের ধ্বনি ব্যঞ্জনায় আচ্ছন্ন রূপসী বাংলা এক কৃত্রিম কাব্য। নদীর ঘরে ফেরার মতো অবান্তরও। এর গুঞ্জন আছে। এই অভিমত যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তা হলেও রূপসী বাংলা কাব্য তার গুরুত্ব হারায় না। বরং একথা প্রমাণিত হয় যে, সুসজ্জিত প্রধানত সুধ্বনিত শব্দমালা দিয়ে আবেদনময় কবিতা রচনা করা যায়। শব্দ উপযুক্ত উপস্থাপনে, কবিতার প্রাণ। কবিতা অনেকটাই নির্মান।

আসলে, Concordance একটা data bank । এর ওপর গবেষণা শুরু হবে। ভাষাতাত্ত্বিকরা করবেন। তারা তো জানেন যে, আধুনিক বাংলা কবিতায় তথাকথিত অকাব্যিক পদ ও শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক এসেছে রবীন্দ্রনাথের পরে। Concordance তৈরি করলে দেখা যাবে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যে যে ধাতব ব্যঞ্জনা আমরা পাই, নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, ব্যস্ততা, অবক্ষয় বোঝাতে তা অত্যন্ত কার্যকর। কবিতায় ধারালো বাঙ্গ এনেছে বিচিত্র সব বিশেষণের প্রয়োগ। যেমন, বিকৃত মস্তিষ্ক চাঁদ বা গলিত নখ পৃথিবী। হিংসুক হাওয়া বা অবৈতনিক প্রণয়। আশাবাদ প্রচারে সুকান্ত দুই বিপরীত বক্তব্যের মাঝখানে ভুরি ভুরি অব্যয়—তাই, তবু, যদিও, যত, কিন্তু, আর—ব্যবহার করে সফল হয়েছেন। সুতরাং শব্দনির্বাচনের দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতাকে বিচার করলে কাজটা একেবারে ভস্মে ঘি ঢালা হবে না। শিল্পকলার রহস্য আবরণ ঘুচবে কিছুটা। □

চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে
অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরীর নিবন্ধ 'পাঠনির্ণয়'।
প্রেসিডেন্সি কলেজে উনিশ বছর অধ্যাপনার পর
শ্রী চৌধুরী এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক।

সৌন্দর্যের আলোকে কবিতা ও বিজ্ঞান

আনন্দ ঘোষ হাজরা

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্

অথবা নাসদীয় সূক্তের শ্লোকটি অথবা আজকের কবির উচ্চারণ 'বস্তুর মধ্যেই কোনো বস্তুমূল নেই'—যে কোনো ধরনের উচ্চারণ, যে কোনো কালের উচ্চারণের উৎস, বিস্ময়জাত সৌন্দর্যবোধ। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তও কবিতা, হোলুবের কবিতাও কবিতা। কিন্তু ভয়, বিস্ময়, করুণা, আনন্দ ইত্যাদি বোধ ও অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় একটা সামগ্রিক সৌন্দর্যবোধ, যা কবিতার জনয়িত্রী। হ্যাঁ, ভয়ের মধ্যে থেকেও সৌন্দর্যবোধ জন্ম নিতে পারে। গুহাবাসী মানুষ দাবদাহ দেখে, লাভার উদগীরণ দেখে, অশনিসম্পাত দেখে কি ভীত হয়নি এবং মুগ্ধও হয়নি? মৃত্যুকে সামনে দেখেও মানুষ মুগ্ধ হতে পারে বিস্ময়বিহ্বল হতে পারে, সৌন্দর্যপ্লুত হতে পারে। ঘন ঘন ঝন ঝন বজ্রর নিপাত/চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট/তঁহি অতি দুরতর বাদল দোল/বারি কি বারই নীল নিচোল। রাধিকা অবশ্যই শঙ্কিত ছিলেন, আতঙ্কিতও ছিলেন বলতে পারা যায়; তবু কোন সুন্দরের সন্ধানে তাঁর যাত্রা? আর আমরাও লাইন দুটি প'ড়ে ব'লে উঠি 'সুন্দর'। মা নিষাদ — উচ্চারণের পরও নিষাদ শরক্ষেপ করেছিল অবশ্যই; মুনির নিষেধাজ্ঞা শুনতে তার ভরী বয়ে গেছে, কিন্তু করুণ মৃত্যু দৃশ্যের সম্ভাবনাসূত্রের শ্লোকটিকেও আমরা সুন্দর বলতে বাধ্য হই। কাব্য প্রেরণার এই উৎস সম্বন্ধে আলোচনা অনেক হয়েছে এবং এতদূর মেনে নিতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু কেপলার যখন বলেন, 'অঙ্ক সুন্দরেরই আর্কেটাইপ' তখন আমাদের ললাট কিছুটা কুঞ্চিত হয়ে পড়ে অথবা ফেইনম্যান যখন সামুদ্রিক উচ্ছ্বাস দর্শন করেও মনে রাখতে পারেন সমস্ত সমুদ্রটাই অণু পরমাণুর সমাহার এবং মনে রেখেও সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে কবিতা লিখে ফেলেন তখনও আমাদের মনে হতে পারে এ কবিতাও কি সত্যিই কবিতা, সৌন্দর্য বোধসঞ্জাত? নাকি বিজ্ঞানভাবনাকে, জ্ঞানকে কবিতার ওপর আরোপিত করে দেওয়া হচ্ছে মাত্র? আমরা কি শেকস্‌পিয়ারের মতো মন্তব্য ক'রে বসবো—'Oh, this learning, what a thing it is!' অথবা ব্যাপারটা এভাবে বলা যায় যে বিজ্ঞানীদের সৌন্দর্যবোধ বা বিস্ময়বোধ, যদি থাকে, তা কি সাহিত্যিক, শিল্পী বা কবিদের সৌন্দর্যবোধের বা বিস্ময়বোধের সহধর্মী? বিজ্ঞানীদের বিস্ময়বোধ তো থাকতে হবেই। মানুষের যে আদি উচ্চারণে বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে তা মিথভিত্তিক, তার যে আদি সৌন্দর্যবোধ তা মিথের আবরণে আবৃত। প্রথমবিজ্ঞান এই মিথের আবরণকে ভেঙে ফেলে, মিথের ভিত্তিকে সরিয়ে দিয়ে সত্যকে জানতে চাইলো। বিস্ময় ও সৌন্দর্যবোধই মানুষকে সাহায্য করলো এ কাজ করতে, বস্তুকে, ঘটনাকে আরো কাছ থেকে বিশ্লেষণ করে জানতে চাইলো সত্য কি, দেশ কালের ব্যাপারটাই বা কি? এও আমাদের ভুললে চলবে না যে বিজ্ঞানীরা জগৎ জীবনকে যে নিয়মের মধ্যে ফেলে দেখতে শুরু করলেন সেই প্রথম নিয়মটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়ম। আমি কেপলারের গ্রহের গতি সম্পর্কিত নিয়মের কথা বলতে চাইছি, যা বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহের অনেক ধৈর্যশীল অধ্যবসায়ী পর্যবেক্ষণের ফল। কেপলারের এই নিয়মগুলি থেকেই ক্রমশ জন্ম নিল নিউটনের বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব যা প্রায় তিনশ বছর ধরে আমাদের বিজ্ঞান ভাবনার ওপর আধিপত্য করে আসছিল কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান তত্ত্ব হিসাবে। এভাবেই দ্বিতীয় বিজ্ঞানেরও জন্ম হলো দেখা যাচ্ছে তাহলে। কোনো প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে নয়, কোনো দৈনন্দিন দরকারের বশীভূত হয়ে নয়, নিতান্ত অপ্রয়োজনে, এবং সেজন্যই আগ্রহ ও বিস্ময় থেকেই কবিতার উচ্চারণের মতো জন্ম নিলো

বিজ্ঞানের তত্ত্বাবলি। ধরা যাক কোনো একজন বিজ্ঞানী কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করে পর্যবেক্ষণ করছেন, পরীক্ষা চালাচ্ছেন, অনুপুঙ্খ দেখছেন, নিয়মাবলীর মধ্যে ফেলছেন, সাধারণ জগৎ-জীবনের ধারার মধ্যে সেই নিয়মাবলীকে খাপ খাওয়াচ্ছেন বা আবিষ্কারটিকে সেই নিয়মাবলীর সাধারণ প্যাটার্নের মধ্যে আকার দেবার চেষ্টা করছেন। তখন পুরো ব্যাপারটা প্রয়োজনীয়তার মধ্যে আসে না বরং খানিকটা আব্‌স্ট্রাক্ট হয়ে যায়। সাধারণ প্যাটার্ন, আকার ইত্যাদি শব্দগুলিই তো বিমূর্ত। সাধারণ প্যাটার্ন বলতে কি বুঝি? আকার বলতেই বা কি বুঝি যতক্ষণ কিছু না নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হচ্ছে? কাজেই সবচেয়ে ভালো বোধ হয় এই বলা যে বিজ্ঞানীর কাজের নিয়ামক হচ্ছে বিস্ময়, আগ্রহ, সৌন্দর্যবোধ। আবিষ্কৃত ঘটনা, নিয়মটি প্রমাণিত হলে, সাধারণ প্যাটার্নের সঙ্গে আবিষ্কারটি খাপ খেলে, বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমরাও বলে উঠবো 'সুন্দর,' যেমন বলে উঠেছিলাম কবিতা শুনে। কথা হচ্ছে, তাহলে কবিতা ও বিজ্ঞান দুই মেরুতে অবস্থান করে বলে মনে হয় কেন? কেনই বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো কবি বলবেন—

A fingering slave
one that would peep and botanize
upon his mother's grave?

A reasoning self-sufficing thing
An intellectual All-in-all!

Sweet is the lore which nature brings;
our meddling intellect
Misshapes the beauteous forms of things,
we murder to dissect,

অথবা কেনই বা কিট্‌সের মতো কবিও বলে উঠবেন—

Do not all charms fly
At the mere touch of cold philosophy?
There was an awful rainbow once in heaven
We know her woof, her texture, she is given
in the dull catalogue of common things.
Philosophy will clip an angel's wings

কিট্‌সের কবিতায় এখানে ফিলজফি এবং বিজ্ঞান সমার্থক। বিজ্ঞানীদের সৌন্দর্যবোধ ও কবিদের সৌন্দর্যবোধের ধর্ম যদি একই হয় তাহলে মহৎ কবিরা এরকম বলছেন কেন? পিটার মেডাওয়ার নামক একজন সমালোচকের ইংরেজি উক্তির বাংলা অনুবাদ মোটামুটি এই রকম: 'এমন ভান করার কোনো প্রয়োজন নেই যে বিজ্ঞান ও সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক এবং পরস্পরনির্ভর প্রচেষ্টার দ্বারা একটা সাধারণ উদ্দেশ্যের দিকে যাচ্ছে; বরং যেখানেই তাদের সহযোগিতার প্রয়োজন সেখানেই তারা প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে।' কেন এমন কথা বলছেন সমালোচক? অবশ্য সেকালেও আমাদের মনে রাখতে হবে শেলির কথা। মনে রাখতে হবে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকই শেলির কাব্যসমালোচনা করেছিলেন। বৈজ্ঞানিকের নাম ডেসমন্ড কিং হেলি। তিনি বলছেন, 'বিজ্ঞানের প্রতি শেলির দৃষ্টিভঙ্গি আশ্চর্যজনকভাবে বিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাধারাকে কাব্যে গ্রহণীয় করে তোলে এবং তিনি প্রকৃতির যান্ত্রিকতাকে (mechanism) এমন নিখুঁতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আত্মস্থ করেছেন যে তা ইংরেজি কাব্যধারায় অতুলনীয়।' এ.এন.হোয়াইটহেডও বলছেন যে বিজ্ঞানের প্রতি শেলির দৃষ্টিভঙ্গি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। কবিতাতে বিজ্ঞানের প্রতিফলনে তিনি কখনও ক্লান্ত নন। বিজ্ঞান তাঁর কাছে আনন্দ, শান্তি এবং উদ্ভাসন। শেলির ক্লাউড কবিতাটি উপরোক্ত মন্তব্যগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করবে, কিংবা Prometheus unbound-এর নিম্নোক্ত লাইনগুলি—

The lightning is his slave; heaven's utmost deep
Gives up her stars, and like a flock of sheep
They pass before his eyes, are numbered and roll
on!
The tempest is his steed, he strides the air;
And the abyss shouts from her depth laid bare
Heavean, hast thou secrets? Man unveils me,
I have none.

'এই তো তোমার আলোক ধেনু/সূর্য তারা দলে দলে/কোথা হতে বাজাও বেণু/চরাও মহাগগনতলে'। কোথা হতে যে চরানো হয়, তা মানুষই আবিষ্কার করবে। যাঁরা করবেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক। আর যাঁরা সেই আবিষ্কারের কথা লিখবেন বা অন্যভাবে বলা যায় উপরের লাইনগুলি লিখে আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা দেবেন তাঁরাই কবি। তাহলে উভয়ের সৌন্দর্যবোধ ও বিস্ময়বোধ কি একই প্রকারের অথবা পরস্পরের পরিপূরক? তাহলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা কিট্‌স্ (বা কখনও শেক্‌স্‌পিয়ার একটু অন্যভাবে) বিজ্ঞানবিরোধী কথা বলেন কেন, এবং তাও এমন নির্মমভাবে?

এর দুটো উত্তর হতে পারে। সৌন্দর্যানুভূতির ক্ষেত্রে নিউটনিয় দ্বিতীয় বিজ্ঞানের যান্ত্রিক পথ পরিক্রমা, বিশ্লেষণ করতে করতে এগিয়ে যাওয়া সত্যের দিকে—এইভাবে পথ চলা—হয়তো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো কবিরা পছন্দ করতেন না। হয়তো মনে করতেন প্রকৃতিকে এভাবে বিশ্লেষণ করলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকদের পথচলার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য তাঁদের আবেগমথিত কবিসত্তাকে আঘাত করতো। আবার বৈজ্ঞানিকরা

হয়তো ভাবতেন আমাদের এই পথ চলাতেই আনন্দ। সৌন্দর্যবোধ পরের কথা। এই পথ পরিক্রমার পর—তা যতই অপছন্দের হোক না কেন—অনাবিল সৌন্দর্যের অবস্থানভূমি। শেলির হয়তো আবার পছন্দই ছিল; তিনি সম্ভবত বৈজ্ঞানিকদের বৌদ্ধিক পথচলাকে বুদ্ধি দিয়েই বুঝতেন এবং এইভাবেই যে বৈজ্ঞানিকরা ক্রমশ সমগ্রতায় পৌঁছতে চাচ্ছেন সেটা বুঝতেন।

আর একটা উত্তর হচ্ছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখ কবিরা হয়তো এমনও মনে করতে পারেন যে এরকম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে, (পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়) সামগ্রিকতায় পৌঁছনো যায় না, গেলেও সে সামগ্রিকতা সত্য নয়; সুতরাং উপলব্ধির জগতে সৌন্দর্যবোধের হানি ঘটে। এ প্রসঙ্গে কিং হেলির সমালোচনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আরেকবার আকর্ষণ করছি। শেলির কবিতায় উপরোক্ত আলোচনার শব্দবন্ধটি লক্ষ্য করা যাক 'তিনি প্রকৃতির যান্ত্রিকতাকে এমন নিখুঁতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আত্মস্থ করেছেন যে.....' ইত্যাদি। অর্থাৎ নিউটনিয় দ্বিতীয় বিজ্ঞানে প্রকৃতির যান্ত্রিক বিশ্লেষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ চুলচেরা বিশ্লেষণই আসলকথা। সত্তাহীন জড়প্রকৃতির কল্পনা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আবেগে আঘাত করতে বাধ্য।

আবার বৈজ্ঞানিকদের দিক থেকে বিচার করলে উল্টোদিকটাও প্রণিধানযোগ্য। কোনো সত্যের অকস্মাৎ উদ্ভাসন এবং তজ্জনিত বিস্ময় ও সৌন্দর্যবোধ বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিপন্থী ছিল। কোনোরকম কার্যকারণ তত্ত্বেই এর ব্যাখ্যা মিলত না। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড বলছেন: 'কোনো ব্যক্তির পক্ষেই অকস্মাৎ ভীষণ একটা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়; বিজ্ঞান পা ফেলে ফেলে অগ্রসর হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর পূর্বসূরীর কাজের ওপর নির্ভরশীল। যখন কোনো একটা আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শোনা যায়—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত—তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে (দিনের পর দিন) এক জন থেকে আরেকজনের চেষ্টায় জমানো ফসলের প্রভাবে এই অসম্ভব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সম্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা কোনো ব্যক্তি বিশেষের ধারণার ওপর নির্ভরশীল নন, বহুব্যক্তির সম্মিলিত জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল। একই সমস্যার (নিরসনের) জন্য সকলেই ভাবেন এবং জ্ঞানের যে বৃহত্তম পরিকাঠামোটি তৈরি হলো, তাতে এঁদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অবদান আছে।'

কবিতার ক্ষেত্রে কি আমরা এরকম কথা বলতে পারবো? বলা তো হয় ব্যক্তিগত ভাবনার উদ্ভাসই কবিতার জন্ম দেয়। আমার এ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। পরে সে কথায় আসছি। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে আরো কথা বলেন। ম্যাক্স্ ব্রড, চেক লেখক। ফ্রানজ্ কাফকার মৃত্যুর পর তাঁর লেখা প্রকাশের জন্য তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসটির নাম "The Redemption of Tycho Brahe."। এতে তিনি কেপলারের যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন তা ইংরেজিতেই উদ্ধার করা যেতে পারে—"Kepler now inspired him(Tycho) with a feeling of awe. The tranquility with which he applied himself to his labours and entirely ignored the warblings of flatterers was to Tycho almost superhuman. There was something incomprehensible in its absence of emotion like a breath from a distant region of ice." উপন্যাসকারকে চরিত্রাঙ্কনে কিছুটা ছাড়পত্র দিলেও ঐতিহাসিক চরিত্রের রূপায়ণের সময় খুব বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করাবেন ব'লে মনে হয় না। কেপলারের ক্ষেত্রে যে প্রশান্তি ও আবেগহীন মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি, তা কি কবিদের পক্ষে আদৌ কাম্য? প্রশান্তি তো থাকতেই পারে, কিন্তু আবেগহীনতা যা নাকি আবার দূরবর্তি হিম নিঃশ্বাসের মত? এরকম আবেগহীন শৈত্যের মধ্যে আর যাই হোক কবিতা লেখা যায় না। পরবর্তীকালে যে আনন্দ কেপলার পাবেন, যে সৌন্দর্যের অনুভূতি সঞ্চারিত হবে তাঁর মনে, তাহলে, তা কি ক'রে কবির আনন্দ কবির সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে?

তাহলে শেলি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও বৈজ্ঞানিকদের দিক থেকে বিচার করলে দুটো সমস্যা পাওয়া গেল, যাতে আমাদের মনে হতে পারে কবি ও বৈজ্ঞানিকদের সৌন্দর্যবোধ একরকমের হতে পারে না, কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ব্যক্তিগত উদ্ভাসন নয়, অনেকের মিলিত প্রচেষ্টার ফসল, আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক মনে হলেও; কিন্তু কবিতা ব্যক্তিগত মনন সঞ্জাত উদ্ভাস। আরেকটি হলো, প্রশান্তির গভীরতা উভয়ক্ষেত্রে থাকলেও বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চরম আবেগহীনতা কবিদের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অবশ্যই থাকবে না; থাকলে কবিতা হয়ে উঠবেনা।

সমস্যা দুটিকে বিচার করা যেতে পারে এবার। প্রথমটির ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে কবিতায় আপাতদৃষ্টিতে যাকে ব্যক্তিগত উদ্ভাসন মনে হচ্ছে, তা নাও হতে পারে। কোনো বিরল মহৎ কাব্য প্রতিভার জন্ম হঠাৎ হয় না। ভূমি প্রস্তুত থাকতে হয়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যে পরিমণ্ডলে সেই পরিমণ্ডল ও পরিবেশ তৈরি না হলে, রবীন্দ্রপ্রতিভা কি সম্যক বিকশিত হতে পারত? শেক্‌স্‌পিয়রের যুগে, শেক্‌স্‌পিয়র যখন লনডনে পৌঁছলেন ১৫৮৭ সালে, ২৩ বছর বয়সে, তখন তাঁর লনডনের সাহিত্যজগতের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার পটভূমি ছিলো না বটে; কিন্তু কোন লনডনে তিনি এলেন? তখন সেখানে লজ, কিড, গ্রিন, মারলো, নাসে ইত্যাদি উজ্জ্বল

তারকামণ্ডলী বিরাজ করছেন। অনুসন্ধিৎসা, আকাঙ্খা, প্রবণতা ও সাহিত্যবোধ থাকলে ঐ পরিমণ্ডল কি শেক্‌স্‌পিয়রকে শেক্‌স্‌পিয়র হয়ে ওঠার জন্য সাহায্য করে নি? আর্ল অব সাউদাম্‌প্টনের সাহায্যের কথা ছেড়েই দিলাম। তাঁর সনেটের 'ডার্ক লেডি' কে ছিলেন আমি জানিনা, কিন্তু তিনিও বিদ্বদজনমণ্ডলীর একজন ছিলেন ব'লে যদি অনুমান করি তাহলে কি খুব ভুল হবে? এই উজ্জ্বল তারকা মণ্ডলীর কিরণ যদি শেক্‌স্‌পিয়রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাহলে তা কি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্ভাস সম্পূর্ণতই? এভাবেই গণ্য হবে? রবীন্দ্রানাথের ক্ষেত্রেও শুধু পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের কথা বলেছি। কিন্তু বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের মণিময় ভাণ্ডার কি রবীন্দ্র-উদ্ভাসনে সাহায্য করেনি? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, ঈশ্বরগুপ্ত শুধু নয় বা যদি বলি একেবারেই নয়, তাহলেও থাকেন মাইকেল, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বৈষ্ণব পদাবলীর মন্দাকিনী, বেদ-উপনিষদের প্রবাহ ইত্যাদি ইত্যাদি। শেক্‌স্‌পিয়রের ক্ষেত্রেই হোক বা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই হোক তাঁদের সময়ে বাতাসে ভাসমান কয়েকটি চিন্তাধারার দু-একটিও যদি কবিদের রচনায় অপূর্ব সৌন্দর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তাহলে তা কি ব্যক্তিগত উদ্ভাসনের পর্যায়েই ভাবতে হবে? হ্যাঁ, কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষার সীমাবদ্ধতা ছাড়াও, আঞ্চলিক সামাজিক নানারকম সীমাবদ্ধতা কাজ করতে পারে। বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে তা হয়তো নয়। তাঁদের অঙ্কের ভাষা সমীকরণের ভাষা বিশ্বজনীন; সার্বজনীন না হলেও। তাঁদের বেলায় এভাবে একটা বিশ্ববোধ, সমবেত চিন্তায় বিশ্ববোধ তৈরি হওয়া এবং সেই বোধটি সম্পর্কে সমবেত চিন্তা ও প্রচেষ্টার সুযোগটা বেশি। হয়তো রাদারফোর্ড এধরনের কথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে ঘাম ঝরানো সমবেত প্রয়াস থাকবে না, কেবল ধ্যানের মাধ্যমেই উপলব্ধিজনিত উচ্চারণ হবে এটা বোধ হয় সম্পূর্ণত মানা যায় না। তবু, এ ধরনের উচ্চারণের কথাও বিজ্ঞানীরা বলেছেন। আবেগ ব্যতিরেকে এ রকম উচ্চারণের কথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভাবা যায় না। বিনা মেঘে বারিপাতের মতোই অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটে যায়। হাইসেনবার্গ বর্ণনা দিচ্ছেন কীভাবে কোয়ান্টাম মেকানিকের কিছু তত্ত্ব তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। একদিন সন্ধ্যায় হাইসেনবার্গ রিসার্চের এমন একটা পর্যায়ে, এনার্জি ম্যাট্রিক্সের হিসাবের এমন জায়গায় এসে পৌঁছলেন যে সব কিছুই গোলমাল হয়ে যেতে থাকলো। অঙ্ক বা হিসাব কিছুই আর মেলে না। তিনি ক্রমশ উত্তেজিত হতে থাকলেন এবং আরো বেশি ভুল করতে থাকলেন। প্রায় রাত তিনটের সময় হঠাৎ সব অংক মিলে গেল সন্দেহাতীতভাবে। এনার্জি প্রিনসিপ্যালের কিছু তত্ত্ব এভাবে দৈবাৎ আবিষ্কৃত হলো। এবার তাঁর মনোভাব তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক, অবশ্য বঙ্গানুবাদে। "প্রথমে আমি ভীষণ ভীত হয়ে পড়লাম। আমার মনে হলো পারমাণবিক ঘটনার উপরিতল ভেদ ক'রে আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি একটা অদ্ভুত সুন্দর অভ্যন্তরকে দেখতে পাচ্ছি। অঙ্কের গঠনের যে ঐশ্বর্য, প্রকৃতি সদয় হয়ে আমার চোখের সামনে মেলে ধরেছেন, এর আরো অনুসন্ধান করতে হবে, এই চিন্তায় আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। আমি এত উত্তেজনা বোধ করতে শুরু করলাম যে আর ঘুমোতেই পারলাম না। ...." হাইসেনবার্গের এই মনোভাব কি প্রমাণ করে না যে হিমশীতল আবেগহীনতাই যে থাকতে হবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেছনে এর কোনো মানে নেই। বরং হাইসেনবার্গের এই মনোভাব আবেগ, উত্তেজনাকেই সমর্থন করে। আরো তিরিশ বছর পর হাইসেনবার্গ পারটিক্‌ল্ থিয়োরি আরো সম্প্রসারণের পর যে মনোভূমিতে অবস্থান করছিলেন তার চমৎকার বর্ণনা দিচ্ছেন তাঁর স্ত্রী—

"One moonlit night we walked all over the Hainsberg mountain and he was completely enthralled by the vision he had, trying to explain his nearest discorvery to me. He talked about the miracle of symetry as the original archetype of creation, about harmony, about beauty and simplicity and its innertruth."

এই সময় হাইসেনবার্গ তাঁর বোনের কাছে যে চিঠি লিখছেন তারও অংশ বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন:

"And now with the peak directly ahead of me, the whole terrain of interrelationships in atomic theory is suddenly and clearly spread out before my eyes. That these interrelationships display in all their mathematical abstractions an incredible degree of simplicity is a gift we can accept humbly." এখানেও তো আমরা সৌন্দর্যবোধের সম্মুখে নতজানু আবেগমথিত এক বৈজ্ঞানিকের ছবি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে কি আমরা শেষ পর্যন্ত এই বলতে পারছি যে বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যবোধ ও কবির সৌন্দর্যবোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে একইরকম প্রায়, সমধর্মী? যদি একথাটা বলতে পারি, তাহলে এখন পারছি, এতদিন যথার্থভাবে বলতে পারছিলাম না। নিউটনিয় যান্ত্রিক বিজ্ঞানের যুগ পর্যন্ত বলা সম্ভব ছিল না। কোয়ান্টাম দর্শনের তৃতীয় বিজ্ঞান তাহলে আমাদের ধারণা পাল্টে দিল, অথবা, নতুন ধারণার সৃষ্টি করলো? লক্ষ্য করার বিষয় উদ্ধৃতিগুলিতে এমন কতকগুলি শব্দ পাচ্ছি যেগুলি আগে বিজ্ঞানজগতে এমন অবাধ প্রবেশাধিকার পায়

নি। শব্দগুলি হলো, 'সম্পর্ক' বা পরস্পরের সঙ্গে 'সংযোগসূত্র', 'সামঞ্জস্য', 'সারল্য' ইত্যাদি। এবং 'সৌন্দর্য' শব্দটিতো আছেই। নিউটনিয় -যান্ত্রিক বিজ্ঞান যেহেতু বিশ্লেষণের জগৎ সংশ্লেষের নয়, সংযোগের নয়, সেহেতু তৎকালীন বিজ্ঞানীদের সৌন্দর্যবোধের মধ্যে হিমশীতল মনোভাব থাকতে পারে, উচ্ছ্বাস বা আবেগ নাও থাকতে পারে। কবিরা কাজে কাজেই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতে পারেন। কবিদের পথচলা হৃদয়কে নাড়া দিয়ে, আবেগকে প্রকাশ করতে করতে। দ্বিতীয় বিজ্ঞানের পথচলার মধ্যে অন্য ধরনের আনন্দ ছিলো, — বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের আনন্দ। তাঁরা সমগ্রের সন্ধানেই ছুটছিলেন অবশ্য কিন্তু সন্ধান পাচ্ছিলেন না। কাজেই কবিদের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তাঁদের সৌন্দর্যবোধের পার্থক্য থাকতেই পারে; যদিও শেলির মতো কবি এটাও বুঝেছিলেন যে বিজ্ঞানের সন্ধান সমগ্রতারই সন্ধান। কাজেই এই সমগ্রতাবোধ যখনই তিনি বিন্দুমাত্রও পেয়েছিলেন cloud কবিতা) তখনই তিনি বিজ্ঞানকে আলিঙ্গন করতে ভোলেন নি। কিন্তু আজ কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের দর্শন আমাদের সমগ্রতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমরা বুঝতে পারছি পারস্পরিক সম্পর্ক বা সংযোগসূত্রটুকু। জড় ও জীবনে প্রভেদ আজ ঘুচে যাচ্ছে। বিশাল মহাবিশ্বের জটিলতার দর্শনে আসছে সারল্য। সুতরাং কাব্যিক সৌন্দর্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্যবোধের মধ্যে মেরু ব্যবধান আর নেই। অবশ্য এখনও এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন যিনি আবিষ্কারের মুহূর্তটি পর্যন্ত বর্ণনা করতে পারেন, তারপর অনুভূতির জগৎটির আর বর্ণনা দিতে চান না। তার মানে এই নয় যে তাঁর আবেগ হিমশীতল। বরং বলা যেতে পারে, সেই অনুভূতির আবেগকে ভাষা দেবার সামর্থ্য তাঁর নেই বলেই মনে করেন। ১৯৩৪ সালে তাঁর কোনো এক আবিষ্কারের প্রসঙ্গে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হিদেকি ইয়ুকাওয়া বলছেন, "আমি এই পর্যন্ত এসে আর কোনো কথা বলতে চাইনা, কারণ আমার সেই পরিশ্রমের দিনগুলি সম্পর্কে এক ধরনের নস্টালজিয়া আছে এবং আমি দঃখিত যে আমি অন্য কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছি।" সেই পরিশ্রমের দিনগুলি বলতে তিনি সৌন্দর্যানুভবের দিনগুলির কথা বলতে চেয়েছেন বোধ হয়।

আমরা ফিরে আসতে পারি এবার ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের সেই শ্লোকটিতে, যে শ্লোকটি দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু করেছিলাম। পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র বা যোগসূত্র থেকে যে সমগ্রতায় কোয়ান্টাম দর্শন আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সে সমগ্রতা মহাবিশ্বের বিশালতা। এই বিশালতা একটা ভয়াবহ অকল্পনীয় অথচ সহজসরল বিশালতার প্যাটার্ন। যার আদি নেই, অন্ত নেই, মূল নেই। পুরুষসূক্তের শ্লোকটিতে সেই বিশালতার কথা, ঐ বিরাট সৌন্দর্যের অনুভব। "পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত ক'রে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন।" এই যে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করা এটাই কোয়ান্টাম দর্শনের ভাষায় interrelationship। এর থেকেই জন্ম নেয় সমগ্রতাবোধ। তখন বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায় না আর কিছুই। সমগ্র মহাবিশ্ব একটা অতিকায় প্যাটার্নমাত্র, যার মূল নেই। পারটিক্‌ল্ ফিজিক্সের পরীক্ষায় বাব্‌ল্ চেম্বারে বিভাজিত পরমাণু থেকে জাত অস্থির পারটিকেলের যে চকিত রূপরেখা ক্ষণে দেখা যায় বলে বোধ হয় আবার ক্ষণেই মিলিয়ে যায়, তা যেন এই বিশাল প্যাটার্নের, অজানা প্যাটার্নের, আভাস মাত্র। আধুনিক কবি বলে ওঠেন "বস্তুর মধ্যেই কোনো বস্তুমূল নেই।" অথচ এই সংযোগ! প্যাটার্নজাত, সংযোগসূত্র বিধৃত এই সমগ্রতাই সৌন্দর্যবোধের মূলতত্ত্ব। এই সৌন্দর্যকে ধরতে পারাই সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য। এই ভাবনা থেকেই ইলিয়ট শেক্‌স্‌পিয়রের নাটক সম্বন্ধে বলছেন: "We may say confidently that the full meaning of any one of his plays is not in itself alone, but in that play in the order in which it was written, in its relation to Shakespeare's all other plays, earlier or later, we must know all of Shakespeare's plays to know any of it. No other dramatist approaches anywhere near to his perfection of pattern ..."। এই সমগ্রতার উপলব্ধিতে, এই সৌন্দর্যের অনুভূতিতে যে মানসিক স্থৈর্য্য ও প্রশান্তির মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী উভয়েই পৌঁছান, তার নামই কি ধ্যানমগ্নতা? নিউটন সম্বন্ধে একজন আলোচক বলছেন, "I believe that Newton could hold a problem in his mind for hours and days and weeks until it surrendered to him the secret."এই গোপনীয়তার কাছে পৌঁছানোই প্রকৃত সৌন্দর্যানুভূতি। এখানে পৌঁছানো মানেই সৌন্দর্যের চূড়ায় পৌঁছানো। সেখানে কেউ স্তব্ধ হয়ে যেতে পারেন আবার হাইসেনবার্গের মতো বিস্ময়ে ও পুলকে উদ্বেলিত হতে পারেন। এই বিমূর্ত সৌন্দর্যবোধকে ব্যাখ্যা করা যায় নানা ভাবে অথবা হয়তো ঠিক ব্যাখ্যা করা যায়না। হয়তো হাইসেনবার্গই এর প্রকৃত স্বরূপ বলতে পারেন তাঁর ভাষায়—"Beauty is the proper conformity of the parts to one another and to the whole."।এই যে সমগ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যময় সম্পর্ক, পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগসূত্র— যখন কোনো সৃষ্টি এই সম্পর্কে, এই সংযোগে, পৌঁছে যায় তখনই তা সুন্দর। সৃষ্টি কর্তার সেই সময়কার মানসিক অবস্থা, তিনি কবিই হন

বা বিজ্ঞানীই হন, চমৎকার ধরা পড়েছে হাইসেনবার্গ ও আইনস্টাইনের কথোপকথনে। হাইসেনবার্গ বলছেন: 'আপনিও নিশ্চয়ই এটা অনুভব করেছেন — সেই প্রায় ভীতিপ্রদ সারল্য এবং সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কসূত্র যা-প্রকৃতি অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে মেলে ধরে এবং যার জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত থাকি না।'

আমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে গাছের, ধূলিকণার, বাতাসের, জলের, নদীর, শূন্যতার, চন্দ্র, সূর্য গ্রহবৃন্দের, অন্য প্রাণীর, অন্য জীবজগতের, ধূমকেতুর, গ্যালাক্সির, অন্যান্য গ্যালাক্সির — মহাবিশ্বের সব কিছুরই। আমরা সবাই সব কিছুর সঙ্গে সহজ সংযোগসূত্রে গ্রথিত — এক ভীতিপ্রদ ভয়াবহ বিশালতায়। শুধু তাই নয় এই সব কিছুই গ্রথিত সময়ের সঙ্গে দেশকালের সঙ্গে। এ একটা উদ্দেশ্যহীন গতিময় ভয়ানক বিশাল প্যাটার্ন। জড়ে জীবনে সময় কালে একাকার হয়ে যাওয়া কবিতা, আজকাল লেখা হচ্ছে অনেক। যেমন মেক্সিকোর কবি জোস এমিলিও প্যাচেকোর দুটি কবিতার অনুবাদ:

(১)

"সমুদ্রের শব্দ উঠছে। ঊষার পুরোনো প্রদীপ অন্ধকার দ্বীপের বুকে আলো জ্বালাচ্ছে। বিশাল জাহাজটা ধাক্কা খেতে খেতে নির্জনতায় ডুবে যাচ্ছে। সামুদ্রিক দেওয়ালে, জল এসে যেখানে ধাক্কা খাচ্ছে, সেখানে, সময়ের ধাক্কায় আহত হয়ে উন্মুক্ত মুহূর্তের মতো দাঁড়িয়ে রাত্রি একটু সময় নিচ্ছে।

তীরদেশের জীবকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের বাক্তির চোখের সামনে গোলকধাঁধা রচনা করছে। কখনও সে সময়ের কাছে বশম্বদ তরঙ্গের মতো ফুলে উঠছে, কখনও অলজি, কখনও সবুজ সমুদ্রবেলা কখনও নৃত্যরতা নষ্ট মেয়ে, যার উপর সূর্যের দৃষ্টি পড়লেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।"

দ্বিতীয় কবিতাটিতেও সময়বোধ 'বিগ্ ক্রান্‌চে'র ভাবনায় ভাবিত। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, তৃতীয় বিজ্ঞান এই রকম 'বিগ্ ক্রান্‌চ্' বা বিশাল বিলোপের কথা চিন্তা করছে, শুধু পৃথিবীর নয়, মহাবিশ্বেরও।

(২)

"মহাবিশ্বের শেষ দিনে— যখন আর কোনো নরক থাকবেনা, থাকবেনা সময় বা আগামীকাল, তখন তুমি তার নাম উচ্চারণ করবে। এই উচ্চারণে ক্ষমা, ভয় বা দূষিত পদার্থের সংক্রমণ থাকবেনা। শুধু তার পবিত্র নাম উচ্চারিত হবে—খণ্ড মুহূর্তের জন্য — সেই খণ্ড মুহূর্তটির মতো যখন সে তোমার কাছে ছিল।"

সৌন্দর্যবোধ থেকে জন্ম নেয় অদ্ভুত ও আশ্চর্য। অথবা আশ্চর্যই জন্ম দেয় সৌন্দর্যবোধের। বিশেষ করে তৃতীয় বিজ্ঞানের সময় কার্যকরণ যখন বিপর্যস্ত অথবা কার্যকারণ সম্পর্ক যখন খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা ঠিক সুররিয়ালিজম নয়। গ্রীস দেশের কবি স্টাটিশ্ হাভিয়ারাসের একটি কবিতার অনুবাদ। অবশ্য কবিতাটিতে রয়েছে পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন।

গাছ

"আমি চেয়ারটাকে সরিয়ে নিয়ে যাবো এবং একটা গাছ নির্মাণ করবো। তাতে ঝুলিয়ে দেবো নতুন পাতা, নতুন পাখিদের জন্য নতুন বাসা, ছেড়ে দেবো নতুন পোকামাকড়। সূর্য তার চমৎকার অঙ্গগুলি ব্রাশ করে দেবে। তার সামর্থ্য পরীক্ষা করার জন্য বাতাস বাইবে। বিস্মিত বৃষ্টিধারা তার প্রশংসা করতে করতে এসে নামবে—কখন এটা হলো—গতবার আমি—আশ্চর্য!

এটা আমার কোনো স্বপ্ন নয়, চেয়ারের। আমি বিশ্রাম নেবার জন্য চেয়ারটিতে বসেছিলাম এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু গাছটির সব কিছুই মনে আছে এখনো। এবং এবার আমি জেগে উঠতে চাই... দ্বিতীয়বার কাঠুরে আসার আগেই।"

যে সৌন্দর্যবোধের কথা বলা হচ্ছে তা যে সব সময় মহাজাগতিক সমগ্রতার সৌন্দর্যবোধ হতেই হবে তা নয়। তাহলে তো আর অন্য কিছু নিয়ে কবিতা লেখা যায় না। দৈনন্দিন জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও চমৎকার কবিতা হবে, যদি তা সামগ্রিক সৌন্দর্যের প্যাটার্নের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যদিও পঁয়েকেয়ারে (Poincare) মনে করেন এরকম প্রয়োজনীয়তার কথা বিজ্ঞানীরা ভাবেন না। এ রকম প্রয়োজনীয়তা, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি করে নেয়। পঁয়েকেয়ারে কেবল নান্দনিক মূল্যের উপরই জোর দেন। তবু হয়তো এখানটাতেই কবিদের সৌন্দর্যানুভূতিতে ও বৈজ্ঞানিকদের সৌন্দর্যানুভূতিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয়তা থেকে জাত সৌন্দর্য, আধুনিকালের। বরং বলা যায় একেবারে আধুনিককালের কবিদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এবং কে না জানে আজকের জীবন যাত্রার সঙ্গে বিজ্ঞানের কি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক! যেমন টম এনড্রুজের কবিতা। টম এনড্রুজ আমেরিকার কবি। ১৯৬১তে জন্ম। দুটি কবিতার অনুবাদ দেওয়া হলো —

(১)

"সিনেমা দৃশ্য: জ্যাক ডেরিডা এবং ঈশ্বরের সিমসুম্ গভীর তাৎপর্যময় মাৎসুপিসুর মস্তাজ, আগ্নেয়গিরির

বিস্ফোরণ, উত্তরমেরুর হিমবাহ, কোষের গঠন-সংযোজন এবং নানা ভাবে বেড়ে ওঠা, ব্রাজিলের রেন ফরেস্ট, $E=Mc^2$, 200 এম ই ভি, সমুদ্রের নীচের দৃশ্যাবলি, ছায়াপথ ইত্যাদি দেখতে দেখতে জানতে জানতে আমাদের দৃষ্টি পৌঁছে গেল এভারেস্টের চূড়ায় যেখানে ঈশ্বর এবং ডেরিডা লোফালুফি খেলছেন ক্যামকর্ডার নিয়ে।

ঈশ্বর: আমি ক্রমশ নিজের ভেতরেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পৌঁছে গেলাম সেই বিন্দুতে যেখান থেকে নতুন ক'রে সৃষ্টি হবে দেশ কাল আর সময়ের বহমানতা।

ডেরিডা: (হতচকিত। ক্যামকর্ডারটা কেঁপে উঠলো।)— দাঁড়ান দাঁড়ান, এক মিনিট সবুর করুন। কোন বোতামটা টিপবো বলুন তো?

ক্যামকর্ডার থেকে ভিডিও টেপ এবং দৃশ্যাবলি নির্গত হতে থাকল অবিরল।"

কবিতাটিতে কি বিজ্ঞানকে ব্যঙ্গ করা হল, না কি ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে, নাকি ডেরিডার থিয়োরিকে? সে যাই হোক, কবিতাটিতে আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তির মিশ্রণ লক্ষণীয়। কবিদের সৌন্দর্যবোধে অতএব আজকাল বুদ্ধিবৃত্তিরও প্রকাশ দেখা যাচ্ছে ভালোরকম। কাজেই দুজনের ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যবোধ কি সমধর্মী হয়ে উঠল এখন?

টম এনড্রুজের দ্বিতীয় কবিতা

(২)

"সিনেমা দৃশ্য: আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের মৃত্যু

ক্যামেরা ঘুরছে ধীরে ধীরে, একটা তুষারাচ্ছাদিত জাঁকজমকময় পটভূমির ওপর দিয়ে: গড়ানো, ঢেউ খেলানো পাহাড়, বড় বড় কালো কালো বৃক্ষরাজি, একটা তুষারাবদ্ধ জমাট নদী। বরফ, গুঁড়ো গুঁড়ো ঝরে পড়ছে, পড়ছে...। ক্যামেরা থামলো। দেখা গেল একটা তুষারাচ্ছন্ন মাঠে আরাম কেদারায় টেনিসন শুয়ে আছেন।

টেনিসন: বরফ পড়ছে। বরফ হচ্ছে ঠিক কিসের মতো যেন... যেন এসপিরিনের গুঁড়ো... যেন টুকরো টুকরো কাগজ... না, না, গজ-ব্যান্ডেজের মতো যেন... শাদা দন্তচূর্ণের মতো কি? জুতোর ফিতে... হেডলাইট... না... না...

খুব বুড়ো হয়ে গেছি এসব কাজের জন্য। ...একটা বিশাল টি-শার্ট কুকুরে চিবিয়ে খেয়েছে যেন...

বীর্যপাতের মতো... উৎসবের রঙিন কাগজের মতো... চকখড়ি, সামুদ্রিক খোলা... অরণ্যের ধোঁয়া... ছাই... সাবান... ছাই... সাবান... নির্জনতা...

—দূর ছাই। তোমরা তো নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ। ফিল্ম্ সম্বন্ধে এটাই আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি।

তিনি মারা গেলেন।"

—'কবির সৌন্দর্যবোধ ও বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যবোধ' বিষয়টি এমনই বিমূর্ত যে এতক্ষণ নানা উদাহরণ উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনার শেষ পর্যায়েও কোনো সিদ্ধান্তে আসা গেল না বোধ হয়। সম্ভবও নয় হয়তো। তবে তৃতীয় বিজ্ঞানের বর্তমান ভাবনা আর কবিদের ভাবনা যে অনেক কাছাকাছি এসে গেছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বরং তৃতীয় বিজ্ঞান অনেক নতুন নতুন বিস্ময়ের দরোজা আমাদের চোখের সামনে খুলে দিচ্ছে। হয়তো নতুন ধরনের কবিতা লেখা হবে এখন। তবু মূল প্রশ্নটি বোঝা না গেলেও, অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে, যদি দুটি কবিতার অনুবাদ পাশাপাশি রাখা যায়। একটি কবিতার কথা প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করেছি। সমুদ্র বিষয়ক কবিতা। রচয়িতা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফেইন ম্যান। অন্যটি আমাদের রবীন্দ্রনাথের। শেষ সপ্তকের 'সতেরো' নম্বর কবিতার অংশ বিশেষ। প্রথমে ফেইনম্যানের কবিতার অনুবাদ—

সমুদ্র

উদ্বেল তরঙ্গমালা
অণুর পাহাড়
প্রত্যেকে যোজন যোজন দূর থেকে
নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছে
নির্বোধের মতো
অথচ কী করে যে সৃষ্ট হচ্ছে শাদা ফেনার উচ্ছ্বাস!

স্মরণাতীতকাল থেকে
দৃষ্টির অতীত কাল থেকে
তীরের ওপর গর্জন করে আছড়ে পড়ছে
এখনও—
কার জন্য? কিসের জন্য?
তখন গ্রহ ছিল মৃত
জীবনের কোনো আহ্বান ছিল না।
সমূহ রৌদ্রকিরণদগ্ধ তরঙ্গমালা
শক্তি তাড়িত—
দেশকালের সীমানায় আছড়ে পড়ছে
বিরামবিহীন।

মাইলের পর মাইল গর্জন করছে সমুদ্র
আর গভীর অতল জুড়ে
একের পর এক অণুগুলি
তৈরি ক'রে যাচ্ছে নকশার পর নকশা
যতক্ষণ পর্যন্ত না জটিল হয়ে যাচ্ছে
প্যাটার্নগুলি।

নিজেদের মতই সৃষ্টি করছে অণু, আরো অণু
এবং শুরু হচ্ছে নূতন নূতন নাচ।

জটিলতায় এবং আকারে জায়মান
জীবন্ত বস্তু, পরমাণুর ভর
ডি.এন.এ. প্রোটিন
নানা নৃত্যের মুদ্রা সৃষ্টি করছে
জটিল.....আরো জটিল.....

আর শিশুর দোলনা থেকে নেমে
কঠিন ভূমির উপর দাঁড়িয়ে
এই যে চেতনাঋদ্ধ পরমাণুর দল
এই যে আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের স্তূপ
সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে
বিস্ময় দেখে বিস্মিত
আমি—
পরমাণুর এক মহাবিশ্ব
মহাবিশ্বের মধ্যে এক পরমাণু!

এবার রবীন্দ্রনাথ—

....

বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গি, আছে ছন্দ
আছে নৃত্য আকাশে আকাশে।
অণু পরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র
নাচছে সেই সীমায় সীমায়;
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।
তার অন্তরে আছে বহ্নি তেজের দুর্দমবোধ
সেই বোধ খুঁজছে আপন বাঞ্জনা
ঘাসের ফুল থেকে শুরু করে
আকাশের তারা পর্যন্ত।

মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না
বাহন করতে চায় কথাকে
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ঈশারা
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে
নিয়মকে দেয় বাঁকা করে।
মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী।

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুৎচঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই
সুরসংঘকে বাঁধে সীমায়,
ভঙ্গি দেয় তাকে
নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে।

....

একটি কবিতা বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের। একটি কবিতা বিশ্ববিশ্রুত কবির। একজনের বিষয় সমুদ্র। একজনের বিষয় গান। আমি এতক্ষণ ধ'রে প্রমাণ করার চেষ্টা করে আসছি কবির সৌন্দর্যবোধ ও বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যবোধ কোয়ান্টাম দর্শনের যুগে প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। দুই মেরুতে অবস্থান করে না আর। কবিতা দুটি উদাহরণ হিসাবে এইজন্যই আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি কি ফেইনম্যানের লেখা কবিতাটি, রবীন্দ্রনাথের ব'লে চালাতে পারবো বা রবীন্দ্রনাথের লেখাটি, ফেইনম্যানের? বোধ হয় না। কোথাও যেন অনুভূতির সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। দুটি কবিতাতেই সমৃদ্ধ আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তি দুইই আছে। কিন্তু ফেইনম্যানের কবিতায় কি বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য কিঞ্চিৎ বেশি নয়? তা ছাড়া তো রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রশ্ন তুললেন তাঁর কবিতায়। গায়কের সৌন্দর্যবোধের কথা। বাঁধন হারা সৌন্দর্যবোধের বেগ, সুরমূর্চ্ছনাতেও প্রকাশিত হয়।

একই তত্ত্বের আর একটি দিকের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত রবীন্দ্রনাথের। এতদূর আলোচনার শেষে তাহলে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না মনে হচ্ছে, বিমূর্ত এই বিষয়টির আলোচনায়। তবু, গায়কদের কথা বাদ দিলেও, হয়তো আমরা বলতে পারি কবির সৌন্দর্যবোধ আর বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যবোধ, যার জনয়িত্রী বিস্ময় এখন আর দুই মেরুতে অবস্থা করেনা সম্ভবত।

উল্লেখপঞ্জি

১। Truth and Beauty by S. Chandra Sekhar।
২। রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয়খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৩। ঋগ্বেদ, হরফপ্রকাশনী ২য় খণ্ড
৪। A field guide to contemporary Poetry and Poetics by Stuart Friebert and David Young.
৫। Models of the universe (An authology of prosepoems) by Stuart Friebert and David Young.
৬। What do you care What Other people think by Richard Feynman. □

বো ধি লা ভ

সোহারাব হোসেন

কিছু কিছু দিন আলেয়া পেয়ে বসে জীবন আলিকে। ভরা পোষ-মাসের কনকনে বাতাসের দাঁত তখন যেন কেটে কেটে বসে জীবন আলির মাংসহীন পেশীতে। যদিও সেই পেশীপুঞ্জ বয়সের ও আলস্যের ভারে ছাড়া ছাড়া এখন। যেদিন আলস্য এসে বাসা বাঁধে তার দেহে সেদিন শীতটাও থাকে বেশি। সেদিন সাইকেলটাকে দেখলেই মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায় জীবন আলির। প্যাডেলে পা দিয়ে সুখ পাওয়া যায় না সেদিন। তাই ভক্লে কমাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গামছাহাটের মোড়ে আসতে না আসতেই যেন তন্দ্রা আসে চোখে। ঘুম পায়। অথচ ঘুমালে তো চলবে না তার। যতই আলস্য আসুক এই মাঘ-রাত্রির বুক চিরে তাকে পৌঁছাতে হবে ইটিভার ঘাট পেরিয়ে বর্ডারের সীমায়। তন্দ্রাটাকে তাড়ানো চাই এখন— মনের মধ্যে এই ভাবনা আসা মাত্রই জীবন আলি সাইকেলের ব্রেক চেপে ধরে ঘ্যাচ করে। নামে। চারপাশে তাকায়। নৈঃশব্দ। কেউ কোথাও নেই। সাইকেলটাকে মোড়ের অশ্বত্থগাছের গায়ে রাখে সে। একটা বিড়ি ধরায়। তারপর ফুকফুক করে পরপর কয়েকটা টান লাগায় তাতে। শীতটা যেন কেটে যায়। ঘুমটাও সরে যাচ্ছে চোখ থেকে।

বিড়ি টানতে টানতেই অতি পরিচিত জায়গাটাকে জীবন কিছুটা সময় ধরে দেখে। দেখতে দেখতেই বোধে আনে আজ সবকিছুই যেন অপরিচিত ঠেকছে। রাত্রির আঁধারে তা'লে কি সমস্ত কিছুই নতুন রূপ পায়? তাই-ই তো! নইলে মানিকের ওই ছাল-চটা-ওঠা চা-দোকানটাকে অমন মোহময় দেখাচ্ছে কেন? আধুর পানওয়ালার শূন্য পড়ে থাকা চৌকিটাকেই বা অমন অন্যরকম মনে হবে কেন? তাহলে কি তার এই হত-কুচ্ছিত দেহটার ভিতরেও অমন ভিন্ন রঙ আছে নাকি? হয়তো আছে। খানিকটা আনমনা হয়ে পড়ে জীবন আলি। নিজের মধ্যে বোধ হয় ডুবে যায়। তখনই শোনে ছাবেরালির ডাক: 'কি হোলো জীবন ভাই দেঁড়িগে রয়োছো কানো? চলো?' চমক ভেঙে জীবন আলি দেখে তার পাশ কাটিয়ে টাকী রোড ধরে সাঁই সাঁই করে চলে যাচ্ছে কালো ছিবড়ে মডেল-মার্কা চেহারার যুবক ছাবেরালি। অসম্ভব দ্রুত সাইকেল চালিয়ে নিয়তই জীবন আলিকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় ছেলেটি। মনে মনে বেশ হিংসাও যে হয় না তা নয়। মাঘ চল্লিশে এসে জীবনের পরাণ বাচ্চাটার অত দম নেই। দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া সহযাত্রীর দিকে তাকিয়ে জীবন আলি নিজের হেরে যাওয়ার কথা ভাবে। ভাবে ছোটবেলাকার স্কুল মাঠের দৌড় প্রতিযোগিতার কথা। পাশাপাশি ট্রাক ধরে ছুটছে আর সকলের সঙ্গে জীবন আলি। সবাই হুস্‌হুস্ করে তাকে পিছনে ফেলে চলে যেত প্রতিবারই। হিংসা তার মনে তখনও রক্তাক্ত ছাপ ফেলত। সবাইকে লুকিয়ে সেই রক্ত-ক্ষরণের জ্বালা ভুলতে পুর করে কাঁদত সে। এখন জীবনের এই অনন্ত ট্রাকে সবাইয়ের পিছনে পড়তে পড়তে আজও সমানে রক্তাক্ত হয় জীবন আলি। সেই রক্তময় হৃদয়ে সার বেঁধে উঠে আসে হিলে পড়া তার সংসার, বিবাহযোগ্যা দুই মেয়ে, অনেক দেরিতে পাওয়া শিশু রুমু ছেলে। টাকী রোডের অনন্ত ট্রাকের পাথর-বুকে তারা সবাই যেন পিস্টে যায়। এ-সমস্ত দৃশ্যরা মুহূর্তেই জীবন আলির মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটতে শুরু করে। সেই হাতুড়ির আঘাতে তার মাথার করোটি ফেটে বিবর্ণ ঘিলুরা তার কপাল বেয়ে, ঠোঁট বেয়ে, পিঠ বেয়ে নামতে শুরু করে। জ্বালা ধরে সারা দেহে। জীবন আলি অবশ হয়। আবার মুহূর্তেই সেই অবশ মাথা চম্‌কিয়ে ওঠে। সে দেখে গোঙ্গার বেগে যেতে যেতে দূরে বিলীয়মান ছাবেরালির গাড়িটা টাল খেয়ে পড়ে যায়। মৃদু শব্দও যেন আসে আর্তনাদের।

মুহূর্তেই মাথার মধ্যেকার অবশ ঘিলুরা তাদের নিম্নমুখী গতির অবস্থান পাল্টে পুনরায় জীবন আলির মাথার মধ্যে ঢোকে। বোধ ফিরে আসে তার। চিন্তাতে আনে অসহায় ছাবেরালির কথা। কেউ নেই। কোন প্রাণী নেই এখন। শুধু জীবন আলিদের মতো রাত্রিচর ড্রাইভাররা এখন থেকে একে অপরের বন্ধু-সমবাথী। অতএব চালাও গাড়ি জোরে জোরে।

অতি দ্রুতই অকুস্থলে পৌঁছে যায় জীবন। সত্যিই ছাবেরালির গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আড়ংধারা রোডের স্টপেজ পেরিয়ে গলতলা-ব্রিজের সামনা-সামনি রাস্তাতে বেশ কিছু গাড্ডা রয়েছে বড় বড়। অসাবধানে গাড়ি চালালেই বিপদ। অন্তত একমন মাংসবাহী সাইকেলটা টাল খেয়ে উল্টে পড়বেই পড়বে। ছাবেরালির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জীবন দেখল সাইকেলটা তখন মাঝ রাস্তাতে পড়ে আছে উল্টে। দুদিকের দুই প্যাকেট থেকে যে সব কাঁচা মাংসের টুকরো ছড়িয়ে পড়েছিল রাস্তায়, তা অতি দ্রুততায় প্যাকেটে ভরে নিচ্ছে ছাবের। জীবন তার কাছে আসা মাত্রই সে বলে: 'এট্টু হাত লাগাও জীবন ভাই। শালা আজগে বেরাম তাড়াতাড়ি রয়েছে সেইরাম ব্যাগড়াও পড়লে দ্যাকো।'

জীবন ব্রেক চেপে নামে সাইকেল থেকে। গাড়িটাকে দাঁড় করাতে করাতে বলে:

—তোর লাগিনি তোরে ছাবের?

—লেগেছে এট্টু। শালার হেঁটোর চামড়া খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে।

রাত্রির অন্ধকার গহ্বরের মধ্য থেকে দ্রুত মাংস-টুকরো গুলোকে সংগ্রহ করতে করতে কথা বলে যায় ছাবেরালি। জীবন ক্ষণিক নীরব থেকে ছাবেরের কণ্ঠস্বরের কোন কষ্ট আছে কিনা তা পরখ করে। তারপর সমস্ত অবস্থাটা একটু ভালো করে বুঝে নেবার জন্য ফস্ করে দেশলাই জ্বালায়। কেটে যায় অন্ধকার। সেই স্বল্প আলোতে জীবন দেখতে পায় ছাবেরালির মুখের কেউটে বিরক্তি। সে হিস্ হিস্ করে বলে: 'কাঠি ধরালে ক্যানো? লেভাও লেভাও।'

তবুও কাঠিটাকে প্রজ্জ্বলমান রাখে জীবন। নজর করে দেখে পরিবেশটা। ছড়ানো মাংস টুকরো, ওল্টানো সাইকেল, উল্টোমুখো পড়ে থাকা একপাটি চপ্পল—তার ঘিলুর মধ্যে ঢুকতে থাকে। এবং অবাক হয়ে দেখে জীবন খসি-ক্ষিপ্রতায় ছাবেরালি এসে তার হাতে প্রচন্ড জোরে একটি আঘাত হেনে জ্বলন্ত কাঠিটাকে মাটিতে ফেলে দেয়। পাথরের রাস্তার বুকে সেটা তবুও জ্বলতে থাকে। জীবন আলিকে হত-বিহ্বল করে দিয়ে ছাবেরালি, তার যে পায়ে জুতো ছিল সেটা দিয়ে পিস্টে মেরে দেয় আলোটাকে। এবং আলোটা নেভার আগেই জীবন আলি ছোট্ট প্যাকেটটাকে দেখতে পায়। সাদা পলিথিনের প্যাকেটে খড়-কুটোর মতো কি রয়েছে যেন। এবং দৃশ্যমাত্র তার মাথা প্রশ্ন ছাড়ে ছাবেরালিকে:

—কি ওডা? ওডা কিরে ছাবের?

—কোনটা?

—ঐ কাঠ-কুঠোর মতোন? জরির মধ্যে রয়েছ?

জীবনের কথা শেষ হবার আগে ছোঁ মেরে অভ্রান্ত নিশানায় প্যাকেটটাকে তুলে নেয় ছাবেরালি। পরনের লুঙ্গি উঁচু করে আন্ডারওয়ারের লুকানো পকেটে সেটা ঢোকায়। তৃতীয় প্রহরের রাতে অন্ধকার থাকলেও অজস্র তারা-রশ্মির আবছা আলোতে ছাবেরালির মুখে এবার প্রশান্তির প্রলেপ যেন দেখতে পায় জীবন আলি। দেখে একটুখানি আগে ছড়িয়ে থাকা মাংস জড়ো করার যে ব্যস্ততা ছিল তার, তা এখন নেই। সে তার সাইকেলটাকে এবার তুলতে ব্যস্ত হয়। সেই সুযোগে বলে জীবন:

—কি করবি ওই কাঠের গুড়ো দে?

—তোমার পিঠির ছাল ছেড়গে তাতি আগুন দোবো!

—তামাশা করিস ক্যানো? বল না ওডা কি?

—তাতি তোমার কাজ কি? রাতচরা ড্রাইভারের তো অতশত খোঁজ রাখতি নিকো জীবন ভাই! এ লাইনে তো তোমারগা পাছা ধরে আমরা এইছি। তোমারগা কাছতে তো শিখিছি: চালাও গাড়ি ইটিভেপার। মন রাখো সোজা, চোখ রাখো বোঁজা। তালি?

ছাবেরালির কথায় খানিকটা বেকুব বনে যায় জীবন। ঠিকই তো, গহীন রাতে কি কি করে তার খোঁজ তো মাংস পাচার করা ড্রাইভারের রাখতে নেই। তাই কিছুটা কৈফিয়তের সুরে সে বলে:

—না, এমনিই জিগেস করতিলুম। না'লি অত খোঁজ কিসির?

—তালি চলো ভাই। তোলো গাড়ি। ঝাড়ো মনের ধুলো। নাইলি বঁধু ঝলবে না ঝলবে নাগো তোমার হাড়ির চুলো।'

কথা গুলোকে পাঁচালী গানের সুরে আওড়ায় ছাবেরালি। তার মুখে সামান্য হাসির ঝিলিক খেলে যায়। ধন্ধে পড়ে যায় জীবন আলি। তার মাঝ-চল্লিশের মাথার বোধেরা সমস্ত কিছুকে ধরতে পারে না। সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে যুবক ছাবেরালিকে দেখে।

ততক্ষণে ছাবেরালি সাইকেলের দু-হ্যান্ডেলে ভর রেখে প্যাডেলে চাপ দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। জীবন আলিকে তখনো নীরবে বোধশূন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়া লাগায়:

—চলো জীবন ভাই! দেড়গে থেকলে ক্যানো?

ছাবেরালির আহ্বানে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সাড়া দেয় জীবন। সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিয়ে ডিড়িং করে সিটে চেপে বসে।

চলতে থাকে দুটো গাড়ি। ক্রম আরোহী গতিতে। টাকী রোড ধরে সোজা পুবমুখো। আকাশে তখন তাদের মাথার উপর সমান্তরালে সৃষ্টি হয়েছে ছায়াপথ। সেদিকে তাকায় জীবন। বলে :

খোদার কি মহিমে! দেকিছিস আমারসা পথ চেনানের জনি তারাদে পথ তোয়ের করে দেছে!

ছাবেরালি এখন অনেক হাল্কা মেজাজে। সে বলে :

—কিসির পথ বলোদিনি ওডা?

—কিসির আবার? খোদার কুদরতের।

—নাহ্। ওডা শালা চোরা চালানের।

—ধুস্ শুয়োর।

—তা তুমি যতই বলো, ও পথ মাংস চালানের, চরস পাচারের—হেরোইন পাচারের। সোনার বিস্কুট পাচারের। গাঁজার প্যাকেট পাচারের।

—কি বললি?

জীবন আলির দমকমারা প্রশ্নের আর উত্তর দেয় না ছাবেরালি। সাইকেলের গতি হঠাৎ অনেকগানি বাড়িয়ে দিয়ে বলে : 'চললুম, তোমার সুস্কি মিন মিন করে গেলি. আমার চলবে না।' সাঁই সাঁই করে চলে গেল ছাবেরালি। জীবনের ট্রাকে তখন শুধু বিস্ময় ও শ্রান্তি। একা অনেকটা পথ তাকে যেতে হবে।

দুই

রাত্রি চতুর্থ প্রহরে পড়ার আগেই জীবন আলিকে পৌঁছাতে হয় ইটিতাঘাটের ইছামতি পেরিয়ে বর্ডারে। পৌঁছাতেই হয় রাত্রি ফর্সা হবার আগে। নইলে দুশ্চিন্তা। মাল পারাপারে হাজার ঝামেলা। 'পার্টি'র হাতে মাংসের প্যাকেটগুলো যদি তিমির অন্ধকারের মধ্যেই না তুলে দেওয়া যায় তবে চুক্তির টাকা মেলে না সেদিন। ব্যাপারী প্যাকেট হাতে নিতে নিতে অনায়াসেই বলে যাবে: বড্ড দেরি কল্লো জীবনবাই। হুই দ্যাকো সুযি পুবির আকাশ রাঙা কইরছে। এহন দাঁড়াই কেমনে? পাওনা-গোন্ডা কালকে লিবা।'

কথাগুলো জীবনের কানে যতটা না ঢোকে তার বেশি মস্তিষ্কে আঘাত হানে। ঘিলুরা তার অবশ হয়। সেখানে নোনা স্বাদ ঘামের মিহিন প্রস্রবন। জীবন আলির দেহে ঝিম ধরে। সাইকেলের রডে হেলান দিয়ে ব্যাপারীকে বোঝাতে চেষ্টা করে পথে আজ কেমন ভোগান্তি লাগিয়েছে বসিরহাট থানার পেট্রল পুলিশ। কিন্তু কথা শুরু করে সামনে দেখে শূন্যতার গহ্বর। ব্যাপারী নুরহোসেন তার চোখের সামনে থেকে উধাও। ত্বরিত চোখের দৃষ্টিকে সামনে প্রবাহিত করে দেয় জীবন। দেখে সোবেহছাদেকের আবছা আলোর মধ্যে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে যাচ্ছে ব্যাপারী। দু-হাতে ঝুলছে ভারি দুখানা মাংসের প্যাকেট। নুর হোসেনের চলে যাওয়াকে কিছুটা সময় ধরে প্রত্যক্ষ করে জীবন আলি। তারপর একসময় ব্যাপারী ভোরের চোরা বাঁকে মিলিয়ে গেলে নিজের দিকে তাকাতে চায় সে। তাকায়। সেখানে ফুটে ওঠে টাকী রোডের হেলে সাপের মতো গতি। তার উপর রাত্রি তৃতীয় প্রহরের বিপন্ন কালো অন্ধকার। তার মধ্যে সাইকেলের জীবন-অঘেষী দুটো চাকা। ঘূর্ণমান গতিবান জীবন আলির সরীসৃপ মন তারও মধ্যে। বড় অসহায়। বড় অসহায় সে অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্বের সমস্ত ফেক্রফল জুড়ে দাপাদাপি করে তার অতীত ঐতিহ্য। ভেঙে পড়া ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া তার সংসার। আর টাকী রাস্তার পাথর-ওঠা অস্বস্তি। পেট্রল পুলিশের জোরালো সার্চ লাইটের আলোর জালপাতা ফাঁস। সব কিছুকে সরীসৃপের গতি নিয়ে কাটিয়ে উঠতে হয় তাকে।

এমন পরিস্থিতিতে জীবন আলির অস্তিত্ব বড়ই শূন্য শূন্য হয়ে পড়ে। মাথার উপর ছায়াপথ খোঁজে জীবন। পায় না। বিনিময়ে পায় এক আকাশ রাঙানো পটভূমি। ভোর বেলাকার আজানের ধ্বনি।

কানে আজানের ঘুমভাঙা সুর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মোহ, ক্লান্তি ও ঘোর ভেঙে যায় জীবনের। রাতচরা লুকানো পরাজয়, ছাবেরালির অনন্ত গতি, ব্যাপারীর সুযোগ সন্ধানী হিসাব—সমস্ত কিছুই সাইক্লোনের দাপটের মতো ভেঙে পড়ে। ঘিলুর মধ্যে যে মোটা আচ্ছাদন ছিল তা যেন কেটে গেল। গত দশ বছর কোনো ওয়াক্ত নামাজ কাজা নেই তার। সাইকেলের মায়াবী চাকা গড়াতে শুরু করে মসজিদের দিকে। ঠিক যেন রাতচরা ড্রাইভারের অনন্ত ট্রাকে প্রতিযোগিতায় নামা। জীবন আলি স্পষ্ট দেখতে পায় এই প্রতিযোগিতায় ছাবেরালিরা তার ধারে কাছে কোথাও নেই।

ফজরের নামাজ কবুল করে মনে খানিকটা স্বস্তি পায় জীবন। কাল রাতে ছাবেরালির সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে বড় বিক্ষিপ্ত হয়েছিল মনটা। তার রেশ ছিল সারারাত্রি ধরে। প্যাডেলে পা যেন আর শক্তি জোগাতে পারছিল না। সেই অসহায় শক্তিহীন ব্যুহের মধ্যে থেকেই সে বুঝে নিতে পেরেছিল মাত্র বছর খানেক মাংস বওয়ার কাজে নামতে না নামতেই কেমন করে ছাবেরালি ভিটেতে ইট গাড়তে পেরেছে। কাল সারারাত ধরে জীবন খালি এক নম্বর ও দু-নম্বরে বিভক্ত হয়ে সমস্ত কিছুকে বুঝে নিয়েছে। প্রশ্ন করেছে এক নম্বর জীবন আলি :

—তালি গোস্ত পাচার শুধু শুধু লেবাজ হবে?

উত্তর করেছে দু-নম্বর জীবন আলি :

—তা না তো কি? গোস্ত বয়ে তো শুধু পাছার পরনী জোটে। ইট জোটে না। সিমেন্ট জোটে না।

—তালি মদ-গাঁজার আমল করতি হবে মোছলমানের ছেলে হয়ে?

—তুমি শালার এট্টা বোকা-হাঁদা। মদ-গাঁজা তো পুরকেলে কারবার। এখন চরস্, কোকেন, হেরোইনের যুগ।

—তালি ইমান-আমানের কি হবে?

—ইমান-আমানে ভাত দেয় না জীবন। ইট দেয় না—সিমেন্ট দেয় না।

—তালি নামাজ-রোযা-আমল-কামাল সব ফাঁকা?

—ফাঁকা ফাঁকা।

—তালি কি করতি বলো আমারে?

—চালাও গাড়ি ইটিভেপার। এক মন গোস্তো পার করো। কিলো প্রতি এক টাকা। ওতে মাগির পাছার কাপড় হয় না। গোস্তোর মধ্যি চরস্ ভরো, কোকেন পোরো। হেরোইন পার কর। গাঁজার চাষ করো। প্যাকেটে ভরে চালান কর ওপারে।

—সেডা চাইনে জেবন। খোদা নারাজ হবে, খোদার নবী নারাজ হবে। চালাও গাড়ি ইটিত্তে পার—গোস্তো চালাও একমন। কিলো প্রতি একটাকা বওয়ানি। তাই অনেক। সুখে থাকব। ভালো থাকব।

মসজিদের বারান্দায় বসে তারপরই জীবন দরুদ পড়তে শুরু করে : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।' মুখের উপর তার নেমে আসে যেন আকাশের ছায়াপথ। ছায়াপথের নরম শান্তি। এক নূরের জ্যোতি। সে-জ্যোতিতে দু'নম্বর জীবন আলি এক নম্বরের মধ্যে শ্রান্তি লাভ করে। তখন এক নম্বরের চেতনা লুপ্ত হতে থাকে। খোদার ঘরের নিশ্চিন্তি আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে জীবন। গাঁজা-চরসের রাজত্ব থেকে শত যোজন দূরে যেতে যেতে।

তিন

সেদিন ভর দুপুরে অকস্মাৎ বৃদ্ধদের হয়েই যেন বাড়ি ফেরে জীবন আলি। পানিতরের মসজিদে যখন তার ঘুম ভেঙেছিল তখনই নিজেকে পাঠশালায় পড়া বৃদ্ধদের মনে হয়েছিল। হ্যাঁ, মুদ্রিত চক্ষু, বোধিবৃক্ষের তলায় সিদ্ধি পাওয়া বুদ্ধই মনে হয়েছিল নিজেকে। জীবন-চলার বোধিলাভ তার ঘটে গিয়েছিল তখন। সে আবিষ্কার করেছিল নিজেকে প্রচণ্ড রকমের ভারহীন স্বচ্ছন্দ অবস্থার মধ্যে। তারও বাড়ি হবে ইটের বাড়ি। তার পথও সিদ্ধিতে এসেছিল। সেইভাবেই বিভোর হয়ে সটান বাড়ি এসেছিল জীবন। বকেয়া টাকা, চা-পান কোনকিছুর প্রতিই যেন আসক্তি ছিল না আজ। শুধু, অনেক বছর পর, একটি মুখের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সে আর কেউ নয়, জেলেখা—দুই বয়স্ক মেয়ে ও এক শিশুপুত্রের পঁয়ত্রিশ বছুরে বুড়ি হয়ে যাওয়া জীবন আলির বউ। সটান বাড়ির ভিতর ঢুকে জেলেখার গা ঘেঁসে বসে প্রশ্ন রেখেছিল : 'জেলে বউ বুদ্ধদেবকে চিনিস? রাজপুত্তর বুদ্ধদেবকে? কথাগুলো বলতে বলতে জীবন আলি বউয়ের প্রায় গায়ে লেপটে যায় যেন। চকিতে তিন হাত দূরে সরে গিয়ে জেলেখা হত-বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি ফেলে। তাদের এক কুড়ি বছুরে স্বামী-স্ত্রী-জীবনে স্বামীকে এমন ধারা করতে কখনও সে দেখেনি। তাই বিস্ময়ের ঘোরে তার চোখে মুখে অপরিচয়ের ও অজানার কাজল লেগেই থাকে। তার ওপর আকাট মুখ্যু জীবনে সে কখনো বুদ্ধদেব নামের কোন পর পুরুষের কথা শোনেনি। বেশকিছুটা সময় ভিন্ গ্রহের জীবের মতো স্বামীকে দেখে নিয়ে বলে : 'সেজনা কেডা ছেল হ্যাগা। শউর কুলির কেউ?'

বিবির এহেন অজ্ঞতায় হো হো করে হেসে ওঠে জীবন। কথায় অমায়িক হাসি মিশিয়ে বলে :

—বুদ্ধদেব চেনো না? রাজপুত্তর গো। কিন্তুক কি জানের তেজ দেখো, রাজ্যি-রাজকন্যা, ধন সম্পদ সব ছেড়ে বনবাস গেলে।

—কনেগার রাজপুত্তর সে? আহ্! যেন ফেরেস্তা, খোদার ফেরেস্তা সে।

—তাই তো বলতিছি। বুঝলি বউ আমিও আজ বুদ্ধদেব হইছি! জানিস মনের মধ্যি ঠিক সেইরাম আনন্দ পেইছি।

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের এমন পর্যায়ে শিশুপুত্র নিজামউদ্দিন এসে কাটা কাটা শব্দে বলে : 'মা ভাত দে। খাবো।' সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ পতন ঘটে আবহাওয়ার। জেলেখা বউ সাংবেড়ে গ্রামের ছাল-চামড়া ওঠা হোগলা ছাওয়া ঘরের ঘরণী হয়ে যায়। তার সামনে তখনো বুদ্ধের সুখ নিয়ে জীবন আলি। জেলে বউ সপাটে প্রার্থনা জানায় : 'দ্যাও টাকা দ্যাও। দোকানতে চাল-ডাল আনি। বাড়ি দানাপানি কিছু নিকো।' এ প্রার্থনা যেন অমোঘ তেমন বিষাক্ত। দারিদ্রের বিষাক্ত চাওয়া এ। এ-বিষে বুদ্ধদেবের মুখোস খুলে পড়ে জীবন আলির মুখ থেকে। সে বলে :

'পার্টি আজগে তো টাকা দেইনি বউ। আর যারগা কাছে ধার পাওনা আছে—আজগে চাবা হইনি।

শিশুর সরলতা নিয়ে কথাগুলো জীবন আলি বলে আর জেলেখার দিকে ভীত-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাকায় আর বলে : 'আসলে শালা ঐ বুদ্ধদেব আজগে আমার কাল হয়েছে।'

শিশু নিজাম এই বয়সেও সব বোঝে। বুঝতে শিখতে হয়েছে তাকে। এখন ভাতের গন্ধ কোন মতেই পাওয়া যাবে না—এটা বুঝে নেবার মতো বুদ্ধিও তার আছে। তাই বাপ-মাকে ঝগড়ার মধ্যে ডুবে যেতে দেখে চলে যায় অন্যত্র। হয়তো

খেলতে। ধূলো-ধূলো ভাত রান্না খেলতে। সেদিকে দেখতে দেখতে গজগজ করে জেলেখা:

—মুখি ঝ্যাটা মারি তোমার রাজপুত্তুরির। সে মুখ পোড়া তোর হাঁড়ি জ্বালাবে? বউয়ের এমন কথায় অন্যদিন হলে বাড়িতে বাজ ফেলত জীবন। কিন্তু আজ কোনমতে সে তা করতে পারল না। অস্বাভাবিক নরম গলায় সে বলে:

—হ্যাঁরে বউ, বুদ্ধদেব ভাত দেবে। ইট দেবে। সিমেন্ট দেবে।

—তোমারে লাট করে দেবে! এই কুড়িডা বচ্ছর তো দেখতিছি। আর ঐ ছাবেরালি দেওরেরে দেকোদিনি। বছর ঘুরতি না ঘুরতি ইটির দালান দেছে।

—চুপ কর বউ ওর কতা মুখিও আনিস নে। পাপ। পাতক। মহাপাতক ওডা।

—হ্যাঁ সে পাতক আর তুমি খোদার ফেরেস্তা!

—হ্যাঁরে বউ, আজগে বুদ্ধদেব ফেরেস্তা হয়ে আমারে পথ বলে দেস্থে।

—সে পথের মুখি ঝ্যাটা।

—রাগ করিসনে বউ। আজ স্বপ্নে বুদ্ধদেব বলে দেছে উপায়। এবার যে পার্টির গোস্তো আধমন নোবো। আর আধমন কষাইগা কাছতে কিনে লে আমি নিজি ব্যাপারিগা কাছে বেপপো। দেখিস, ইট হবে, সিমেন্ট হবে।

কথা গুলো বলতে বলতে জীবন আলি যেন এক ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা হয়ে যায়। মুখে বুদ্ধদেব বাসা বাঁধে। জেলেখাও খানিক নরম হয় স্বামীকে আয় উন্নতির কথা ভাবতে দেখে। মুখের বিষাক্ত আস্তরণ কেটে কেটে পরিস্কার হয়ে যায়। তা দেখে জীবন আলি নিজে বুদ্ধদেব হয়ে হাজার কথার তসবি গেঁথে যায় অনবরত।

চার

কয়েকটা দিন এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে কাটে জীবন আলির। মনের মধ্যে যে ক্ষোভ ও অসহায়ত্ব ছিল এতদিন তা যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। এতদিন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত জীবন আলি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কারো সঙ্গে কথাই বলত না। কিন্তু এখন তার ব্যবহার পুরো উল্টো। অনাবশ্যক বেহিসেবি কথা বলে যাচ্ছে যাকে তাকে পেলে। এমন কি ছাবেরালির সাথেও। বলা নেই কওয়া নেই যাকে তাকে ধরে শুনিয়ে দিচ্ছে নিজের আয়-উন্নতির রাস্তার কথা। জীবন আলির বলার কথা সে বলে যায়, তাতে শ্রোতারা শুনুক বা না শুনুক। কিম্বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য যাই করুক। এখন সময় সুযোগ পেলে প্রায়ই ছাবেরালির নির্মিয়মান দালান বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আগের মতো আর হিংসা হয় না তার। বরং মনে মনে কল্পনা করে নিজেকে নিয়ে, অমন একটা বাড়ির মালিক হতে পারবে কিনা ভাবে। সময়ের আন্দাজও করে খানিক। দু'বছর—তিন বছর না হয় পাঁচ বছরই লাগবে তার।

মনে মনে ভাবে তার রাজমিস্ত্রীর হাতুড়ী-ছেনির আওয়াজ শোনে। সে আওয়াজ তার কানে বেহেস্তি সুর মনে হয়। খোদার প্রতি অটুট বিশ্বাস তার আরো বেড়ে যায়। নামাজের শেষে মোনাজাতে বসে রাতচরা ড্রাইভার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেহেস্তি ফেরেস্তা বনে যায় এখন। এখন শরীর মনে তার যেন নব যৌবনের বল-শক্তি ফিরে এসেছে। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তার সাইকেলও এখন যথাসম্ভব দ্রুত চলে। টাকী রোডের পাকা সড়কের বুকে আঘাত হানতে হানতে সাইকেলের দুটি চাকা সীমান্তের দিকে এগিয়ে যায়। পরম নিশ্চিন্তেই এগিয়ে যায়।

জীবন দেখে, মাঝরাত্রে ইঞ্জিনের ইট বোঝাই লরিগুলো পিছলে পিছলে কলকাতার দিকে অবিরাম চলে। তাদের মুখ থেকে বেরুনো হ্যালোজেনের হলদে আলো গায়ে মেখে চতুর ড্রাইভার জীবন আলি জীবনের পথে চলে। পায়ের পেশীগুলো ক্লান্ত হলেও প্যাডেলে মনের জোরে চাপ লাগায়। তার জীবনের এমন সন্ধিস্থানে সাইক্লোনের গতি নিয়ে পাশে হাজির হয় ছাবেরালি, রাতচরা ড্রাইভার। বলে: 'চালাও জীবনভাই! অতো আস্তে গেলি কি চলবে?' প্যাডেলে একটু বেশি শক্তি বাড়িয়ে জীবন ছাবেরের সাথে সমান্তরালে যেতে যেতে কথার পিঠে কথা ছাড়ে:

—চালাবোরে চালাবো, দ্যাখ্ না দুদিন। ফের তোর সাথে পাল্লা দে গাড়ি হাঁকাবো।

—তা তোমারে দেখে কিন্তু অবিশ্বেস হয় না। যেরাম লম্বা-চওড়া কাঠামো তোমার।

—পারবো বলতিছিস? সব খোদার রহম। দেহখানার কাঠামোর মতোন যদি এট্টা ঘর তুলতি পারি।

—কি ঘর? দালান বাড়ি?

ছাবেরালির কথায় যেন খানিকটা অবিশ্বাস ও খানিকটা বিদ্রুপের তীর মিশে থাকে। মাঝরাতের স্তব্ধতার ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিয়ে সে পুনরায় বলে:

—দ্যাখো, তোমার খোদা যদি রহম করে। তবে আমি বলি ভেন্ন কতা। শুধু গোস্তো বয়ে কি ইট গাড়া যায় ভিটেতে?

কেনো ইট গাড়তি হলি কি তোর মতোন পাপ করতি হবে নাকি?

জীবনের কথার কোন উত্তরই দেয় না ছাবেরালি। মৌন থেকে যেন বিদ্রুপ করে। অবহেলায় বিদ্ধ করে। এবং গৌরবসমেত নিজের আধিপত্যকে বজায় রাখার জন্য সীমান্তমুখী সাইকেলটাকে আরো জোরে চালাতে থাকে। প্রচণ্ড জোরে, যেমন করে নিত্য ছাবেরালি জীবনকে হার মানায়।

কিন্তু জীবনই বা হার মানবে কেন? সে তো এখন সিদ্ধ পুরুষ। গায়ে সে যৌবনের বল না থাকলেও এখন মুক্ত মনের জোর আছে তার। সুতরাং দাবো প্যাডেল জোরে জোরে। চারিদিক নৈঃশব্দের ওমে নীরব। রাস্তাতে আজ বেশ কুয়াশার বাহার। খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হয় এমন পরিস্থিতিতে। যেন দু-হাত দূরের গাড়ির আলোও দেখা যায় না। মস্তিষ্কের সামান্যতম হেরফের হলেই অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য। এমন পরিস্থিতিতে সাইকেল আস্তে চালানোই রেওয়াজ। ছাবেরালির সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে যেতে যেতে একবার তাকে সাবধান করার কথাও জীবনের মাথায় এল। কিন্তু প্রতিযোগিতার অনন্ত ট্রাক ধরে যেতে যেতে তাই-ই বা কি করে সম্ভব? এখন আস্তে আস্তে যাওয়ার কথা বলা মানে তো তার সিদ্ধিরই পরাজয়।

তাই প্রাণপন শক্তিতে সাইকেলটাকে চালিয়ে যাচ্ছে জীবন। দমে ঘাটতি আসছে। এত জোরে সাইকেল চালানোর অভ্যাস তো সে পাঁচ-সাত বছর হল ছেড়ে দিয়েছে। পায়ের পেশীগুলোও যেন ক্লান্ত-অবশ হয়ে যাচ্ছে। তবু মরিয়া চেষ্টায় ছাবেরালির সঙ্গে তাল্লা মেরে যেতে যেতে বলে:

—এতো জোরে সাইকেল চালানোর শক্তি তুই কনতে পাশরে ছাবেরালি?

—চরস তে পাই। গাঁজারতে পাই।

—তওবা তওবা। তোর মরণ ঘুনগে আলে বলে।

—কিন্তু এই বয়েসে তোমার পায় এতো বল কনতে এয়েছ্ বলোদিনি জীবনভাই?

—বুদ্ধদেব দেছে। চিনিস তারে।

জীবন আলির মুখের কথাশুনে অবাক হল ছাবেরালি। একবার জীবনের মুখ দেখতে চাইল। কিন্তু দৃষ্টিতে তার ঘন কুয়াশাছাড়া আর কিছুই পড়ল না। তাই শূন্যেই যেন কথা ছুঁড়ে দেয়: 'সেডা আবার কেডা?'

মুখে রহস্যের কৌতুক নিয়ে জীবন উত্তর দেয়: 'সে পেরায় পীর-পয়গম্বররের সমতুল্যি। তারে চিনিস নে?

—না চিনিনে!

—গোমুখ্যু থাকপি তা চিনবি কেনো?

কথোপকথনের এমন মুহূর্তে কোন যন্ত্রগাড়ির তীব্র জোরালো আলো এসে গ্রাস করে তাদের। খুব দূরে হলেও বড় জোর হাতকুড়ি দূরে রয়েছে গাড়িটা। এবং এই গাড়ির আলো রাতচরা ড্রাইভারদের কাছে অত্যন্ত চেনাজানা। পেট্রল পুলিশ। মিলিটারি। এ বসিরহাট থানার পুলিশ নয়। থানার সঙ্গে তো চুক্তি আছে। কিন্তু মিলিটারির হাতে পড়লে সেদিন রক্ষে থাকে না। হাজার অনুনয় বিনয়েও কাজ হয় না।

তাই নিরুপায়ের ব্রেক ঘচাৎ করে দু'জনেই কষে ধরে। গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। আশেপাশে নজর করে দেখে গাড়ি তাদের গোপালপুর মোড় ও ঘোলাপোতার মাঝামাঝি ফাঁকা মাঠের অবস্থানে। পালাবার কোন পথ নেই। জীবন ও ছাবের দুজনে দুজনের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে। অর্থাৎ এখন করণীয় কি? জীবন মাথা নাড়ে। অসহায়ত্ব ফুটে বেরোয় তাতে। অন্যান্য দিন এমন সব পরিস্থিতিতে টাকীরোডের মূল রাস্তা ছেড়ে রাতচরা ড্রাইভাররা গলি-রাস্তা ধরে গ্রামের মধ্যে খানিকটা ঢুকে পড়ে নিস্তার পায়। কেননা, দূর থেকে এগাড়ির আলো দেখলে আগে থেকে সাবধান হওয়া যায়। কিন্তু আজ তো তার সুযোগই ঘটেনি। তাই নিঃশর্ত আত্মসমর্পন। মানে সাইকেল সমেত মাংসের প্যাকেট 'সিজ' করে নেবে শালারা। তারপর মেন ক্যাম্পে সাইকেল চড়াবে নীলামে আর মাংস পুতে দেবে মাটির গর্ভে। পেটে টান পড়বে জীবন আলির মতো রাতচরা ড্রাইভারদের। বউ-বিবি-বাল-বাচ্চা স্বপ্ন খোয়াব সব শেষ হয়ে যাবে। যেন সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে দানব-গাড়িটা এসে থামে তাদের পাশে। গেট খুলে নামে উদ্যত সীমান্তরক্ষী-আজরাইল। জীবন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছাবেরালির দিকে তাকায়। দেখে চকিতেই মাংসের প্যাকেটের মধ্যে থেকে সেই খয়েরি কাট-কুটোর প্যাকেটটাকে দ্রুত রাস্তার ধারের ড্রেনের মধ্যে নিক্ষেপ করল। জীবন মুখে শব্দ তুলে কিছু বলতে যেতেই ছাবেরালি তার মুখ চেপে ধরে সজোরে।

পাঁচ

জীবন বোবা হয়ে দেখছিল ছাবেরালির কর্মকুশলতা। নীরবেই দেখে গেছে সমস্তটা। বোবা পাথরের মতোন। তা কাকুতি-মিনতি, ধস্তাধস্তি-ঘুষবিনিময়ে কেটে গেছে অন্তত আধঘণ্টা সময়। এরই মধ্যে ছাবেরালি ইনিয়ে-বিনিয়ে ছদ্মকান্নাকাটি করে মিলিটারি নেতার মন গলিয়েছে। 'ছার মা-বাপ। বড্ড গরিবির সোংসার ছার। নাখাতি পেয়ে মরবো ছার। বাল-বাচ্চা সব কবরে যাবে ছার। এবারগার মতোন মাপ করে দ্যান ছার। এই কান মলতিছি ছার। যেদি আর কখখনো ধরেন তবে জেল-ফাটকে দেবেন ছার।' —এমন সব মিনতি ও তোষামোদের কথা এখনও জীবন আলির কানে ঝম্‌ঝম্ করে বাজছে। ব্যঙ্গের মতন। ছাবেরের কথা ও অবস্থায় তো অনেক ফারাক। এই মাংস-সাইকেল গেলেও তার কিছু ক্ষতি হবে না। অমন একগন্ডা সাইকেল সে অনায়াসেই কিনতে পারে। অথচ জীবন আলিরই তো জান-মাল সব যাবে এগুলো 'সিজ' হলে।

মনে মনে ছাবেরালিকে তারিফ না করে পারে না জীবন। মাংসের গচ্চা গেছে যাক সাইকেলটা তো ফেরত পাওয়া গেল।

অবশ্য এমনি এমনি হয়নি। দুজনকেই দুখানা নম্বুরে নোট খসাতে হয়েছে এর জন্য। এ টাকা সব সময়ই তাদের মজুদ রাখতেই হয়। 'তা তোমার সোংসার চলতি হয় চলুক না হয় নায় চলুক।'

—কি জীবনভাই কি ভেবদেছো? মাল গেছে যাক! সাইকেলডা তো পারা গেল! ছাবেরালির কথায় চমক ভাঙে জীবনের। শব্দের উৎস খুঁজে তাকে দেখার জন্য সামনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না সে। অবাক হল। গেল কোথায়? সাইকেলটা তো তার সামনেই স্টান্ড করানো আছে।

—তা শালার অফিছারের মনে এট্টু দয়ামায়া আছে—কি বলো?

ছাবেরালির সংলাপ লক্ষ্য করে এবার তাকে খুঁজে পেল জীবন আলি। রাস্তার ধারের ড্রেনের ভিতর থেকে পাড় ভেঙে উপরে উঠে আসছে যে। হাতে ধরা নেহর-ভেজা সেই খড়-কুটোর মতোন গাঁজার প্যাকেট। চমকে ওঠে জীবন:

—কি, কিরে ওডা?

—গাঁজা। চরস। হেরোইন।

—বলেই সাইকেলটাকে সচল করে ছাবের। রাত শেষ হওয়ার আগেই ইটিডা পার হতেই হবে। হত-বিহ্বল হয়ে পড়ে জীবন আলি। শূন্য বোধ হয়। এবং তখনই আবার শোনে কুয়াশার আঁধারে মিলিয়ে যেতে যেতে ছাবেরালি বলছে:

—আর বেশিদিন করবো নাকো জীবন ভাই। বড্ড জীবনের ঝুঁকি। মাত্র ছ'ডা মাস। তারপর শুধুই ড্রাইভারি।

মাথার ভিতরের করোটির গ্রন্থিগুলি যেন পটপট করে ছিঁড়ে যায় জীবন আলির। ছাবেরালিকে দেখতে চায়। পায় না। বিনিময়ে রাত্রি-গভীরের মৌনী রূপটাকে দেখতে পায়। অচেনা লাগে। জীবনের অনন্ত ট্রাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে তাকে। সাইকেল বাঁচলেও মালগুলো সব গেল। মানে পুঁজিপাটা তার সব শেষ। ফের কসাইকে গচ্চা দিতে হবে।

মাথার মধ্যে বর্ষামুখ লোহার শিক ফোটা যন্ত্রণা। ব্যথা। শুধু সাদা শূন্য অস্তিত্ব। যেখানে এক কল্পনার রঙিন পটচিত্র তৈরি হচ্ছে। সে রঙ চিত্রে জীবন আলি নিজেকে নিজে নির্মাণ করছে। গ্রাম-প্রধানের বাড়িতে যেন তপস্যায় বসেছে জীবন আলি। প্রধানের অনেক ক্ষমতা। মিলিটারিকে বলে কয়ে যদি মাংসগুলো ফেরত করিয়ে দিতে পারে প্রধান। জীবন আলি ভাবে, প্রধানের কাছে কল্পনার জীবন আলি অনন্তের ধ্যানে বসেছে। প্রধান না পারে কি? প্রধান বোধিবৃক্ষ।

মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যায় জীবন আলির। দুলে ওঠে সমস্ত ভূমিমন্ডল ও বনরাজি। পড়ে যেতে গিয়েও টাল সামলে নেয় জীবন আলি সাইকেলের হ্যান্ডেলে ভর করে। তারপর অতি ধীর গতিতে সাইকেলটাকে সচল করে সে। □

চতুরঙ্গের

আগামী সংখ্যায় থাকছে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সন্দর্ভ

বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান মনস্কতা

মানস জোয়ারদার

'বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণ শক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যাথার্থ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সর্ব প্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়। কিন্তু আমরা বারংবার দেখিয়াছি আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত বিজ্ঞানঘেঁষা ছাত্রেরাও কালক্রম তাঁহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কায়দা টিলা দিয়া অযৌক্তিক সংস্কারের হস্তে আত্মসমর্পণ পূর্বক বিশ্রামলাভ করেন। ...ঘরে বাহিরে চারিদিকে বিজ্ঞানের আলোককে সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলে তবেই বিশেষভাবে বিজ্ঞানের চর্চা এদেশে স্থায়ীরূপে বর্ধিত হইতে পারিবে। ...ভারতবর্ষীয় প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধোগতির প্রধান কারণ এই ভিত্তির সংকীর্ণতা, ব্যাপ্তির অভাব, একাংশের সহিত অপরাংশের গুরুতর অসাম্য।' বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে যখন বিজ্ঞানশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল কিছু ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে, 'ইংরেজি ভাষার কড়া পাহারার মধ্যে।' স্বাধীনতার পর সে চিত্রের অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। 'ভিত্তির সংকীর্ণতা", 'ব্যাপ্তির অভাব'—এ রকম অভিযোগ আজ দাঁড় করানো মুস্কিল। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির লোকবলের নিরিখে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান তৃতীয়। প্রতি বছর এখন ১১ লক্ষের উপর ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশুনোর জন্য ভর্তি হয়। পশ্চিমবঙ্গে এ সংখ্যা ১ লক্ষের কাছাকাছি।

বিজ্ঞান শিখে কি হয়:

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তারই অনেকটা প্রতিধ্বনি শুনি ছ'এর দশকের শেষভাগে কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদনে, যেখানে স্কুলে স্কুলে বিজ্ঞানশিক্ষার কথা যেমন বলা হয়েছে, বলা হয়েছে শিক্ষাদানের গুণগত মানের যথেষ্ট উন্নতি ঘটানোর কথাও। Science education must become an integral part of school education; ....The quality of science teaching has also to be raised considerably so as to achieve its proper objectives and purposes, namely to promote ever deepening understanding of basic principles, to develop problem solving and analytical skills and the ability to apply them to the problems of the material environment and social living and to promote the spirit of enquiry and experimentation. Only then can a scientific outlook become part of our way of life and culture.

যে বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে 'ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধসংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মত দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়', বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জীবন চর্চার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে, তা নিশ্চয়ই নিছক কিছু বিজ্ঞানের নীতি, সূত্র কিংবা ফর্মুলা শিক্ষা নয়। বিজ্ঞানশিক্ষা যেমন বাস্তবকে সঠিকভাবে জানতে বুঝতে শেখায় তেমনি এর নিবিড় অনুশীলনের সহায়তায় শিক্ষার্থীর মনে গড়ে ওঠে বিচার বিশ্লেষণের সক্ষমতা, সামাজিক পরিমণ্ডলে বৈজ্ঞানিক বোধ, বিজ্ঞান মনস্কতা। নিচু ক্লাস থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্য দিয়ে অজানাকে জানার আগ্রহ, কার্য-কারণ সম্পর্কের অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা বিশ্লেষণ বোধের উন্মেষ ঘটাতে পারলে তারা সহজেই বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারবে। ভ্রান্তি, কুসংস্কার দূর হবে। যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বুঝতে শিখবে বিজ্ঞান নিয়েও আছে অনেক অপপ্রচার, অনেক অপপ্রয়োগ। আছে বিজ্ঞানের কল্যাণধারাকে বিপথে চালিত

করার, মানুষের উপর, দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষমতাগর্বী অপচেষ্টা। আছে পরিবেশ ধ্বংস করে মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করার ক্লিন্ন ইতিহাস। জানতে পারবে — বিজ্ঞানের অবদান সব মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায় নি। বিজ্ঞান সব মানুষকে সুখী করতে পারে নি। বিজ্ঞানের নাম করেই বাজারে চালু রাখা হয়েছে অজস্র অপ্রয়োজনীয় ওষুধ। নিষিদ্ধ ওষুধ। বেবিফুড, 'হেলথ ড্রিঙ্ক' আর 'টনিক' এর নামে চলছে লক্ষ লক্ষ টাকার মিডিয়া প্রচার। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে চলেছে। খাদ্য সম্পর্কে পুষ্টি সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকলে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থের অনেক অপচয় বন্ধ হতে পারত। বিজ্ঞানের বিকৃতি ঘটলে তার অবদান শোষণের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয় — এমন কথা বলেছিলেন ব্রেখট।

বিজ্ঞান পাঠক্রমের বর্তমান গুরুত্ব :

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পাঠক্রমে সপ্তম শ্রেণী থেকেই আবশ্যিকভাবে ভৌতবিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞান মিলিয়ে দু'শ নম্বরের বিজ্ঞান পড়তে হয় এখন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে জীবনবিজ্ঞান পড়ানো হয় একশ' নম্বরের। প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তারও আগে। পাঁচের দশকে পূর্বতন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় মোট আটশ' নম্বরের মধ্যে বিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল পঞ্চাশ নম্বর। মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অল্প কিছু রাজ্যের সঙ্গে অষ্টম শ্রেণীর পর তিন বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম চালু করে এ রাজ্যে। নবম শ্রেণী থেকেই তখন কলা-বাণিজ্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পাঠক্রম ভাগ হয়ে যেত। এ ব্যবস্থা চালু ছিল সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তারপর থেকে কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে সারা দেশের সঙ্গে এখানেও চলছে দশ বছরের মাধ্যমিক আর দু'বছরের উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম। চলতি পাঠক্রমে বিজ্ঞানশিক্ষাকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা মানতেই হয়।

বিজ্ঞান মনস্কতা কতদূর ?

পাঠক্রমে বিজ্ঞানশিক্ষার গুরুত্ব বাড়িয়ে, ব্যাপ্তির প্রসার ঘটিয়ে বিজ্ঞান মনস্কতা কতটা আয়ত্ত করা গিয়েছে সে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। কিছু কাল আগে গণেশ ঠাকুরকে দুধ খাওয়ানো নিয়ে সারা দেশে যে উত্তাল ভাবালুতার বন্যা বয়ে গেল, 'সত্যযুগ আসি গেলা'র আপ্লুত ঘোষণা স্তব্ধ করে দিল লক্ষ লক্ষ মানুষের বিচার বোধ তাতে সামিল হতে দেখা গিয়েছে বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষকেও। শূন্য থেকে মুঠোয় করে মুহূর্তে সন্দেশ এনে খাওয়ানো যে আসলে হাত সাফাইয়ের খেলা, যাদুকর প্রদীপ সরকার তা একঘর মানুষের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন 'বিভূতি' রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও। তা সত্ত্বেও সাধুবাবার অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী ভক্তদের মধ্যে বহু গণ্যমান্য উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পর্যন্ত। প্রদীপ সরকারের মতে এসব 'বাবা'রা আসলে সস্তা যাদুকর। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যেও ডাইনী/ডাইন সন্দেহে খুন করা হয়েছে ৭৫ জনকে। স্কুলের খহরাপ রেজাল্ট, নানা রকম বিভ্রাট-গণ্ডগোলের জন্য গ্রহের কোপ থেকে উদ্ধার পাবার আশায় আলিপুরদুয়ার জংসন রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুলের মধ্যেই অনুষ্ঠান করেছিলেন এক শান্তিযজ্ঞের। গ্রহ-নক্ষত্রের কু-প্রভাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য যে রত্ন ধারণের বিধান, আজকের বিজ্ঞানে তার ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। বাইরের গ্রহনক্ষত্র যেভাবে পৃথিবীকে, তার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে তা হল বিকিরণের সাহায্যে, মৌলিক কণাস্রোতের সাহায্যে অথবা মহাকর্ষ বলের সাহায্যে। পৃথিবীতে আসা আর সব নক্ষত্রদের বিকিরণ একত্রে সূর্য থেকে আসা বিকিরণের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগও নয়। পৃথিবীর প্রাণী উদ্ভিদদের অস্তিত্বের পুরোটাই সূর্য নির্ভর। কণিকাস্রোতের সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন সরাসরি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় নি। পৃথিবীপৃষ্ঠে বাস করা মানুষের উপর নক্ষত্রের মহাকর্ষ বলের প্রভাব সম্পর্কেও একই কথা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে একমাত্র সূর্য ছাড়া আর কোন নক্ষত্রই এত কাছে নেই যে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। গ্রহের সম্পর্কে বলা — এদের নিজস্ব কোন বিকিরণ নেই। কণিকাস্রোতও নেই বললেই চলে। সূর্যের তুলনায় এদের ভরও সামান্য। তাই গ্রহগুলি মানুষের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এ ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। চাঁদ গ্রহ নয়, পৃথিবীর উপগ্রহ। মহাকর্ষবলের প্রভাবে চাঁদ জোঁয়ার-ভাটা সৃষ্টি করতে পাললেও মানুষের স্বাস্থ্য বিপর্যয়ে তার ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যায় নি। রত্ন, ব্যবসায়ী এবং জ্যোতিষ সম্রাটদের মিলিত প্রযত্নে গড়ে ওঠা রত্ন ব্যবসার কিন্তু এখন বিপুল জনপ্রিয়তা। বিশাল পসার।

বিজ্ঞান শেখানোর আয়োজন :

বিজ্ঞানের সব বিষয়েই নিরন্তর অগ্রগতি ঘটে চলেছে। নিচু ক্লাসে বিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে ছোটদের আগ্রহ জন্মানোটাই বড় কথা। এই জিজ্ঞাসা সৃষ্টির হাত ধরেই, প্রকৃতি বিজ্ঞানের, পরিবেশ বিজ্ঞানের, জীবন বিজ্ঞানের ছোটখাটো বিষয়ের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়েই সহায়তা হয় বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে

তোলার। অন্য বিষয়ের তুলনায় বিজ্ঞানশিক্ষায় পাঠক্রমের সীমানা, পাঠ্যবইতে তার বিন্যাস, তার উপস্থাপনা, শিক্ষাদানের ধারা — এ সবের গুরুত্ব অনেক বেশি। বিজ্ঞানের পাঠ্যবইতে অসঙ্গতি, ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসাবোধকে বিভ্রান্ত করতে বাধ্য।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রকৃতি বিজ্ঞান বইতে বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে বল বোঝাতে গিয়ে কখনো 'ধাক্কা-বল', কখনো 'টানা-বল', কখনো 'মোচড়ানো-বল' বলা হয়েছে, বলের এ রকম শ্রেণীবিভাগ কি পদার্থবিজ্ঞান সম্মত ? পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে ধন্দে পড়বে নাতো ? মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ষষ্ঠ শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞান বইতে জীবজন্তু প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে। বিড়াল — ফেলিস ডোমেস্টিকা, কুকুর — ক্যানিস ফ্যামিলিয়ারিস, গরু — বোভিস ইন্ডিকা, পাতি কাক — করভাস সেপ্লন্ ডেপ, টিকটিকি — হেমিড্যাক্‌টাইলস্ ফ্লুভিভিরিডিস্। পর্ষদ অনুমোদিত এমন একখানি বইএর গ্রন্থকার প্রস্তাবনায় আশা প্রকাশ করেছেন — 'মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৯৭৪ সালে জীবনবিজ্ঞানের প্রবর্তন নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।...ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জীবনবিজ্ঞানের এই পাঠক্রম খুবই চিত্তাকর্ষক হবে বলে আশা করি।' অল্প বয়সী ছাত্রছাত্রীদের এই সব 'চিত্তাকর্ষক' বৈজ্ঞানিক নাম শেখানোর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানশিক্ষায় কতটা বিপ্লব আনা যাবে সাধারণ বুদ্ধিতে তা বুঝে ওঠা কঠিন। তবে এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য — 'আমি দেখি বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের এমন সব বড় বড় কথা বলা হয়, যা শুনলে আমাদেরই প্রাণে আতঙ্ক আসে।' একই বইতে পরিবেশের উপাদান প্রসঙ্গে তাপ এবং তাপমাত্রাকে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর পরিবেশকে গ্রীষ্ম মণ্ডল, হিম মন্ডল প্রভৃতি অঞ্চলে ভাগ করার কথা বলতে গিয়ে temperature বোঝাতে লেখা হয়েছে 'উষ্ণতা বা তাপ।'

সপ্তম শ্রেণীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একখানি বহুল প্রচলিত বইতে লেখা হয়েছে — উল্কা পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।' সবটা বলা হল না। অধিকাংশ উল্কার ভাগ্যে এ রকম ঘটলেও বড়, ভারী উল্কার ক্ষেত্রে অবশিষ্টাংশ পৃথিবীর বুকে এসে আছড়ে পড়ে। একই বইতে লেখা হয়েছে — 'অভিকর্ষ ভরের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য চাঁদের আকর্ষণ বল অর্থাৎ অভিকর্ষ পৃথিবীর আকর্ষণ বলের বা অভিকর্ষের চেয়ে অনেক কম।' একই গ্রন্থকারের এই বিষয়ের একখানি বাজার চলতি সহায়ক বইতে লেখা হয়েছে — 'যেহেতু পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের ভর প্রায় ২৭ গুণ বেশি তাই সূর্যের আকর্ষণ বল পৃথিবীর অভিকর্ষের চেয়ে ২৭ গুণ বেশি।' অভিকর্ষের মান চাঁদ, পৃথিবী বা সূর্যের কেবল ভরের উপর নির্ভর করে না। তাদের নিজ নিজ ব্যাসার্ধের উপরও নির্ভর করে (ব্যাসার্ধের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক)। সূর্যের ভর পৃথিবীর চাইতে মাত্র ২৭ গুণ নয়, তিন লক্ষ গুণেরও বেশি। সূর্যের ব্যাসার্ধও পৃথিবীর একশ' গুণের উপর। ভর এবং ব্যাসার্ধ — এই দুই এর যৌথ প্রভাবেই সূর্যের অভিকর্ষ পৃথিবীর চাইতে ২৭ গুণ বেশি হয়, আর চাঁদের অভিকর্ষ হয় পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ। এই বইতেই লেখা হয়েছে — বরফ জলে ভাসে তার কারণ, 'বরফ দ্বারা অপসারিত জলের ওজন বরফের ওজনের বেশি।' প্লবতা একটি উর্ধ্বমুখী বল যা বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের সমান। স্থিতিশীল ভাসমান বস্তুর ক্ষেত্রে অপসারিত তরলের ওজন সব সময় বস্তুর ওজনের সমান। কম বা বেশি নয়। বরফের ওজন থেকে ওর সমান আয়তনের জলের ওজন বেশি, তাই বরফ জলে ভাসে। 'প্লবতা তরলের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে' — এটা পরীক্ষা সহযোগে বোঝাতে গিয়ে একটি কাঠের স্কেলের একদিকে সীসার পাত দিয়ে মুড়ে স্পিরিট, কেরোসিন এবং জলে আলাদা আলাদাভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্কেলটি তিনটি তরলেই দৈর্ঘ্য বরাবর খাড়াভাবে ভাসবে, কিছু অংশ তরলের বাইরে আর কিছু অংশ তরলের ভিতরে রেখে। ঘনত্বের উপর নির্ভর করে স্কেলের নিমজ্জিত অংশ তিনটি তরলে তিন রকমের হবে। বলা হয়েছে — 'জলের ঘনত্ব কেরোসিনের চেয়েও বেশি তাই ওর প্লবতা আরো বেশি'। প্লবতার মান তিনটি ক্ষেত্রেই অভিন্ন। তিনটি ক্ষেত্রেই অপসারিত তরলের আয়তন এবং ঘনত্বের গুণফল একই থাকে — এ কথাটি না বললে শিক্ষার্থীর বিভ্রান্তিই বাড়ে।

সপ্তম শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞান বইতে লেখা হয়েছে — 'মধু ডায়াবেটিস রোগীর পক্ষে আদর্শ পথ্য', লেখা হয়েছে — 'বাসকপাতা জলে ভিজিয়ে রাখলে জল জীবাণুমুক্ত হয়'। 'তুলসীপাতা আদার রস মিশিয়ে খেলে যে কোন জ্বর দূরীভূত হয়', 'সর্পগন্ধার মূলের রস সর্পদংশনের প্রতিষেধক'।

শর্করা বিপাকে গোলোযোগের কারণে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকেই সাধারণভাবে ডায়াবেটিস বলে। শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রথমে রূপান্তরিত হয় গ্লুকোজে। তারপর প্যানক্রিয়াস নিঃসৃত ইনসুলিনের সহায়তায় গ্লাইকোজেনে। যে কারণে চিনি গুড় খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয় ; মধুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। ভেষজ গুণ সম্পন্ন গাছপালা বহুই আছে। কিন্তু সে বিষয়ে গ্রন্থকারদের উৎসাহ এতটাই মাত্রাছাড়া যে তা বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা গড়ে তুলতে মোটেই সাহায্য করে না। অনেক সময় বরং ক্ষতির কারণ হয়। বিষধর সাপের কামড়ের চিকিৎসা অ্যান্টিভেনিন ইঞ্জেকশন। সর্পবিষ বিনাশক কোন ভেষজ ওষুধের সন্ধান বৈজ্ঞানিক জগতে আজও অজানা।

অষ্টম শ্রেণীর প্রকৃতি বিজ্ঞানের একটি বইতে থার্মোমিটারের উর্ধ্বস্থিরাঙ্ক বোঝাতে লেখা হয়েছে— 'প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় বিশুদ্ধজল তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে পরিণত হয়।' জল কিন্তু সব উষ্ণতায়ই বাষ্পে পরিণত হয়। স্ফুটনের কথা না বললে বক্তব্য স্বচ্ছ ও নির্ভুল হয় না। লেখা হয়েছে— 'পারদ তাপের সুপরিবাহী বলে বস্তু থেকে খুব কম তাপ গ্রহণ করেই প্রসারিত হয়।' তাপ গ্রহণ করে উষ্ণতা মাপার জন্য পারদের যে বৈশিষ্টাটি দায়ী তা হল তার কম আপেক্ষিক তাপ। ভাল সুবেদী থার্মোমিটার প্রস্তুতির জন্য বলা হয়েছে— 'বালবের আকার বড় হলে বেশি আয়তনের পারদের প্রসারণ হয় ফলে উষ্ণতার সূক্ষ্ম পার্থক্য মাপা সম্ভব হয়।' কম বড় বালবে বেশি পরিমাণ পারদ নিলে পারদের প্রসারণ বেশি হবে ঠিকই, কিন্তু বেশি পারদ উত্তপ্ত হতে সময় বেশি লাগবে এবং বস্তু থেকে বেশি পরিমাণ তাপ গ্রহণ করার ফলে বস্তুর তাপমাত্রায় পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। ফলে বস্তুর সঠিক তাপমাত্রা ধরা পড়বে না। বালবের সাইজ তাই খুব ছোট অথবা বেশি বড় করা হয় না।

একই বইতে লেখা হয়েছে— 'ইলেকট্রিক ট্রেনের তারে খুব উচ্চ বিভবের তড়িৎ থাকে (৩০,০০০ ভোল্ট)। বর্ষাকালে এই উচ্চ বিভবযুক্ত তারের প্রভাবে ওর চারপাশের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু তড়িৎগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তাই এই সময় লোহার হাতলযুক্ত ছাতা খুলে রেল লাইন পার হওয়া বিপজ্জনক।' জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাসের চাইতে শুকনো বাতাস বিদ্যুতের বেশি কু-পরিবাহী। কিন্তু ইলেকট্রিক ট্রেনের বিদ্যুৎবাহী তার এতটাই উঁচুতে থাকে যে ছাতা মাথায় দিলেও ছাতা থেকে তারের দূরত্ব তড়িতাহত হবার পক্ষে অনেকটাই বেশি। সে তুলনায় ওভার ব্রিজ কিংবা ইলেকট্রিক ট্রেনের ছাদ থেকে বিদ্যুৎবাহী তারের দূরত্ব অনেক কম। বৃষ্টির দিনে তা হলে অসংখ্য ট্রেন যাত্রীর এবং ওভারব্রিজ ব্যবহার করা মানুষের তড়িতাহত হবার ঘটনা ঘটত। বিজলিবাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'যে ফিলামেন্টের রোধ বেশি, সেই ফিলামেন্ট বেশি উত্তপ্ত হয়, ফলে বেশি আলো উৎপন্ন হয়।' দুটি বিজলিবাতির মধ্যে যার রোধ কম সেটিই বেশি উত্তপ্ত হবে। উৎপন্ন তাপ রোধের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।

নিদারুণ অবহেলা :

বিজ্ঞানের পাঠ্য বইতে বিভিন্ন স্তরে এরকম অযত্ন অবহেলার অজস্র উদাহরণ ছড়ানো আছে। অথচ শিক্ষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘিরে, তার বিচার বিশ্লেষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা ঘিরে অনেক উদ্যোগ আয়োজন আছে। তদ্বির তদারকির জন্য সংস্থা সংগঠনেরও অভাব নেই। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে এ রাজ্যে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীই আছেন ছ'জন। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তককে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ছাড়পত্র পেতে গেলে দরকার হয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন। যোগাড় করতে হয় TB নাম্বার (Text Book Number)। নিয়ম অনুসারে ঐ বিষয়ে পণ্ডিত লোকেরা খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই বইটির কপালে টি বি নাম্বারের রাজটিকা জুটবে। তাহলে বিজ্ঞান শেখানোর নামে অল্প বয়সের ছাত্র ছাত্রীদের মগজে যা চালান দেওয়া হচ্ছে তার দায়িত্ব নেবেন কারা? মনে রাখা দরকার — এ বয়সে যা শেখা যায় তার প্রভাব দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে। বিশেষজ্ঞরা কি শুধু পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা গুনেই অনুমোদন দেওয়া না দেওয়া ঠিক করেন? এ বিষয়ে একজন গ্রন্থকারের মন্তব্য — 'কোন্ বিষয়ে ক'লাইন ক' পৃষ্ঠা লিখতে হবে তা ঠিক করে দেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিশেষজ্ঞরা, আর ঐ নির্ধারিত লাইন-সংখ্যার মধ্যেই গ্রন্থকারেরা তাদের লেখনীর বিস্তার সীমাবদ্ধ রাখেন। না রেখে উপায় নেই।... বই পাঠ্য হবার পূর্বশর্ত হল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের 'আগমার্ক', যার নাম 'টেক্স্ট্ বুক নাম্বার', সংক্ষেপে টি বি নাম্বার। কথাটা আমার কাছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। শিক্ষাজগৎ যে ক্ষয়রোগের কবলে পড়েছে এটা বোধ করি তারই সাংখ্যিক রূপ।'

পাঠ্যবই সম্পর্কে অযত্ন সমগ্র বিজ্ঞানশিক্ষা জগতে অযত্ন অবহেলার অবশ্যই এক খণ্ডচিত্র। পাঠ্যসূচী, তার বিন্যাস, ক্লাসে ল্যাবরেটরিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, পরীক্ষা ব্যবস্থা এ সবের উন্নতি নিয়েও অনেক ভাবনা চিন্তার সুযোগ আছে। স্কুল কলেজের পাঠ্যবই পুরোপুরি সরকারি দায়িত্বেই তৈরি হওয়া উচিত — এমন কথা কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল। মহারাষ্ট্র এবং বিহার রাজ্যে এ ধরনের সংস্থা অনেকদিন স্থাপিত হয়েছে। বিহারে যথেষ্ট ভালো পরিকাঠামো থাকলেও সেখানকার কাজকর্ম নৈরাশ্যজনক। কিন্তু না-লাভ না-লোকসানে চালিত মহারাষ্ট্রের State Bureau of Testbook Production and Curriculum Research যথেষ্ট সন্তোষজনক ভাবে কাজ চালাচ্ছে। এ রাজ্যে একটি স্বতন্ত্র State Textbook Corporation প্রতিষ্ঠা করার আগে এখানে অনেক দিন থেকেই যে State Book Board কাজ করছে তার আওতায় পাঠ্যবই তৈরি শুরু করতে পরামর্শ দিয়েছিল মিত্র কমিশন। রাজ্য সরকার সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছে বলে জানিয়েছিল ১৯৯৪ সালের জুন মাসে।

পাঠ্য বইয়ে বিভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আগেও লেখালেখি হয়েছে। লেখা হয়েছে বিজ্ঞানশিক্ষার অবাবস্থা নিয়েও। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলা যদিও সহজ নয়, সদিচ্ছা নিয়ে, আন্তরিকতা নিয়ে এ সবের মধ্য দিয়েই খুঁজতে হবে 'ক্ষয়রোগ' নিরসনের রাস্তা, সঠিক বিজ্ঞান শিক্ষার রাস্তা।

সূত্রনির্দেশ :

১। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ (শিক্ষাচিন্তা) : গ্রন্থালয়, ১৯৮৮।

২। Selected Educational Statistics (1990-91): MHRD.

৩। Report of the Education Commission (1964-66): NCERT

৪। Report of the Education Commission (1992): Govt. of West Bengal.

৫। The Great Magician: Sikha Tribedi; Illustrated Weekly; Aug 3-9, 1986.

৬। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী : জানু-এপ্রিল, ১৯৯১।

৭। পৃথিবীর উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব কতটুকু? : জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, দেশ, ১১/৪/৯২।

৮। প্রকৃতি বিজ্ঞান (১ম ভাগ) : পশ্চিম বঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, ১৯৯৪।

৯। জীবন বিজ্ঞান পরিচয় (৬ষ্ঠ শ্রেণী) : ডাঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী, (একাদশ সং)।

১০। সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (৭ম শ্রেণী) : সুখেন্দু মাইতি, (অষ্টাদশ সং)।

১১। প্রশ্নোত্তরে প্রকৃতি বিজ্ঞান (৭ম শ্রেণী) : সুখেন্দু মাইতি, (পঞ্চম সং)।

১২। মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান (৭ম শ্রেণী) : স্বপনকুমার সাহা, অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার পাল, (১৯৯২)।

১৩। সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (৮ম শ্রেণী) : সুখেন্দু মাইতি, (অষ্টাদশ সং)।

১৪। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তুঘলকী : অজয় চক্রবর্তী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জানু-এপ্রিল, ১৯৯১।

১৫। বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রাথমিক হালচাল : রবীন মজুমদার; পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা, ১৯৮৮।

১৬। বিজ্ঞানশিক্ষা, মাধ্যমিক হালচাল : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা, ১৯৯২।

১৭। বিজ্ঞান শিক্ষা : সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়; দেশ (সাহিত্য সংখ্যা), ১৩৯৬। □

শিক্ষার হালচাল

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

নিয়মের বাঁধন যত শক্ত হোক না কেন কিছু মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে তার ফাঁক দিয়ে গলে যান, এ সত্য সকলের জানা। আর শিক্ষকরা তো বুদ্ধিজীবি তাঁরা ফাঁকি দিলে বাঁধে তাদের এমন সাধ্য আছে কার? বাধা একটাই — শিক্ষকের বিবেক। নিষ্ঠাবান আদর্শ শিক্ষকরা, অনেকে তেমন নিয়মকানুনও বোঝেন না, এখনও পড়তে চান এবং পড়াতে চান। সাম্প্রতিককালে তাঁরাও বেশ কষ্টে আছেন, ধন্দে পড়েছেন।

দিন কয়েক আগে এক ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন 'প্রফেসর অফ ইনভিজিলেশন' বলে। আলাপ হয়ে ওঠার পর তিনি তাঁর ডায়েরি খুলে দেখালেন যে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে কলেজে তাঁর মাত্র দুটো দিন ক্লাস। অন্য দিনগুলোয় কলেজে পরীক্ষা। এসে গেছে পরীক্ষার মরশুম!

কলেজ ঋতুচক্রে তিন প্রধান ঋতু— পরীক্ষা, ছাত্রভর্তি আর ছাত্রসংসদ নির্বাচন। বছর শুরু হয় (ক্যালেণ্ডার বছর) বি.এ./বি.এস.সি. পার্ট ওয়ান টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে। এ পরীক্ষা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রস্তুতি কোন পর্যায়ে তার একটা ধারণা পায় ছাত্র। শিক্ষক আন্দাজ পেতে পারেন যা দিলেন তার কতটা ছাত্র গ্রহণ করল। নিজের ঘাটতি কোথায় কতটা তারও সঙ্কেত মেলে। পার্ট টু'র টেস্ট পরীক্ষা সব কলেজে হয় না। কেউ ভাবেন অপ্রয়োজনীয়, কেউ সময় পান না। পার্ট ওয়ান টেস্টের খাতা দেখা শেষ হতে জানুয়ারি অন্ত যাবার সময় হয়। মার্চের মাঝামাঝি শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাযজ্ঞ। প্রথম পরীক্ষা বি.কম পার্ট ওয়ান। তারপর লাইন দিয়ে পরীক্ষা।

তালিকাটি লক্ষ্য করুন (সংসদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসূচি):

বি.কম পার্ট ওয়ান অনার্স: 15.3.96 - 22.3.96
পাস: 25.3.96 - 3.4.96
হায়ার সেকেন্ডারি: 26.3.96 - 11.4.96
বি.এ. / বি.এস.সি./বি.কম পার্ট টু: 16.4.96 - 26.4.96
বি.এ. / বি.এস.সি পার্ট ওয়ান অনার্স: 30.4.96 - 9.5.96
বি.এ. / বি.এস.সি পার্ট ওয়ান পাস: 15.5.96 - 14.6.96

এর ওপর পার্ট টু ও পার্ট ওয়ানের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা সূচির ফাঁকে স্থান করে নেয় একাদশ শ্রেণী ও প্রথম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা। ষাণ্মাষিক, মাসিক পরীক্ষা এক কালে হতো। এখন সে সব পরীক্ষার কথা অধিকাংশ কলেজ ভুলে গেছে। সব কলেজে সংসদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা হয় তা নয়। কোথায়ও একটি, কোথায়ও দু'টি পরীক্ষার কেন্দ্র হয়। এ ক্ষেত্রে কলেজের সুনামই হয় কলেজের শত্রু। ভালো কলেজগুলিতে কেন্দ্র করতে কর্তৃপক্ষ স্বভাবত বিশেষ আগ্রহী হয়।

পরীক্ষার মরশুম শেষ হলে আসে ভর্তির মরশুম। প্রথমে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি, তারপর প্রথম বর্ষের ভর্তি। ছাত্র, অভিভাবক ও ছাত্র সংগঠনের কর্তারা এ সময় কলেজ চত্বরে উল্লাস ও উদ্বেগ মেশানো যে আবহ তৈরি করে তা পঠন-পাঠনের অনুকূল নয়। ভর্তি পর্ব শেষ হতে হতে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহটিও ফুরিয়ে যায়। আলোচনা শুরু হয় — পুজো কি এ মাসের শেষে না পরের মাসে? তাছাড়া, হাট ভাঙ্গার পর যেমন ধুলো বসতে কিছু সময় যায়, তেমনই কিছুটা সময় বয়ে যায় ভর্তি পর্ব শেষে পড়াশুনার পরিবেশ গড়ে উঠতে। প্রকৃত গতিযুক্ত হবার আগেই পুজোর ছুটির ঘন্টা বেজে ওঠে। পুজোর পর মাস খানেক নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়নের সুযোগ, তারপর, পরীক্ষা মরশুমের পুনরাগমন। শুরু হয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের টেস্ট। বছর শেষ। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নানা কলেজে নানা সময় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তা যখনই হোক, তার জন্য কম করে তিনটি সপ্তাহ পড়াশুনা শিকেয় তুলে রাখা ভালো।

কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের জিজ্ঞাসা: কলেজে পড়াই ক'দিন? আমার প্রধান কাজ কী পরীক্ষার হলে নজরদারি, না পড়ানো?

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন চায় পড়াশনার জন্য কলেজগুলি বছরে দু'শ কুড়ি দিন খোলা থাক। এ রাজ্যের বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন বড় বেশি ছুটি ভোগ করেন মাষ্টারমশইরা। তাঁরা চান, কলেজ ১৮০-২০০ দিন খোলা থাকে তার ব্যবস্থা হোক। এ বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ শুনলে সন্দেহ হয় যে তাঁদের অনেকেই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি। প্রস্তাব কার্যকর করার বাধা কোথায় তা না জানলে বা না জানালে সেগুলি তো অর্থহীন অবাস্তব উচ্চতায় ঘুমিয়ে থাকবেই। সংকটের প্রকৃতি ও সংকটমোচনে বর্তমান সরকার প্রথমে Commission for planning Higher Education নামে একটি এক সদস্যের কমিশন গঠন করেন যার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অভিজ্ঞ প্রশাসক ড. ভবতোষ দত্ত। সেই কমিশনের রিপোর্ট কোনও অজ্ঞাত কারণে সরকার কার্পেটের তলায় ঢুকিয়ে ফেলে। তারপর ১৯৯১ সালে গঠিত হয় আরও একটি কমিশন যার নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র। আমরা মিত্র কমিশনের রিপোর্ট সামনে রেখেই শিক্ষা সংকটের কয়েকটি দিক আলোচনা করতে পারি। আলোচনার শুরুতেই একটা কথা মেনে নিতে হবে যে, সব শিক্ষকই অসৎ বা কর্তব্যকর্মে বিমুখ এ কথা সত্য নয়। কমিশনের সংগৃহীত তথ্য সারণি থেকেও এ কথার সমর্থন মেলে।

মিত্র কমিনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পড়াশুনার জন্য কলেজগুলি খোলা থাকে বছরে ১২৫-১৪০ দিন। বেশ কিছু কলেজ ঘুরে বর্তমান নিবন্ধকারের ধারণা — সংখ্যাটি একশ' দিনের বেশী নয়। ভারতবর্ষে যে কোন কর্মক্ষেত্রেই ছুটির দিনের সংখ্যা বেশ বেশি। ছুটি দানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সমান উদার। মঞ্জুরি কমিশন যাই বলুক, এদেশে বছরে দু'শ কুড়ি দিন লেখাপড়ার জন্য কলেজ খোলা রাখার প্রস্তাব অবাস্তব। এ রাজ্যে সরকারি অফিসগুলি খোলা থাকে সপ্তাহে পাঁচদিন (শিক্ষায়তনগুলি সপ্তাহে সাড়ে পাঁচদিন)। এর সঙ্গে জাতীয় ছুটি, ক্যাজুয়াল লিভ, আর্নড্ লিভ, মেডিক্যাল লিভ এ সব যোগ করলে সহজে বোঝা যায় কাজের দিন কত। এ সব ছুটি ছাড়াও কলেজে আছে দীর্ঘ অবকাশ কালীন (Vacation/recess) ছুটি এবং সে জন্যই মনে হয় কলেজগুলিতে ছুটি বেশি। কমিশন এই ধারণাটাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তাব রেখেছে: A drastic reduction in vacation time and holidays is clearly called for, as also an abridgement of summer and autumn recess।

কলেজের ছুটির তালিকায় অবকাশকালীন (গ্রীষ্ম ও পূজা) ছুটি মোট ছুটির পয়ষট্টি-সত্তর ভাগ। বোঝাই যাচ্ছে খুচরো ছুটির সংখ্যাও মন্দ নয়। মহাত্মাদের জন্মদিন, জাতীয় ছুটির দিন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবের দিন কলেজ বন্ধ। চৈত্র সংক্রান্তি, ইংরেজি নববর্ষ, ইস্টার স্যাটারডে, ফতেহা ইয়াজদাহাম কিছুই বাদ দেওয়ার যেন উপায় নেই। এ সব ছুটির অনেকগুলিই কারও কোনও উপকারে আসে না। এমন ছুটি বাতিল বা ছাঁটাই করা যায় কিন্তু কর্তাদের যেন সে সাহস নেই। উল্টে, নানা পক্ষের চাপে, অবকাশকালীন ছুটি ছাঁটাই করে কিছুটা (মোট ছুটির দিনের সংখ্যা অপরিবর্তনীয়), খুচরো ছুটি বাড়ানোর একটা ঝোঁক কোথায়ও নজরে আসে। এর ওপর অঘোষিত ছুটি। ছুটি হয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির (রাজনৈতিক নেতা হলে তো কথাই নেই) প্রয়াণে, দাদা দিদি তথা বিভিন্ন দল ও সংগঠনের ডাকা বন্ধ-বিক্ষোভ-সমাবেশের দিনে, আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ-কৌশল শিক্ষা ও প্রয়োগের কর্মশালা কলেজ। ধর্মঘট লেগেই আছে। এর কিছুই কমিশনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কমিশন বলেছে: An educational institution is not a factory establishment, agaitations must not be at the cost of instruction time। কিন্তু আরও অনেক কথাই বলেনি। খুচরো ছুটির সমস্যা সমাধানে তাদের প্রস্তাব দায়সারা গোছের।

গ্রীষ্মাবকাশ বাতিল করলেও যে কলেজগুলিতে কাজের দিন বাড়বে না তা পরীক্ষা নির্ঘন্ট থেকে স্পষ্ট। কমিশনও তা স্বীকার করেছে। বাকি রইল পূজাবকাশ। বাঙালির প্রিয় উৎসবের মাসে পড়ুয়াদের মনও চঞ্চল হয়। যুক্তি নয়, আবেগ এখানে বড় বাধা। তবু, কঠোর যুক্তিবাদীরা চাপ দিলে, এ ছুটির কিছুটা কমানো যেতে পারে। অন্য খুচরো ছুটি কমানোর আগে তা করা যাবে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, নানা উৎসব ও উৎপাতের ফাঁকে অনিয়মিত কয়েকটা দিন কলেজের দরজা খোলা রাখা নিরর্থক। নিরবচ্ছিন্নতা পঠন-পাঠনের এক আবশ্যিক শর্ত। পরীক্ষার সময়ও কলেজে কলেজে অনার্স ক্লাস চালু রাখার একটা চেষ্টা হয় ফি-বছর, কিন্তু সে চেষ্টায় তেমন সুফল মেলে না। অবশ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় সিলেবাস শেষ করা তো ভিন্ন কথা। চলতি ব্যবস্থাতেও সিলেবাস শেষ হয়। কমিশনের দেওয়া সংখ্যাতত্ত্বেও এ কথার সমর্থন মেলে (সারণি: ৮.৩৩)।

অবকাশ কালীন ছুটি ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নেবার আগে একবার অবকাশের উদ্দেশ্য বিচার করাও প্রয়োজন। গ্রীষ্মাবকাশে, কোনও এক কালে, ছাত্রের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে শিক্ষকরা পড়াশুনা করতেন, দৌড়োতেন সামার স্কুলে। ছাত্ররা এ সময়টা পড়া মুখস্থ করত, এখনও করে। এখন সামার স্কুলের বদলে এসেছে রিফ্রেশার্স কোর্স। নামে কী যায় আসে, প্রশ্ন হচ্ছে — এ

সবের প্রয়োজন আছে কি নেই? কমিশনের বক্তব্য শোনা যাক:

It is certainly beyond dispute that excellence in teaching can contribute a great deal to preserve academic standards even in an otherwise unfavourable millieu. The quality of teachings depend partly on the knowledge and instruction skills of the teachers and partly on his motivation. Knowledge and skills are capable of improvement through training and Refresher Courses.... All college teachers should join such refresher courses at regular intervals of five years. ... Such courses should be scheduled to coincide, as far as possible, with vacations.

অবকাশকালীন ছুটির গুরুত্ব কমিশনের শিক্ষাবিদ সদস্যদের নজর এড়ায়নি। ছুটির প্রয়োজনের দিকটা তাঁরা তুলে ধরেছেন। আরও বলেছেন যে: If guidelines are suitaly framed..., the loss of instructions time for the students would be minimised and the long run gains would outweigh any temporary losses that might occur.

এই মন্তব্যের পরও অবকাশকালীন ছুটি ছাঁটাই করার সুপারিশ! শিক্ষাজগৎ থেকে দূরে বাস করেন যে বিশেষজ্ঞ দল, যাঁদের চোখে শিক্ষকদের মোটিভেশনের অভাবটা অনুপাতের চেয়ে ঢের বেশি বলে প্রতিভাত হয় তাঁরা এমন সুপারিশ করতে পারেন। তাঁদের প্রভাবই কী এই সুপারিশের পেছনে কাজ করেছে?

ইদানিং গ্রীষ্মাবকাশে শিক্ষকরা পড়ার টেবিল আর পরীক্ষার হলের মধ্যে ভাগ হয়ে ধর্মের নয় জিরাফেও নয় এমন বিচিত্র দশাপ্রাপ্ত হয়েছেন সন্দেহ নেই। উপযুক্ত গাইডলাইন তৈরি হলে শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে গ্রীষ্মাবকাশ এ কথা ভুললে চলবে না। তাই গ্রীষ্মাবকাশ ছাঁটাই করার ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করা যায় না।

কলেজে কাজের দিন বাড়ানোর জন্য আরও একটি সুপারিশ রেখেছে মিত্র কমিশন। ঐ সুপারিশটি আলোচনার আগে পরীক্ষাজাল এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে আরও কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে।

কমিশনের দেওয়া একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৬–৭৭ থেকে ১৯৯১–৯২ এই পনের বছরে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে ৩৭০ শতাংশ আর ডিগ্রি স্তরে বৃদ্ধি পায় ৫০ শতাংশ। ঐ সময়ে উঃ মাঃ স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে ৭৯ (বৃদ্ধি প্রায় ১২৬ শতাংশ), কলেজের সংখ্যা বেড়েছে ৯০ (বৃদ্ধি ৪০ শতাংশ)। স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি কোনও পরিকল্পনা মাফিক, অঞ্চল ভিত্তিক সাম্যের প্রয়োজনে এমন নয়। আড়াইশ বা তার চেয়েও কম ছাত্র সংখ্যা শতকরা দশ ভাগ কলেজে (স্কুলের হিসেব জানা নেই)। পনের বছরে যে বিপুল ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি তার সঙ্গে শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা করলে প্রশ্ন জাগে — ঐ ছাত্ররা কোন শিক্ষাপ্রাঙ্গনে আশ্রয় পেয়েছিল? আরও বেশি ছাত্রভর্তির দাবিতে ভর্তির মরশুমে কেন কলেজ চত্বরে ঝড় ওঠে তার কারণ ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই নিশ্চয়।

কোনও কোনও শিক্ষায়তনে চাপ বেশি থাকে তার একটা কারণ ছাত্র ও অভিভাবক শ্রেণীর মানসিকতা, ভালো স্কুল বা কলেজে পড়ার অতি আগ্রহ। শিক্ষায়তনগুলি নিয়মিত আসনসংখ্যার সীমা লঙ্ঘন করে চলেছে, করতে বাধ্য হচ্ছে, সেদিকে সংসদ বা বিশ্ববিদ্যালয় কারও নজর নেই। এদিকে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের ভার বহন করার পরিকাঠামো না থাকায়, প্রয়োজনীয় সংস্কার অর্থাভাবে অসম্ভব হয়ে ওঠায় শিক্ষায়তনগুলি দুস্থ বা রুগ্ন হয়ে পড়েছে। অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে এই বিপুল ছাত্রবাহিনীর পরীক্ষা নেওয়া। ১৯৭৮-এ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৮,০০০; এ বছর সংখ্যা তিন লক্ষ ছাড়াবে। পরীক্ষা ব্যবস্থার কোনও সংস্কার আদৌ ফলপ্রসূ হবে না যদি এই হারে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে চলে। উচ্চ শিক্ষার জন্যতে অবাধ প্রবেশাধিকার অবাঞ্ছিত। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করলেই হবে না, ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। এ কাজের দায়িত্ব সরকারের। বাঁধের জল ছেড়ে বন্যাত্রাণে চিড়ে মুড়ি বিতরণ করার মতো জনচিত্তজয়ী ফর্মুলা শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্যের অন্যতম প্রধান কারণ। এর একটা প্রমাণ মেলে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দের দিকে তাকালে। কমিশনের দেওয়া হিসেব থেকে জানা যায় যে, ১৯৭৬ থেকে '৯১ এই পনের বছরে উচ্চশিক্ষাখাতে বরাদ্দ ১৭.৩৩ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১৪.৩৩ শতাংশ। বরাদ্দের আশি শতাংশ বা তারও বেশি ব্যয় হয় বেতন বাবদ। এরপর তো 'হাতে রইল পেন্সিল' দশা। দুঃখের কথা বর্তমান সরকারের কোনও স্পষ্ট পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষানীতি নেই, সবটাই যেন ad hocism। সুদূরপ্রসারী চিন্তা থাকলে, আন্তরিকতা থাকলে তবেই কোনও জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ভবতোষ দত্ত বলেছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রম কলেজ থেকে সরিয়ে দিতে হবে, ঐ কোর্স পড়ানোর জন্য খুলতে হবে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। মিত্র কমিশনও স্বীকার করেছে যে — If the standard of Higher Secondary teaching is to be raised there is little choice but to remove it from the college system where it does not belong at all, কিন্তু মিত্র কমিশন ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রস্তাব নাকচ করে

স্কুলগুলিই ঐ শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত এই মত প্রকাশ করেছে। সে যাহোক, কলেজগুলি থেকে উচ্চমাধ্যমিকের চাপ সরিয়ে নিলে অন্তত কলেজগুলির পরিবেশ বদলে যাবে, উচ্চশিক্ষার অনুকূল আবহ সৃষ্টি হবে। কিন্তু স্কুলগুলির যে এর ফলে বেহাল অবস্থা হবে, তা বলা বাহুল্য। সে সমস্যা বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, এই পরিবর্তন সাধনে চাই প্রচুর অর্থ, অর্থের ব্যবস্থা না হলে অনর্থ ঘটবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থা সংশোধনে কমিশনের একটি সুপারিশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমিশনের সুপারিশ: A council for under-graduate examinations may be set up to conduct examinations for bachelor level degrees।

ঐ সুপারিশ কার্যকর হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের চাপ কমবে এবং সংকট মোচনে তা বিশেষ সহায়ক হবে। কিন্তু তার পূর্ব শর্ত হলো কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের বিদায় ও ডিগ্রি লেভেলে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস। চাকরি না পেলে, ভোকেশনাল কোর্সে ভর্তির সুযোগ না পেলে কলেজে ভিড় জমাতে হবে — এমন অবস্থা সুস্বাস্থের লক্ষণ নয়। কমিশন এ অবস্থাকে সামাজিক ট্রাজেডি আখ্যা দিয়ে বলেছেন: A huge number of students in the state fill up the undergraduate colleges, particularly pass calsses, simply because they have nothing else to do। হায়! আমাদের এ লজ্জা কোথায় লুকোব? কিন্তু ভার না কমালে জাহাজ ডুববেই, তাই নির্মম না হয়ে উপায় নেই।

ডিগ্রিস্তরবের পরীক্ষা যে দীর্ঘদিন ধরে চলে তার অন্যতম কারণ পাস পরীক্ষা। কত যে বিষয়! আর, কম্বিনেশনের বিধিনিষেধ নেই বললেই চলে। কমিশন প্রস্তাবিত কাঙ্গিলের প্রথম কাজ হওয়া উচিৎ কম্বিনেশনে কিছু শর্ত আরোপ। তাদের হাতে থাকবে পাস পরীক্ষার দায়িত্ব। গোড়াতেই এ দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া ভালো। বাছাই কিছু কলেজের নেতৃত্বে গঠিত হবে ছোট ছোট গ্রুপ। সেই গ্রুপ অনধিক হাজার ছাত্রের পাস পরীক্ষার সব দায়িত্ব নেবে। কাউন্সিলের কাজ হবে সমন্বয়সাধনের। একথা সত্য যে বহু শিক্ষক পরীক্ষার খাতা দেখতে চান না, যাঁরা দেখেন তাঁদের অনেকে যথেষ্ট যত্ন নিয়ে খাতা দেখেন না। কেন এমন হয় সে কথা থাক। ছোট ছোট গ্রুপ বা ক্লাস্টার তৈরি হলে, বর্তমান নিবন্ধকারের আশা, টিম এফেকটও বা দলগত প্রচেষ্টা প্রায় সকলকেই কাজে নামতে সাহায্য করবে। কাজের মানও ভালো হবে।

কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব অত্যন্ত সময়োপযোগী। এ প্রস্তাব রূপায়ণে যত দেরি হবে ততই বাড়বে অন্ধকার, কাউন্সিলও কোনও আলো ঘ্বালাতে ব্যর্থ হবে।

কমিশনের আর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে: A committee may examine the feasibility of concentrating the major examinations during vacation periods।

এ প্রস্তাবটি অর্থহীন। কমিটি হয়েছে কি না জানা নেই কিন্তু সংসদ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাসূচি এখন এভাবেই তৈরি হয়। এ বছরের পরীক্ষাসূচির দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে। তাছাড়া, শিক্ষকরা রিফ্রেশার্স কোর্স আর পরীক্ষায় নজরদারি দুটো কাজ একই সঙ্গে তো করতে পারে না।

সংসদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিস্তরবের পরীক্ষা নিতে এখন সময় লাগে চারমাস। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। যাদবপুর ও বিশ্বভারতী ছাড়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কাউন্সিলের আওতায় আনার প্রস্তাব। আর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে ষাট দিনের মধ্যে পরীক্ষাপর্ব শেষ করতে হবে। পরীক্ষার বিষয় ও পরীক্ষার্থী সংখ্যা যা তাতে ষাট দিনে পরীক্ষাপর্ব শেষ করার নানা অসুবিধে আছে। পরিবহন, জল, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য ব্যবস্থার যা হাল তাতে ভয় হয় যে পরীক্ষার্থীদের বাড়ী থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানো এবং পরীক্ষা শেষে প্রতিদিন বাড়ী ফেরা নির্বিঘ্নে হবে না। সামান্য বিচ্যুতির জটিল প্রতিক্রিয়ায় সব কিছু বানচাল হয়ে যেতে পারে। আরও সমস্যা আছে। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেবার উপযুক্ত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষাকেন্দ্রই বা কোথায় পাওয়া যাবে? রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষায়তনই পরীক্ষা কেন্দ্র হবার উপযুক্ত এমন নয়। পরীক্ষাকেন্দ্র বাড়াতে হবে এবং রাজ্যের সব অঞ্চলে পরীক্ষা কেন্দ্রের সুষম বণ্টন চাই। পরীক্ষা কেন্দ্র পরীক্ষার্থীর বাড়ি থেকে খুব দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এখনই তাই আরও কিছু শিক্ষায়তনকে পরীক্ষা কেন্দ্রের উপযুক্ত করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে হবে। এছাড়াও, রাজ্যে অনেক পাবলিক হল আছে যার উপযুক্ত ব্যবহার, দিনের বেলায় অন্তত, হয় না। জেলায় জেলায় রবীন্দ্রভবন, যুবকেন্দ্র, কলকাতায় মহাজাতি সদন, দীনবন্ধু মঞ্চ ইত্যাদি পরীক্ষাকেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা হয়তো অসম্ভব নয়। কিছু সংস্কার, রদবদলের প্রয়োজন হবে, কিছু অর্থ ঢালতে হবে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই বিনিয়োগে পরীক্ষা সংস্কারের পথ সুগম হবে। পরীক্ষা শুধু সংসদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, প্রায় সারা বছর কলকাতা ও রাজ্যের আরও কয়েকটি বড় শহরের কিছু শিক্ষায়তন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, স্টাফ সিলেকশান বোর্ড, রেলওয়ে ইত্যাদি নানা সংস্থার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। ফি-বছর ভোট (ভোটও কত রকমের!), বন্যাত্রাণ-শিবির, সভা-সমাবেশ, লোক-আদালত ইত্যাদি নানা কাজে বা অজুহাতে কর্তাব্যক্তিরা সবার আগে কলেজ বিল্ডিং দখলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। একবার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গ সফর কালে, নিরাপত্তা

বাহিনীর থাকার সুবন্দোবস্ত করতে একটি সরকারি কলেজ কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সমস্ত কাজে পাবলিক হল গুলির আরও বেশি ব্যবহার সম্ভব। তাতে সব পক্ষের মঙ্গল। কলেজ কর্তৃপক্ষও চায় নানা কাজে তাদের বাড়ী ও লোকজন ভাড়া খাটুক। নানা শিক্ষায়তনে এখন ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে কমপিউটার সেন্টার, WBCS/IAS কোচিং সেন্টার ইত্যাদি। একটি কলেজ নাকি গল্প লেখার কৌশল শেখানোর ক্লাসও চালু করছে বা করেছে। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য কিছু খুচরো লাভ। তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চরম অর্থসংকটে ঢুঁকছে। কমিশনের পরামর্শ: Over the period of next five years, the proportion of the overall financial allocation for emoluments be brought down to ...55 per cent in the case of higher education, so that the rest of the outlay could contribute directly toward improving basic facilities। শিক্ষাসংকট মোচনে সরকার আন্তরিক হলে এ পরামর্শ গ্রহণ না করে সে এগোতে পারবে না। পরীক্ষা সংস্কারের যে কোন উদ্যোগ সফল করতেও কিছু বিনিয়োগ করতেই হবে।

সবচেয়ে জরুরি হলো ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরীক্ষা সমস্যার সমাধান করা। সে পথে কিছুটা এগোতে পারলেই কাজের দিন অনেকটা বাড়বে। কিন্তু তা যদি যথেষ্ট না হয় তা হলে অন্য ব্যবস্থাও নিতে হবে। অবকাশকালীন ছুটি ছাঁটাই করে লাভ হবে না বিশেষ, করা যাবে না, কারণগুলি আগেই আলোচনা করেছি। কমিশনের অন্য একটি প্রস্তাব এবার আলোচনা করি। কমিনের ভাষায়: Teachers may be requested to forgo the customary "off day", they should be present at their respective institutions on all working days. Tutorial sessions may be arranged by teachers on the day they previously used to absent themselves।

রবিবার ছাড়াও কলেজে সপ্তাহে এক বা কখনও একাধিক দিন শিক্ষকদের কোনও ক্লাস দেওয়া হয় না। সেদিনটা হলো "অফ ডে'। এটি এক অতি প্রাচীন রীতি। কমিশন উল্লেখ করেছে—The ostensible purpose of an off day is to enable the teachers to utilize the day for research or consultations in the library or other preparetory work to enhance the quality of teaching।

শিক্ষক কলেজে উপস্থিত আছেন জানলে ছাত্ররা জরুরি পরামর্শের জন্য সেদিনের কোনও একটা সময় তাঁর কাছে আসতে পারে। "অফ ডে" কোনও ছুটি নয়, আজ কিন্তু "অফ ডে" একটি সাধারণ ছুটির দিনে পরিণত হয়েছে। এ ঘটনা দুঃখের, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক। অধিকাংশ অধ্যক্ষ (প্রায় ৭৯ শতাংশ) কমিশনকে জানিয়েছে যে কলেজ লাইব্রেরির হাল সাধারণ (average) বা খারাপ। আমরা জানি বহু কলেজ লাইব্রেরিতে বসে পড়ার জায়গা নেই। ল্যাবরেটরির হালও তথৈবচ। শিক্ষক তাঁর পরিকল্পনা মতো অধ্যয়ন বা গবেষণা কর্ম করবেন সে সুযোগ কৈ? বসার জন্য ঘর নেই (একটা কিউবিক্‌ল হলেও চলত) অধিকাংশ শিক্ষকের। শিক্ষকদের বসার একমাত্র জায়গা স্টাফ রুম। সেখানে পরনিন্দা-পরচর্চা সম্ভব, বিদ্যাচর্চা প্রায় অসম্ভব। "অফ ডে" উঠে গেলে ধরে বেঁধে আনা শিক্ষকদের উপস্থিতিতে স্টাফ রুম হয়ে উঠবে বাজার। কর্মহীন উদ্দেশ্যহীন মানুষের জটলা Counter-prodictive হতে বাধ্য। ক্লাসে পড়িয়ে আসার ফাঁকে শিক্ষকদের যে সামান্য বিশ্রামের প্রয়োজন তা অস্বীকার করা যায় না। অফ-ডের দিন শিক্ষক টিউটোরিয়াল ক্লাস নেবেন তার সুযোগ নেই অধিকাংশ কলেজে। কারণ—তীব্র স্থানাভাব। টিউটোরিয়াল ক্লাস তো দূরের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় ও সংসদ নির্দেশিত ন্যূনতম সংখ্যক ক্লাস নেবারও সুযোগ নেই বহু কলেজে।

এই সব যুক্তি ও তথ্য সামনে রেখেও বলতে দ্বিধা নেই যে শিক্ষার উন্নতিবিধানে 'অফ-ডে'র দিনও কলেজে শিক্ষকের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। এজন্য শুধু নির্দেশ বা ফরমান জারি করলেই হবে না। তাতে কাজও হবে না। আগে চাই লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির উন্নতি, স্থানাভাব অন্তত কিছুটা দূর করা। চাই সেই পরিবেশ গড়ে তোলা যেখানে ছাত্র শিক্ষকের উপস্থিতিতে উপকৃত হবে, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি শিক্ষকের সহায়ক হবে। এখনই, কোথাও যদি দেখা যায়, ক্লাসরুমে শিক্ষক নেই বলে ছাত্ররা ক্লাসের বাইরে, "অফ-ডে" সেখানে বাতিল করা হোক।

কয়েক বছর আগে খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হলো, অথচ তার জন্য মঞ্জুর হলো মাত্র চারটি আংশিক সময়ের শিক্ষক পদ। ছেলেখেলা অথবা সস্তা জনপ্রিয়তার ঝোঁক নয় কী? এই ঝোঁকে গত বছর কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে স্নাতক স্তরে ভূগোল বিদ্যা পড়ানো হবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। পাঠানো হলো মাত্র একজন শিক্ষক। তিনি নিশ্চয় নিধিরাম সর্দার নন। এই ঝোঁক সামলাতে হবে। যা আছে এবং যা ভেঙ্গে পড়ার মুখে তাকে বাঁচাতে হবে আগে। সরকার পে-প্যাকেটের দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকদের প্রতি কর্তব্য করেছে কিন্তু শিক্ষায়তনের উন্নতিতে সরকারের চরম অবহেলাই প্রকাশ পেয়েছে। সরকার যদি সতর্ক না হয়, শিক্ষায়তনের পরিকাঠামো উন্নয়নে যত্ন না নেয়, সংস্কারের পথে পা না বাড়ায়—তাহলে পে-প্যাকেট বিপুল অপচয় বলেই গণ্য হবে।

কমিশনের সমীক্ষা থেকে পাওয়া কয়েকটি তথ্য এবার তুলে ধরছি: অধিকাংশ অধ্যক্ষের মত—শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নেন; শিক্ষার মান নিম্নগামী যদিও তার জন্য শিক্ষকদের দোষের ভাগ সবচেয়ে কম।

অধিকাংশ ছাত্রের মত—অধিকাংশ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন; ক্লাসের বাইরেও শিক্ষকদের কাছে সাহায্য মেলে।

তথ্য উল্লেখের বিশেষ কারণ আছে। শিক্ষা সংকটের প্রধান কারণগুলো আড়াল করে, মাঝে মাঝেই, শিক্ষকদের ফাঁকি, লোভ ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই সংকটের মূলে এমন একটা প্রচারের পালে কর্তৃপক্ষ হাওয়া যোগায়। কমিশন বলেছে: The commission has gone to the extent of recommending that, in some cases, apart from imposition of penalty, erring teachers should be exposed and widest publicity be given to the details of their violation of the code of conduct।

এখানে কমিশনের যে ক'টি সুপারিশ ও মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে তার সবই সর্বসম্মত। কমিশনের সদস্যরা সকলেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। শিক্ষকতা এক মহান বৃত্তি তা উল্লেখ করেতে তাঁরা ভোলেননি। তা সত্ত্বেও শিক্ষাসংকটের জন্য দায়ী অন্য কোনও ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এমন কঠোর শাস্তিদানের প্রস্তাব রিপোর্টে কোথাও নেই! অপরাধীদের শাস্তি দিতেই হবে, শাস্তিবিধানের প্রচলিত পদ্ধতির পক্ষপাতহীন প্রয়োগই যথেষ্ট। শিক্ষকদের লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা শুভ হবে কিনা, শিক্ষক সমাজে এর প্রতিক্রিয়া শুভ হবে কিনা সমাজতাত্ত্বিকরা বিচার করুন। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে কমিশনের সংগৃহীত কিছু কিছু তথ্যই তাদের কিছু সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়! কর্তৃপক্ষের হাতে চাবুক তুলে দিতে চায় কমিনন। কিন্তু কমিশন কী বোঝেনি—যে মাটির ওপর কর্তারা দাঁড়িয়ে সেই মাটিটাই ভীষণ কাঁপছে! শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর পক্ষপাতহীন যৌথ উদ্যোগ, আইনের চাবুক নয়। □

চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যায়

'অসমিয়া সাহিত্যে আধুনিকতার ধারা' নিয়ে লিখছেন

সাহিত্য অকাদেমির রিজিওন্যাল সেক্রেটারি শ্রী নির্মলকান্তি ভট্টাচার্য।

প্রথম প্রতিশ্রুতি

শিশিরকুমার দাস

এক

কথক ও আখ্যান

সত্যবতীর গল্প আমার লেখা নয়। এ গল্প বকুলের খাতা থেকে নেওয়া। বকুল বলেছিল "একে গল্প বলতে চাও গল্প, সত্যি বলতে চাও সত্যি।"

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র কথক জানিয়ে দেন যে তিনি এই আখ্যানের রচয়িতা নন, বর্তমান কথকতার পূর্ববর্তী-পাঠ একটি লিখিত পাঠ। সেই লিখিত পাঠটিও লেখিকার সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা নয়। বরং সেই লিখিত পাঠটিও গড়ে উঠেছিল নানা শ্রুতি কথার মধ্য দিয়ে। বকুল যে কাহিনী তার খাতায় লিখেছিল তা তার শোনা কাহিনী। তবে যেমনটি সে শুনেছে তেমনই যে লিখেছিল তা বোধহয় নয়—'স্বপ্ন', 'কল্পনা', 'মমতা' এবং 'শ্রদ্ধা' সেই কাহিনীর পুনর্নির্মাণে সাহায্য করেছিল। কাহিনীর কিছু কথা সে শুনেছে তার মা সুবর্ণলতার কাছে। হয়তো অন্যান্য প্রাচীনাদের কাছেও। আবার যে-কাহিনী সুবর্ণলতা শুনিয়েছে, সে-কাহিনীও সবটা তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত নয়। তার কাহিনীর কিছু অংশও শ্রুত কাহিনী। অর্থাৎ বকুলের খাতা, যা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' আখ্যানের প্রথম লিখিত ভিত্তি, তা সত্যবতীর স্মৃতি এবং সুবর্ণলতার স্মৃতি ও শ্রুতির লিপিবদ্ধ রূপ। এমনকি সত্যবতীর কাহিনীর একটা অংশ শ্রুতি, শুধু স্মৃতি নয়। শ্রুতি তাকে যুক্ত করেছে তার পিতা-পিতামহের জীবন কাহিনীর সঙ্গে। তাই বলা চলে এই কাহিনীটির লিপিবদ্ধ বর্তমান রূপের আগেও একটা গড়ে-ওঠার ইতিহাস আছে। বহুকাল ধরে অবিরাম স্মৃতি ও শ্রুতির মধ্য দিয়ে কাল থেকে কালে কাহিনীটি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সম্ভবত কথক-পরম্পরা তাকে কিছুটা নিজের মতো করে গড়ছে। বর্তমান কথকই তাকে দিচ্ছেন একটি স্থির লিখিত রূপ।

যে-কাহিনীটি ছিল এতদিন পর্যন্ত একটি পরিবারের কালানুক্রমিক কাহিনী, একটি পারিবারিক স্মৃতিকথা, তাকেই বর্তমান কথক প্রথম প্রসারিত করলেন পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে বাইরের পাঠক-পাঠিকার কাছে। ব্যক্তিগত কাহিনী আর ব্যক্তিগত কাহিনী থাকলনা, তা প্রবেশ করল সমাজের ইতিহাসে। এতদিন পর্যন্ত কাহিনীর কথকেরা ছিলেন এক পরিবারভুক্ত—সত্যবতী-সুবর্ণ-বকুল। আরও লক্ষণীয় যে এই কাহিনী বহন করে নিয়ে চলেছেন নারীরা : সত্যবতীর পুত্র সন্তানরা এই কাহিনীর বাহক নয়, বাহিকা কন্যা। সুবর্ণের পুত্ররাও এই কাহিনী সংরক্ষণ করেনি, কন্যা বকুল এই কাহিনীকে ধারণ করে রেখেছিল এবং একটি লিখিত রূপ দেবার চেষ্টা করেছিল। কাজেই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' এমন একটি আখ্যান যা প্রায় এক শতাব্দী ধরে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্য দিয়ে লালিত ও বাহিত হয়েছে এবং কয়েক প্রজন্মের নারী তাকে লালনও বহন করে চলেছেন। এই আখ্যানের আধুনিকতম কথক— তিনিও নারী, তবে তিনি পূর্ববর্তী কথকদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কে যুক্ত নন। এইবার কাহিনীটির পুনর্গঠনে যোগ দিলেন রক্তসম্পর্কহীন এক ব্যক্তি। কিন্তু গভীরতর এক সম্পর্কে তিনি যুক্ত, সে সম্পর্ক নারীত্ব। এই যে প্রজন্মের পর প্রজন্মের নারী-বাহিত নারী-লালিত কাহিনী তা বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ পুরুষ-রচিত এবং পুরুষ সংরক্ষিত কাহিনীধারার থেকে এ বিশেষভাবে স্বতন্ত্র।

কাহিনীর সাম্প্রতিকতম কথক গোড়াতেই ঘোষণা করেছেন—অনেকটা প্রাচীন আখ্যানকারদের মতোই—যে এ গল্প অন্যের 'খাতা' থেকে নেওয়া। আর যার খাতা থেকে নেওয়া তিনিও নিশ্চিতভাবে এর 'সত্যতা' দাবী করেন না, কাল্পনিক বললেও আপত্তি জানাননা। বরং এই আখ্যানের দ্বৈতচরিত্রকে যেন ঘোষণা করতে চান। এ ইতিহাস, কারণ এ এক নির্দিষ্ট কালের নির্দিষ্ট সমাজের বিবরণ। আবার এ

গল্পও, কারণ এই চরিত্রগুলির নির্দিষ্ট বাস্তব অস্তিত্ব নেই। একদিকে এই আখ্যান দাবি করছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত কাহিনীর চরিত্র। অন্যদিকে তিন কিংবা চার কথক পরম্পরার (যাদের তিনজন পারিবারিক সম্পর্কে যুক্ত) মধ্য দিয়ে এই কাহিনী ক্রমায়ত্ব অর্জন করছে নতুন নতুন তাৎপর্য। প্রথম তিন কথক পরম্পরার মধ্যেও পার্থক্য আছে— পার্থক্য তাদের সামাজিক অবস্থানের, কিন্তু তাঁদের সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্যের ফলে কাহিনী কী কী নতুন তাৎপর্য অর্জন করেছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, তা আমরা আজ স্পষ্ট করে বলতে পারবনা, সেই ইতিহাস লুপ্ত। কিন্তু প্রথম তিন কথকের সঙ্গে আধুনিকতম কথকের মৌলিক পার্থক্য হলো ব্যক্তিগত কাহিনীকে একটি সামাজিক কাহিনীতে পরিবর্তিত করা। শ্রুতিকথা— লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত কাহিনী যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তিনটি স্পষ্ট স্তর। তেমনই এই কাহিনীর কথকতার মধ্যেও আছে কয়েক প্রজন্মের চিন্তা-ভাবনার নানাস্তরের নানা চিহ্ন।

এই কাহিনীতে আছে নিঃসন্দেহে এক 'অ-সাধারণ' নারীর কথা। আর এই কাহিনীর শেষ পারিবারিক কথক (অর্থাৎ বকুল) নিজেকে মনে করেন "সাধারণ", অর্থাৎ "যাদের নিয়ে গল্প লিখতে গেলে কিছুই থাকে না।" কথাটা বিনয় হতে পারে, কিন্তু সাম্প্রতিক কথকও তার সম্বন্ধে কোন অসাধারণত্বের দাবি করেন না। অবশ্যই তিনি মনে করেন, "বকুল, তোমাকে নিয়ে গল্প লেখা যায়", কারণ তিনি বোঝেন যে সত্যবতীর গল্প একজনের গল্প নয়। অনেকের গল্প, বকুল এবং 'বকুল-পাকুলদের' যে বৃহৎ গোষ্ঠী তাদের গল্প। জীবনের অসাধারণত্বই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় ইতিহাসে। সাধারণ-অসাধারণে গাঁথা ঘটনাপুঞ্জে ইতিহাস তৈরি। এই ইতিহাসকে খুঁজছেন সাম্প্রতিকতম কথক—পূর্ববর্তী পুরুষের ইতিহাস নয়—পূর্ববর্তিনীদের ইতিহাস : "মা দিদিমা পিতামহী আর প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস।"

পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহদের ইতিহাস আমরা অনেকটা জানি। এই কথক সচেতনভাবেই আরেকটা ইতিহাস সন্ধান করছেন। এবং বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন সেই ইতিহাসের একটি প্রকৃতির ওপর— তা হলো "সংগ্রাম"। এই যে ইতিহাস তা একটি বিশেষ কালখণ্ডে আবদ্ধ নয়। শেষ নয়, তা চলমান। তা একটা সংগ্রাম, যেখানে প্রত্যেক নারীরই একটা ভূমিকা আছে। সেইজন্যই এই ইতিহাস তার কাছে শুধু অতীতের প্রতি কৌতূহল মাত্র নয়, এই প্রাচীন তাঁর অস্তিত্বের একটা অংশ। এই সংগ্রাম চলমান, তার পথ এখনও স্পষ্ট নয়, সেই পথের পথিকদের অবয়বও স্পষ্ট নয়। কিন্তু এই অতীতের কথা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়ানো। 'সে পথ কে কাটবে কে জানে? সে রথ কারা চালাবে কে জানে?' কিন্তু কথকের মনে কোন সংশয় নেই যে সে-পথ কাটতে হবে। সেই পথ দিয়ে রথ চলবে একদিন। একটা অনাগত ভবিষ্যতের আশা এই কথককে এই প্রথম এক বৃহৎ প্রকাশ্য জনগোষ্ঠীর সামনে এতদিনের স্মৃতি শ্রুতি বাহিত আখ্যানকে উপস্থিত করতে উৎসাহিত করছে। এই জনগোষ্ঠীতে আজ শুধু নারী নেই, নেই শুধুই সমবয়ী পাঠক-পাঠিকা, থাকতে পারে বিরূপ, প্রতিবাদী পাঠকও।

আগেই বলেছি এই আখ্যানের গড়ে-ওঠার একটা ইতিহাস আছে, যে-ইতিহাস আমরা পুরোটা জানিনা। নতুন কথক যখন এই আখ্যান বলেন, তখনও তিনি একটা স্বাধু কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেন না, তিনি চেষ্টা করেন একই সঙ্গে অতীত-পাঠকে সংরক্ষিত করতে আবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করতে। অতীতের আখ্যানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাকে তিনি একটা কর্তব্য মনে করেন, আবার অতীত আখ্যানের বর্ণনার মধ্যে একটা প্রতিবাদী সুরও সৃষ্টি হয়। হয়তো পূর্ববর্তী কথকদের কণ্ঠস্বরের অসহায়তাকে কিছুটা শক্তিদীপ্ত করতে চান। অর্থাৎ তাঁদের কথায় লাগে আমাদের কালের জিজ্ঞাসা। সাম্প্রতিককাল নারী জিজ্ঞাসার উৎস হিসেবে দেখা দেয় তারা, আমাদের সন্দেহাতুর কিংবা অ-সহানুভূতিশীল তর্ক প্রবৃত্তির উত্তরে তিনি বলে ওঠেন, এই প্রথম প্রতিশ্রুতি।

সাম্প্রতিকতম কথক কথক-পরম্পরার একটি যন্ত্র। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে একটি ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির পর ব্যক্তি, প্রজন্মের পর প্রজন্ম কথা বলছে। যেভাবে প্রাচীন পুরাণকাররা কথা বলেন। পূর্বকথাকে সঞ্চারিত করেন, এই যন্ত্রও সেই একই কাজ করে। কথক স্বয়ং স্মৃতি, শ্রুতির আধার, অতএব সর্বজ্ঞও বটে। আবার এই কথক শুধু একটা পরম্পরাগত ইতিহাসই বলেননা, বিপরীতভাবে একটা ইতিহাস রচনাও করতে চান, যে ইতিহাসকে আমাদের সমাজের শক্তি নীরব করে রেখেছে। এই গল্পটার শক্তি এইখানে : এই গল্প শোনার পর মানুষের ইতিহাসটা লিখতে হবে নতুন করে। এই কথকের মধ্যে আছে দ্বৈত চরিত্র : তিনি বলছেন একটা পুরোনো গল্প, আবার তিনি তৈরি করতে চাইছেন একটা নূতন গল্প।

দুই

আখ্যানের কালখণ্ড

এই আখ্যানের কালখণ্ড মূলত একজন নারীর বাল্য থেকে প্রৌঢ়ত্ব। যে-বালিকাটিকে আমরা কাহিনীর সূচনায় উপস্থিত হতে দেখি সে বিবাহিতা। এই বিবাহ সমাজ শাসিত। পরিবারের মধ্যে অনুষ্ঠিত, তার সকল আত্মীয়পরিজনের দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু নিজে সে এই বিবাহের সঙ্গে জ্ঞানত জড়িত নয়, তার

প্রয়োজনও পরিণতির কথা ভাবার অধিকারীও নয়। অথচ সেই ঘটনা বা অনুষ্ঠান তার সমগ্র জীবনের নির্ধারক। অর্থাৎ এমন একটি কালে এবং সমাজে এই নারীর জন্ম যেখানে ব্যক্তির জীবন চালনার নিজস্ব অধিকার নেই বললেই চলে। স্বাভাবিকভাবেই সকলে এই সামাজিক প্রথার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। এর থেকেই অবশ্য আমাদের মনে করার কারণ নেই যে কাহিনীটি অবশ্যই অতি প্রচিন কালের কথা। এমন নয় যে আমরা যে-কালে বাস করি সেখানে বিবাহ-প্রথার মৌলিক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

কাহিনীর কালখণ্ডের অন্তিমে দেখা যাবে যে প্রথা ও শাস্ত্রের আনুগত্যের বিরুদ্ধে যদি কেউ প্রতিবাদ করতে চায় তাকে সমাজ শুধু তাড়না করেনা, তাকে সম্পূর্ণভাবে দলিত করতে চায়। কাহিনীর গোড়ায় একটি বিবাহ, কাহিনীর শেষেও একটি বিবাহ। যেন এক বিবাহ থেকে আর এক বিবাহ, এই কাহিনীর কালভূমি। কাল বলতে আমি ঐতিহাসিক কালবিভাগের পরিচিত রীতিই শুধু বলতে চাইছিনা। বলতে চাই এই আখ্যানের অন্তর্গত মানবমানবীর জীবনের পরিবর্তনের কথা। পরে আমরা দেখতে পাব বিবাহ এই আখ্যানের মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় রূপক। এক বিবাহ থেকে আর এক বিবাহ এই আখ্যানের দুটি প্রান্তিক কাল ফলক।

এই দুটি বিবাহ ছাড়াও আখ্যানে আরও দুটি বিবাহ প্রসঙ্গ আছে। যুদ্ধ, শান্তি, রাজ্যজয়, মন্দির প্রতিষ্ঠা, বীরত্ব, হত্যা ইত্যাদি ঘটনার দ্বারা আমরা আমাদের পরিচিত ইতিহাসে কাল চিহ্নিত করে থাকি। সেই ইতিহাস পুরুষের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। সেখানে রাজাজয়, নগর লুণ্ঠন, ধর্মস্থান ধ্বংস, রাজার মৃত্যু, ষড়যন্ত্র, সিংহাসনে আরোহন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখানে, এই আখ্যানে যে "নীরব", যে "সাধারণ", যে "দীর্ঘ" ইতিহাস — নরীজীবনের সেই ইতিহাসের প্রধান ঘটনা বিবাহ। এই আখ্যানের বালিকাটি আমাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই বিবাহিত। বিবাহ ছাড়া কোন নারীর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এই ইতিহাসে। তাই বিবাহকে এই আখ্যানের কালখণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলক হিসেবে গ্রহণ করলাম। সেই গুরুত্ব বোঝার আগে আখ্যানের স্থানখণ্ডটিকে চেনা দরকার।

তিন

আখ্যানের ভূগোল

এই আখ্যানের ভূগোল দুটি জগতে বিভক্ত : গ্রাম ও শহর। এই গ্রাম জগতের ভৌগোলিক বাস্তবিকতা, বা নির্দিষ্ট স্থানিকতা, সম্ভবত খুব স্পষ্ট নয়। কারণ কথক যেন সমগ্র বাংলাদেশের গ্রাম-ভূগোলের একটা একীকরণ করেছেন এখানে। প্রাকৃতিক দিক থেকে এই গ্রাম জগতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ থাকাই সম্ভব। বারুইপুর ও নিত্যানন্দপুরের প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্যও থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কথক এই গ্রাম ভূগোলের মধ্যে ভিন্নতার অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তিত নন। সত্যবতী যখন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যায় সে কি লক্ষ করেনা তাদের প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য? করাই সম্ভব, কিন্তু কথক প্রথাশাসিত, ধর্মের ভণ্ডামি শাসিত, প্রায় সম্পূর্ণ মানবিকতাহীন গ্রাম সমাজকে এক বিবেচনাহীন, হৃদয়হীনতার প্রসার হিসেবেই দেখেন। বাঙালি গ্রামজীবনের যে-রূপ আমাদের কথা ও কবিতায় বিঘোষিত তার সামান্যতম আভাস এ-আখ্যানে নেই। আজও পর্যন্ত বাঙালি কবিত্বের যে প্রধান উৎস গ্রাম্য-প্রকৃতি, বাঙালি রোমান্টিকতার অমোঘ আশ্রয় তার কোন স্থান নেই এই আখ্যানে। আচার, অনুষ্ঠান, ব্রত-পার্বনের উল্লেখ আছে। কিন্তু তার বন্দনা নেই। এক মুহূর্তের জন্য দেব-দেবীর পূজা উপলক্ষে কথক-কণ্ঠ ভক্তি বিহ্বল হয়না, ঋতু-বৈচিত্র্যের ফলে কোন নারী-পুরুষের চিত্ত উদাস হয়না। সমস্ত জীবন এখানে বাঁধা আছে আচার-অনাচারের শৃঙ্খলে, শাস্ত্রের দোহাই এবং শাস্ত্রানুমোদিত চাকুরিতে। এখানে নদী নেই, আকাশ নেই, জল নেই, মুক্ত প্রান্তর নেই, কৌতুক হাসি উচ্ছ্বাস, ধর্ম-বিমুক্ত আনন্দ নেই। আখ্যানে একবার মাত্র শরৎঋতুর বর্ণনায় আছে "বসেছে কাব্য পাঠের আসর"। প্রকৃতিতে "কাব্যপাঠে"র কথা উল্লেখ করেই কথক তুলেছেন দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ। কিন্তু কাব্যিক মণ্ডনের জন্য নয় এই উৎসব প্রসঙ্গ : দুর্গাপূজার সঙ্গে জড়িত বিবাহিতা বাঙালি নারীর গৃহ প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি উদযাপনই তার প্রধান লক্ষ্য। আগমনী-বিজয়া গান যে সামাজিক আখ্যানের অন্তর্গত, সেই আখ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে-যাওয়া এই শরৎ ঋতু। এক কথায় কথক তৈরি করেন আমাদের বহু বন্দিত কাব্যময় গ্রামজীবনের একটা প্রতিবাদী ভূগোল।

অনুযোগ করা সম্ভব যে এই ভূগোল খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। কিন্তু কথক এমন ভঙ্গিতে উপস্থিত করেন এই ভূগোল যেখানে প্রকৃতির মধুর, স্নিগ্ধ রূপের "অনুপস্থিতি" যেন একটা আখ্যান বর্ণনার কৌশল। এখানে যেমন নেই প্রকৃতির কাব্যিক উপস্থিতি। তেমনই মানুষের বৃত্তির কোন ছবি। রামকালী বৈদ্য ছাড়া পুরুষের কোন কাজ নেই, আর রামকালী এখানকার পুরুষ সমাজ থেকে স্বতন্ত্র। এক অর্থে সে বহিরাগত। কর্মহীন, নিশ্চেষ্ট পুরুষগুলি এই গ্রামখণ্ডের অধিবাসী জন্তু। নারীর কর্মজীবনের কথা অনেক বেশি সন্দেহ নেই — রান্না, পরিবেশন, সন্তান পালন, স্বামী সহবাস, ঘর গোছানো, কাপড় সেলাই, বিছানা পাতা, কুটনো কোটা, ঘর লেপা, গোরু সেবা, জল-আনা, ঢেঁকির কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কথক যেন এই কর্মজীবনের বিবরণেও তেমন উৎসাহী নন। এমনকি অন্তঃপুরের কর্মশালার বর্ণনার 'thickness' ও আখ্যানে তেমন প্রাধান্য পায়না। এ কি নিতান্ত আকস্মিক, না আখ্যান পরিকল্পনার অন্তর্গত?

একদিকে গ্রাম যেন বৈচিত্র্যহীন, রুদ্ধশক্তি জীবনের প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে এই আখ্যানের ভূগোলের অপর অংশ—শহর—একটি বিপরীত জীবনের প্রতিমূর্তি। এই দুই স্থানখণ্ডের উপস্থাপন তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রতীকী। এই আখ্যানের অন্তর্গত নরনারীদের মধ্যে যারাই এই গ্রামের বাইরে যায়নি তারা এক হৃদয়হীন সমাজব্যবস্থার জালে পশুর মতো জড়িয়ে আছে। আর যারাই কোন-না-কোন ভাবে এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে কিছুটাও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পেরেছে তারা এই গ্রাম-ভূগোলের বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত। রামকালী এই আখ্যানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরুষ : তার জীবনের প্রথম অধ্যায়, শিক্ষা-দীক্ষা সব এই গ্রামের বাইরে, একটা জনপদে। আর একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ ভবতোষ মাস্টার। অন্যজন নেড়ু — "সত্যের চোখে এক মহান নাটকের মহিমান্বিত নায়ক"। এরাও কেউ এই গ্রাম জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত নয়। তারা শহরের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছে বলেই গ্রাম ভূগোলের গ্রাম্যতা থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছে।

অবশ্যই এই যে শহর আখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানখণ্ড তার বিবরণে কথক ভাবাতুর নন। কলকাতা শহরের নীচতা, তার অর্থনির্ভর সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতি ধিক্কার আছে। তার মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য, তার বিভিন্ন আন্দোলন, তার যে বিপুল চিন্তা-ভাবনার স্পন্দমানতা তার পরিচয়ে কথক উৎসাহী নন। অথচ কলকাতা যে মানুষের জীবনের প্রসারের নিঃসংশয় সিংহদ্বার সে-ব্যাপারে কথকের কোন দ্বিধা নেই।

"...যুগের দেবতা একটু শহর ঘেঁষা। শহর দ্রুতছন্দে আবর্তিত হয় গ্রাম ছায়াচ্ছন্ন উঠোনে পড়ে ঘুমোয়। শহরে হাওয়া যখন তার কাছে এসে পৌঁছয়, তখন শহর সে হাওয়াকে ত্যাগ করে আর এক নতুন হাওয়ার পিছনে ছুটছে।"

"কিন্তু শহর আর মফঃস্বল কি কেবলমাত্র মানচিত্র বর্গমাইলের ওপর নির্ভরশীল? একই ঘরের মধ্যে বাসা করে নাকি শহর আর মফঃস্বল? জাগ্রত আর ঘুমন্ত? মানুষ মানুষে মনের গড়নে কি পার্থক্য নেই?"

"তা মনের গড়নেরও শহর মফঃস্বল আছে বৈ কি। নইলে যুগচক্রের আবর্তনে সত্যবতী কেন এমন অধীর হয়, চঞ্চল হয়, আন্দোলিত হয়। আর নবকুমার কেন সে আবর্তন টেরও পায় না?"

চার

বিতর্কের কেন্দ্র

আটচল্লিশ পরিচ্ছেদে গাঁথা এই আখ্যানের শেষ ষোল অধ্যায়ের প্রধান ভূখণ্ড কলকাতা। তবে সেখানেও আখ্যান বারবার গ্রামে ফিরে এসেছে। প্রথম বত্রিশ পরিচ্ছেদের জগৎ একান্ত ভাবেই গ্রাম। এই গ্রামের নরনারী প্রায় সকলেই অশিক্ষিত। প্রায় প্রত্যেক নারীই বাক্‌পটু, অধিকাংশই কলহপ্রিয়া, অন্যের ছিদ্রান্বেষী, আচার ও প্রথাবন্দী; প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দ্বারা তাড়িতা, পীড়িতা এবং শাসিতা। স্নেহ-প্রীতি-মমতার প্রতিমূর্তি রূপে যে বাঙালি নারী আমাদের সাহিত্যে বন্দিতা, এই আখ্যানের নারীগণ যেন তার প্রতিবাদ। স্নেহহীন মমতাহীন বাৎসল্যহীন এক জগৎ এখানে। যারা সেবাপরায়ণা, সংসারচক্রে যারা আত্মদান করেছে তারা মূলত বাধ্য, মূলত আশ্রিতা; কেউ স্বাধীন ইচ্ছায় কোন কাজেই যুক্ত নয়।

এই সমাজে পুরুষ কারা? তারা দুর্বল, নির্বোধ, মেরুদণ্ডহীন, ভীরু, অশ্রদ্ধেয়। তারা যেমন প্রথা শাসিত, তেমনই অর্থলোলুপ। এই গ্রামে রামকালীর প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ তার আর্থিক সংগতি। সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণ চাতুর্য। মেরুদণ্ডহীন পুরুষগুলির মধ্যে এই একজনের ওপর "পুরুষ সুলভ" কিছু গুণ বর্তেছে, এইগুণগুলিকে সম্মুখায়িত করা হয়েছে। পৌরুষের লক্ষণ — অর্থাৎ শারীরিক শক্তি, বিচার ক্ষমতা, সমাজের নিয়মরক্ষায় তৎপরতা, অর্থোপার্জন ক্ষমতা, নারী-পুরুষের জগতের স্পষ্ট পরিচ্ছন্নতায় বিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়, কিঞ্চিৎ চাতুর্য, আবেগ দমনের ক্ষমতা ("স্নেহ প্রেম ভালোবাসা এগুলো ব্যক্ত করার বস্তু নয়") — ইত্যাদি ঐতিহ্যসম্মত পুরুষতান্ত্রিকতার বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে সন্নিবিষ্ট। তাকে সবাই সমীহ করে, তার উপমান বটবৃক্ষ। এই সব প্রথাগত পুরুষ-ধর্মের সঙ্গে তার চিকিৎসকের ভূমিকা তার চরিত্রে একটা অলৌকিকত্বের চিহ্ন বুলিয়ে দেয়। জটার বৌ-এর জ্ঞান ফিরে পাওয়া, পাত্রের কপালে চন্দন রেখা দেখে তার আসন্ন মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী, শঙ্করীর আত্মহত্যার প্রতিরোধ ("দেবতার মূর্তিতে উনি এসে দাঁড়ালেন মৃত্যুর পথ রোধ করে") ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনায় সেই অলৌকিকত্বের আভাস। বিহ্বল বুড়ো ওঝাও তাকে ভেবেছিল অন্তরযামী, "অগ্নিমুখ দেবতা"। এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে আরেকটি পুরুষোচিত গুণও আছে রামকালীর — "মেয়েমানুষ"-এর প্রতি অবহেলা, "সমগ্র মেয়েমানুষ জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রমবোধ, নেই সম্যক মূল্যবোধ।"

আখ্যানের পুরুষ সমাজে এই প্রধান পুরুষ। আর একজন পুরুষ আছে, তার কথায় পরে আসব। নারী সমাজে প্রধান সত্যবতী। সত্যবতী বাকপটু, তর্কপ্রিয়া, বুদ্ধিমতী। তার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিবাদ, জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা তাকে উদ্ধত করে তোলে : পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে অনবরত ধাক্কা লাগে। বিচারহীন, শাস্ত্রানুমোদিত প্রথার আনুগত্যের সঙ্গে স্বাভাবিক বুদ্ধি ও অনুভূতির ধাক্কা, ঠিক তর্ক-বিতর্ক নয়। কারণ এই নারী সমাজে তর্কের সম্ভাবনা নেই। তর্ক সম্ভব

রামকালীর সঙ্গে। সেই তর্কে রামকালীর প্রতিপত্তির বোধ আহত হয়। সত্যবতী ও রামকালী হয়ে ওঠে একটা বিতর্কের প্রতিপক্ষ ও উত্তরপক্ষ।

এই বিতর্কের প্রথম ধাপ রাশুর দ্বিতীয় বিবাহের পর, 'সতীন প্রথা' নিয়ে। এই বিতর্ক স্পষ্টতই নারী ও পুরুষের, পিতৃতান্ত্রিকতার সঙ্গে নারী স্বাতন্ত্র্যের, উচ্চাশাস্ত্রানুমোদিত বহু বিবাহের সঙ্গে স্ত্রী-আচার ও ব্রতপার্বনে বহু-বিবাহ বিরোধিতার। আমাদের স্ত্রী সমাজে প্রচলিত আচার-ব্রত-ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদির একটা নতুন ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই স্ত্রী-আচার গুলি যে ব্রাহ্মণ্য আচারগুলির একটি প্রতিবাদী ধারা তাতে সন্দেহ থাকে না। এদের মধ্যে লুকিয়ে আছে ব্রাহ্মণ্য সমাজের সমান্তরাল আর একটি সাংস্কৃতিক ধারা। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যেমন বহু বিবাহ নিবারণ আন্দোলনের শাস্ত্রীয় ভূমিকা রচনা করতে চাইছিলেন পুরুষ সংস্কারকেরা, বহুদিন ধরেই আমাদের নারী সমাজে তৈরি হচ্ছিল তেমনই আর একটি প্রতিবাদী ধারা, ব্রত, আচার, অনুষ্ঠানের মধ্যে। রামকালী ও সত্যবতীর বিতর্ক এই দুই স্বতন্ত্র ধারার বিতর্ক। তাই শেষ পর্যন্ত রামকালী সত্যবতীকে বহু-বিবাহ নিন্দাকারী স্ত্রী-আচার পালন করতে নিষেধ করে। লোকাচার এবং নারীর সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করতে চায় পিতৃতন্ত্র।

পিতৃতন্ত্র ও নারীর স্বাতন্ত্র্যের বিতর্কে সত্যবতীর ভূমিকা মনে হতেই পারে আরোপিত, আদর্শায়িত। কিন্তু স্বাভাবিকতার প্রশ্ন বোধহয় এখানে গৌণ, মুখ্য হলো কীভাবে কথক সত্যবতীকে রচনা করতে চাইছেন, শুধু একজন ব্যক্তি হিসেবেই নয়, বরং ইতিহাসের একটি প্রতিনিধি হিসেবে। কাহিনীর শুরু থেকেই সত্যবতী, যে বয়সই হোক না কেন তার, প্রাপ্তবয়স্কা এবং প্রতিবাদিনী। আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি সে লিখতে জানে, পড়তে পারে। অথচ এই লেখা-পড়ার জন্য যে-অভ্যাস দরকার, যে-সময় যে সুযোগ দরকার তার কথা যেন কথক তুচ্ছ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে লিখিত রচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য নারীর যে প্রবল পরিশ্রম ও প্রচণ্ড প্রতিরোধের ইতিহাস আমরা জানি তা যেন ভুলে যান কথক। সত্যবতী প্রায় অলৌকিক উপায়ে এই কঠিন বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তার ছড়া বাঁধবার ক্ষমতা ছিল, সে এক স্বাভাবিক প্রতিভা, অভ্যাসজাত লেখা-পড়া নয় ; তা মূলত মৌখিক সংস্কৃতির অঙ্গ, লৈখিক সংস্কৃতির নয়। সত্যবতীর বাংলা লেখা-পড়ার ঘটনা যেমন অবিশ্বাস্যরকম গোপনীয় এবং আকস্মিক, সেই রকমই চমকপ্রদ তার ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাস।

> নবকুমার বলে, 'ইংরিজি পড়েছ তুমি ?'
> 'সামান্য, সামান্য। নিজের চেষ্টায় যা হয়। তোমারই বই দুটোতো ছিল ঘরে।'
> 'তাজ্জব।'

আরও উল্লেখযোগ্য, যে-শিক্ষা তার চরিত্রগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনার সবচেয়ে বড়ো কারণ, তার কোন আনুপূর্বিক বিবরণ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন না কথক। সত্যবতীর ছড়া বাঁধা নিয়ে নিন্দামুখর হয়ে উঠেছিল অন্তঃপুর, তার বিবাহিত জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কাতুর হয়ে উঠেছিল অনেকে। অথচ তার লেখাপড়ার গোপন সাধনা এবং পিতার প্রশ্রয়ে বিদ্যাচর্চা নিয়ে কোন সমস্যা তৈরি হয়নি। যদিও সমকালীন সমাজে নারীর বিদ্যাচর্চা যে একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয় সে-সম্বন্ধে গ্রাম্য সমাজও অজ্ঞ ছিল না।

> কেন, মেয়েমানুষ তাল পাতে হাত দিলে কি হয় ?
> কলকেতায় তো মেয়েমানুষ লেখাপড়া করে ?
> তোকে বলেছে করে। পড়লে চোখ কানা হয়ে যায় তা জানিস।

এই বিতর্ক শুধু সত্যবতী-নেতুর বিতর্ক নয়, সমকালের বাঙালি সমাজের বিতর্ক। আর বিতর্কটা শুধু লেখা-পড়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের সমস্ত কর্মে সঞ্চারিত। একদল যখন নারী ও পুরুষের পরিচিত কর্ম বিভাগের সমর্থন করে ভগবানের দোহাই দিয়ে, অর্থাৎ নারী পুরুষের জৈবিক পার্থক্যটাকে চরমতম যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করে, তখন সত্যবতীর মুখে শোনা যায় আধুনিক নারীবাদীর কণ্ঠস্বর "ভগবান্ কখনো এমন এক চোখো নয়, ওসব বেটা ছেলেরাই ছিষ্টি করেছে।" সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত আইন যে মূলত পুরুষ—একথা আধুনিক নারীবাদীর প্রবলতম অভিযোগ। এই অভিযোগ যখন সত্যবতীর মুখে শুনি, তখন আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠেনা একি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তা ? কারণ সত্যবতী আখ্যানে প্রথম থেকেই প্রাপ্ত বয়স্কারূপেই আবির্ভূতা ; তার আচরণ স্বাভাবিক বালিকার স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, সে ইতিহাসের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা। সে সমাজের অন্য সমস্ত নারী, অন্য সমস্ত পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, অ-সাধারণ।

তাকে কথক অবশ্যই মানবায়িতা করতে চায়, বর্ণনা করতে চায় তার বাল্য-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের ঘটনা প্রবাহ। কিন্তু তার বাল্য কৈশোরের ঘটনাগুলিকে মনে হতে পারে এক ঐতিহাসিক বিগ্রহের বাল্যলীলা। নাকে নোলক, কানের 'সার', মাকড়ি, পায়ে ঝাঁঝর মল, বৃন্দাবনী-ছাপের আট-হাতি শাড়ি পরা আটবছরের সত্যবতী অপ্রতিহত প্রতাপে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়ের দলনেত্রী হয়ে খেলে বেড়ায়— এ হলো এক ভবিষ্যৎ নায়িকার বাল্য কাহিনী। ভবিষ্যৎ এখানে নিয়ন্ত্রণ করছে অতীতকে, বর্তমানের কথক অতীতকে গড়ছেন একটা বিতর্কের ইতিহাস অনুসন্ধানে, মানবায়িত করতে চাইছেন এক আদর্শ প্রতিমাকে।

সত্যবতীর সমস্ত চরিত্র এই আদর্শায়ন ও মানবায়ন প্রচেষ্টার টানা পোড়েন। আখ্যানে প্রথম আবির্ভাবে সে যেমন বালিকা তেমনই বয়স্কা, যেমন মানবী তেমনই ঐতিহাসিক শক্তির প্রতীক। পান্তাভাত দিয়ে মাছ ধরাটা অবশ্যই খেলা, কিন্তু এই খেলাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় আখ্যানের কেন্দ্রীয় বির্তক : নারীপুরুষ, শাস্ত্র শাসন। আট বছরের মেয়ের মুখে শুনি একটা স্বাভাবিক প্রতিবাদ : "মেয়ে মানুষ মাছ ধরে না ? রাঙা খুড়িমারা ধরেনা ? ও বাড়ির পিসিরা ধরেনা ?" আর সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস প্রতিমার মুখ থেকে নির্গত হয় আর একটি প্রশ্ন, "তোমাদের এ সব শাস্তর কে লিখেছে গা ?"

বোধহয় এখন বোঝা যায় আখ্যানে কেন আর কোন প্রতিবাদী পুরুষ নেই, প্রতিবাদিনী নারী নেই। একটা ক্ষয়ে-যাওয়া সমাজ— সেখানে সত্যবতীর লড়াই কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে নয়, তার লড়াই একটা শক্তির সঙ্গে। এই শক্তি শাস্ত্রের শক্তি, প্রথার শক্তি। সে শক্তি মানুষকে করেছে দুর্বল, জিজ্ঞাসাহীন, ভীরু। প্রথম আবির্ভাবেই সত্যবতীর সঙ্গে বর্ষীয়সী দীনতারিণী এবং মোক্ষদার ধাক্কা লেগেছে শাস্ত্র নিয়ে ; আর পরিবারে সবচেয়ে যে শক্তিমান সেই রামকালীর সঙ্গেও তর্ক বেধেছে 'শাস্ত্র' নিয়ে। সত্যবতী বুঝে নিয়েছে শাস্ত্রই একটা অন্ধ শক্তি, সমাজ চলেছে সেই অন্ধ শক্তির আধিপত্য মেনে নিয়ে। আট বছরের মেয়ে জটার বৌকে বলেছিল..."আচ্ছা বৌ তোমাদের এত ভয় কিসের বলতে পার ?" আবার অনেকদিন পরে সে বলেছিল তার মাকে, "ভয়, ভয়, ভয়। এই ভয়ের জ্বালাতেই সগ্‌গে পাবে না।" মুকুলিকা বালিকা বয়সী হয়ে থাকা হয়নি সত্যবতীর।

পাঁচ

বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি

গ্রাম খণ্ডের মধ্যে দুটো গ্রাম আছে। একটা গ্রাম সত্যবতীর বাপের বাড়ি, আর একটা শ্বশুর বাড়ি। আখ্যানের গোড়া থেকেই দেখি সত্যবতীকে দ্বিতীয় গ্রামে অর্থাৎ শ্বশুর বাড়িতে পাঠানোর প্রস্তুতি। বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি পুরুষেরও আছে কিন্তু পুরুষকে বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়িতে যেতে হয়না, সে শ্বশুর বাড়িতে অতিথি মাত্র। নারীর আখ্যানে এই গ্রামান্তর গমন তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ষোলর অধ্যায়ে আমরা সম্মুখীন হই সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার। আখ্যানে এই প্রথম একটি ঋতু বর্ণনা।

> ঋতুরঙ্গ কাব্য। 'বর্ষা খণ্ড' শেষ করে প্রকৃতি দেবী সবে মাত্র 'শরৎখণ্ড' এর মলাটখানি খুলে ধরেছেন... এখনও কাশের বনে বনে শুরু হয়নি শ্বেত চামরের, বাজনারতি, শুধু ভোরের বাতাসে লেগেছে অকারণ পুলকের স্পন্দন।... উৎসাহের জোয়ার লেগেছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। প্রতীক্ষার উৎসাহ।
> 'মা দুর্গা আসছেন।"
> 'আসছেন বাপের বাড়ি। কৈলাস থেকে মর্তলোকে।'

শ্বশুর বাড়ি থেকে-বাপের বাড়ি-ফেরার প্রসঙ্গ আর-ও দীপ্যমান হয়ে উঠেছে সত্যবতীর লেখা একটি কবিতায়, তার বিষয় দুর্গাকে ঘরে আহ্বান। নাটকীয় ভাবেই একটা প্রতিবাদী প্রসঙ্গ হিসেবেই যেন খবর এল সত্যবতীর ডাক এসেছে শ্বশুর বাড়ি থেকে। 'ঋতুরঙ্গ' কথাটি নিয়ে পরে আমরা কথা বলব। এখন শুধু এটুকুই খেয়াল করা দরকার যে সত্যবতীর শ্বশুর বাড়ি যাওয়াটা বড়ো সহজ হয়নি।

গ্রাম জীবনের নানা কথাই আছে আখ্যানে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিবাহ আর বিবাহ-সংক্রান্ত সমস্যাগুলিই প্রাধান্য পাচ্ছে ক্রমশ। কথকের মন্তব্য থেকেই সমর্থন পাওয়া যাবে :

> কী অদ্ভুত 'কাল' ছিল সত্যদের। কনের বরের নামে গায়ে-জ্বর, বরের বৌয়ের নামে কাল ঘাম। সত্য যখন ঘর বসতে এসেছে, তখন অবিশ্যি "ঘড়-বর" পায়নি, কিন্তু যখন পেয়েছে, তখন মানসিক অবস্থা ওর থেকে উন্নত নয়। আর বিয়ে ? মানে জেনেছে তখন তার ? ছি ছি। সে বিয়ে যেন ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে বড়োদের পুতুল খেলার সাধ মেটানো। মস্ত মস্ত এক লোভ দেখিয়ে রাখা হয়েছে, "গৌরীদান", "কন্যা দান", "পৃথিবী দান"। আর কিছুই নয়। মেয়েগুলোর চোখ-মুখ ফোটবার আগেই হাড়িকাঠে গলা দিয়ে রেখে দেওয়া।

শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে তো বটেই, পরেও এই পুতুল খেলারই অনুবৃত্তি। শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে সত্যবতী একটি বিবাহ দেখেছিল। সে বিয়ে রাসুর। সেই বিয়ে সে-কালের দিক থেকে অস্বাভাবিক নয়, বরং তার নৈতিক সমর্থন ছিল। রামকালী একটি মেয়েকে "খণ্ড কপালী" হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে, তাতে কালের আদর্শে সে মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছে। সেজন্য যদি রাসুর অথবা তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মূল্য না দিয়েও থাকে, প্রথা অনুযায়ী সে অন্যায় করেনি কিছু। কিন্তু সেই বিবাহ দেখে সত্যবতী বলে উঠেছিল যে বাবার অন্যায় হয়েছে ("সেজ ঠাকুমা তো ঠিকই বলেছে পিস্ ঠাকুমা ! নিয্যস বাবার অন্যাই হয়েছে")। বাবার সঙ্গে, পিতৃতান্ত্রিকতার সঙ্গে সত্যবতীর তর্ক বিবাহকে কেন্দ্র করে।

সত্যবতী সাধারণ থেকে পৃথক, এক নারী মূর্তির সংরচনা। সে স্বচ্ছন্দে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলত পারত। অন্তত যে পরিস্থিতিতে তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হলো, সেখানে তার প্রতিবাদ স্বাভাবিক মনে হতো। কিন্তু আখ্যানে একটা অপ্রত্যাশিত মোচড় আসে, সত্যবতী স্বেচ্ছায় শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত

নেয়। আবার দেখি তার জন্য বালিকা ও পূর্ণ বয়স্কার ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। রামকালীর মনে হয়, 'মেয়েটা কি সত্যি বালিকা মাত্র নয়, ওর মধ্যে কি কোন শক্তির 'ভর' হয়? বুদ্ধির শক্তি? বাক্যের শক্তি?" শ্বশুর বাড়ি আর যমের বাড়ি যে এক এমন বোধ আছে এই বালিকা-নারীর। সে জানে তার বাবা এই যমপুরীতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিরস্ত করতে পারবেনা, শুধু কিছুক্ষণের জন্য বিলম্বিত করবে মাত্র। কিন্তু সত্যবতী কোন সাহায্য নেবেনা কারো, সে স্বেচ্ছায় মৃত্যু-বরণ করতে চায়, স্বেচ্ছায় পিতার সম্মান রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত। ইফিজিনিয়া যখন তার পিতার স্বার্থে আত্মদান করতে রাজি হয়েছিল, তখন তার পরিবর্তনকে আকস্মিক মনে করেছিলেন অ্যারিস্টটল। সত্যবতীর আচরণও আকস্মিক, কিন্তু যদি মনে রাখা যায় যে জন্ম হতেই সে একাধারে বালিকা-নারী তাহলে আর আকস্মিক মনে হয় না। শ্বশুর বাড়ি যাবার সমর্থনে পিতার সম্মানকে একটা বড়ো কারণ হিসেবে দেখিয়েছিল সত্যবতী, অথচ পরে দেখা যাবে এই শ্বশুর বাড়ি থেকেই সে কিন্তু পিতাকে অসম্মানিত করে ফেরাতে দ্বিধা করেনি। তাহলে কি বলতে পারি সম্মান রাখাটাই একমাত্র ব্যাপার নয়। আরো অন্য কোন কারণ আছে? আর সে কারণটি হলো সত্যবতীর স্বাধীনতা স্পৃহা। সে চায় সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা। সে চায় না কোন রক্ষা কবচ, কোন ত্রাণকর্তা। রামকালী দুবারই এই ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিতে চেয়েছিল। দুবারই সত্যবতী — তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পিতার মান রক্ষা নয়, স্বাধীনতা অর্জনই তার কারণ।

সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি যাত্রার ঘটনা দেড়শ বছর আগের বাংলাদেশের ঘটনা। কন্যা বিদায়ের অশ্রুসজল মুহূর্তটির বর্ণনা সন্তর্পনে এড়িয়ে যায় কথক। কন্যার পিতৃগৃহ ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের — পারিবারিক ইতিহাসের করুণতম মুহূর্তগুলির অন্যতম। সত্যবতীকে কেউ বিদায় দেয়না, সে কারো কাছ থেকে বিদায় নেয়না। তার অবরুদ্ধ কান্নার ধ্বনি নিস্তব্ধ হয়ে থাকে আখ্যানে। একি তাৎপর্যপূর্ণ নয়? আরো তাৎপর্যপূর্ণ নয় কি, যখন দেখি সে বিদায় নিচ্ছে একজনের কাছ থেকে, সেই একজন পুরুষ, তার বাবা, একজন মানুষ, তাকে সত্যবতী সম্মান করে?

ছয়

'হৃদয়ের উৎসব'

সত্যবতীর জীবনের দ্বিতীয় পর্বে, গ্রামখণ্ডের দ্বিতীয় অংশে তার জীবনে যুক্ত হলো আরো দুজন পুরুষ, আরো দুজন নারী। পুরুষদের মধ্যে একজন শ্বশুর, একজন স্বামী। দুজনেই মেরুদণ্ডহীন, অপদার্থ। সত্যবতীর জীবনে কোন কাম্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটল না। ঐ জন্যই ঐ মেরুদণ্ডহীন স্বামীর রক্ষাকর্তার ভূমিকাকে স্বীকার করা তো দূরের কথা তার কাছ থেকে কোন সাহায্য গ্রহণ করতে সে রাজি হয়নি। কিছুটা কৌতুককর ভাবে এই গ্রামখণ্ডে তিনজন পুরুষ (ভবতোষ-নবকুমার-নিতাই) তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। আর সত্যবতী অত্যন্ত অবহেলায় সেই সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই আচরণ তার স্বামীর প্রতি ধিক্কার।

সত্যবতী নবকুমার প্রসঙ্গ আলোচনায় একটি কথা বলা দরকার। এই আখ্যানে আমাদের সামাজিক পারিবারিক জীবনের অনেক অনুষ্ঠান, অনেক আদর্শ সম্বন্ধে একটা নীরবতা আছে। বিশেষভাবে যা অনুপস্থিত তা হলো প্রেম। কথক কোন নাবালিকা বধূ ও নাবালক বরের মিষ্টি-মিষ্টি-আধো-আধো সুরের কাহিনী গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকেই আমল দেননি। বালিকাবধূর আদর্শায়নকে তিনি এড়িয়ে গেছেন সযত্নে। এখানে আছে এক শঙ্করীর কাহিনী, যে-শঙ্করী ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কী তার কারণ? প্রেম? অবশ্যই শঙ্করীর ঘর ছাড়ার পেছনে ছিল একজন পুরুষের আকর্ষণ, অবশ্যই সে সাড়া দিয়েছিল শরীরের মনের তাড়নায়। কিন্তু সমাজে এই প্রেমের অস্তিত্ব অসম্ভব। সমাজ তাকে নির্দ্বিধায় মৃত বলে মেনে নিয়েছিল। জীবিতের পক্ষে প্রেমের একমাত্র ক্ষেত্র দাম্পত্য জীবন। কিন্তু যে ঋতুরঙ্গের কথা বলেছেন কথক সেই ঋতুরঙ্গে প্রেমের জায়গা নেই। প্রেমও নেই প্রকৃতিও নেই। জটা ও তার বৌ, রাসু ও সারদা, সৌদামিণী ও মুকুন্দ মুখুজ্জো, নিতাই ও ভাবিনী — এই যে চারটি দম্পতি এদের কারো জীবনেই প্রেম নেই। কিন্তু যৌনতার ভূমিকা আছে। তারা সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশীদার। পুরুষের বিবাহ যৌনতার দাবী নিবৃত্ত করার জন্য এবং বংশবৃদ্ধির দায়িত্ব পালনের জন্য। নারীর যৌন প্রবৃত্তি বিপজ্জনক, অতএব তা পুরুষের ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত, স্বামী পরিত্যক্তা এবং বিধবাদের যৌন প্রবৃত্তি বহু আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা নির্বাপিত, সম্ভব হলে উন্মূলিত করার প্রয়োজন। সত্যবতী-নবকুমারের দাম্পত্যজীবন এই সাধারণ বাঁচার বাইরে নয়।

একটা রোমান্সের ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল। "পূজোর উৎসবের সঙ্গে হৃদয়ের আর এক উৎসবকে যুক্ত করে নিয়ে অবিরত বিহ্বল হচ্ছিল সে" — কথকের এই ব্যাখ্যান থেকে 'হৃদয়ের উৎসব'-এর অস্তিত্ব যে দাম্পত্য জীবনে আছে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তা সত্যবতীর অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রত্যক্ষ কিনা তা জানা গেল না। নবকুমার নির্জন রাস্তায় গান গায় 'এনেছি বকুলমালা', কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তার জীবনের প্রথম বাক্য বিনিময়, কথকের ভাষায়, তার কল্পনা ভরা হৃদয়ের ওপর একটা কালির দোয়াত উপুড় করে দেওয়া। বিবাহ প্রথার

মধ্যে সত্যবতী-বন্দী, কিন্তু হৃদয়ের উৎসবে যোগ দেওয়ায় সে স্বাধীন। এই পুরুষের সঙ্গে হৃদয়ের উৎসবে সে যোগ দিতে পারে না।

পরিশ্রমী পাঠক-পাঠিকার অবশ্যই মনে পড়বে দীনতারিণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাপের বাড়িতে সত্যবতী ও নবকুমারের একটি নিবিড় অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত আখ্যানে এই অংশটি যেন এক ব্যতিক্রম। এখানে সত্যবতীর মাথায় হঠাৎ "দুষ্টুবুদ্ধি দেখা দেয়"। বাপের বাড়ির ঐশ্বর্য দেখাবার কথাও মনে হয় তার; অর্থ-প্রাচুর্য প্রতিপত্তির দেমাক থেকে সত্যবতী তাহলে মুক্ত নয় এমন কথা আমাদের মনে হতে পারে এখানে। আখ্যানে রচিত হয় একটা আবেগ বিহ্বল মুহূর্ত, সেখানে আবির্ভূত হয় রামকালীর প্রসঙ্গ। হঠাৎ নবকুমার রামকালীর সঙ্গে তুলনা দেয় বটবৃক্ষের, আর সত্য অভিভূত হয়, লোকলজ্জা ভুলে হাত ধরে নবকুমারের। "সত্যি বলছ? আমরা বাবাকে তোমার ভালো লেগেছে।" সত্যবতীর বিহ্বলতা তাহলে নবকুমারের প্রতি কোন আকর্ষণে নয়। তাকে উদ্বেলিত করতে পারে একজন 'আদর্শ' পুরুষ। নবকুমার তার স্বামী, প্রথা নির্দিষ্ট গুরুজন। রামকালী তার, নির্বাচিত শ্রদ্ধেয় পুরুষ।

সত্যবতী বিবাহ প্রথা নিয়ে কোন প্রতিবাদ করেনি। স্বামীর সঙ্গে তার প্রেম থাক বা না-থাক, বিবাহের মূল উদ্দেশ্যে নিয়ে তার কোন মানসিক সংঘাত নেই। সে একের পর এক নবকুমারের সন্তানদের জন্ম দিয়েছে। সতীত্বের ধারণাও তার স্পষ্ট এবং দৃঢ়। দৃঢ় বলেই দুজন পুরুষের আসক্তি সে তুচ্ছ করতে পারে।

কলকাতা-খণ্ডে সত্যবতী স্বামী ছাড়া দুজন পুরুষের কাছাকাছি এসেছিল। ভবতোষ ও নিতাই। এই দুই পুরুষই তার প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল, সত্যবতী অনুভব করেছিল সেই আকর্ষণ। ভবতোষ মাস্টারের চোখের "শ্রদ্ধা সমীহ মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি" সত্যবতী লক্ষ করেছে কিন্তু অগ্রাহ্য করতে চেয়েছে। নিতাইর দৃষ্টিও সে লক্ষ করেছে, নিতাইর দৃষ্টিতে ছিল লোভ ("গিলে খাওয়া")। তাকে সত্যবতী স্মরণ করিয়ে দিয়েছে "সতী নারীর উপাখ্যান"। সত্যবতীর সতীত্বে সামান্যতম ধাক্কা লাগেনি। কথক তাকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন ইতিহাসের একটা শক্তি হিসেবে সেই শক্তির আধারের পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। নারীদেহ 'পবিত্র' থাকা চাই। প্রেম দেহকে অপবিত্র করতে পারে। প্রেম তাই বিপজ্জনক। সত্যবতী প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনা।

যে-সমাজে সত্যবতীর অবস্থান সেখানে বিবাহ-হীন নারীর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। হয় সে বহু সতীনের একজন, নয় স্বামী পরিত্যক্তা, নয় বিধবা — যেভাবেই হোক বিবাহ-ব্যবস্থার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে থাকতে হবেই একটা বয়সের পর। সত্যবতী বিধবা-বিবাহের কথা শুনেছে কিন্তু বিধবা-বিবাহ পছন্দ করেনা ("বিধবা বিবাহ আমার চোখে অবিশ্যি ভাল ঠেকে না, তবে মন্দের ভাল। বড় বড় পণ্ডিতেরা যখন শাস্তর পড়ে বুঝে-সুঝে বিধান দিয়ে রেখেছেন, তখন একেবারে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।")। সতীন প্রথাও পছন্দ করেনা, কিন্তু সৌদামিনীর মুকুন্দ মুখুজ্জ্যের কাছে ফিরে যাওয়া মেনে নিতে পারে। শঙ্করী, এই আখ্যানের একমাত্র নারী যে গৃহ পলাতক। সত্যবতী মনে করে যে-কাজ সে করেছিল তা অন্যায় ('মহাপাতক')। তবে সমাজের শাস্ত্রে এই পাপের ক্ষমা না থাকলেও সত্যবতীর শাস্ত্রে আছে। সমাজ শাস্ত্রের নির্দেশে শঙ্করী আত্মহত্যা করেছে, সত্যবতী তার নিজের বিবেচনায় শঙ্করীর মেয়ে সুহাসিনীকে গ্রহণ করেছে। লক্ষণীয় যে এই গ্রহণে সমর্থন আছে তার জীবনের আদর্শ পুরুষ রামকালীর।

বিধবা-পলাতকা-পুনর্বিবাহিতা-স্বামী পরিত্যক্তা শঙ্করীর মেয়ে যখন চোদ্দ পেরোল তখন শুরু হলো একটা সঙ্কট। বিয়ে দেবার সঙ্গতি নেই শঙ্করীর, অথচ বিবাহ ছাড়া সম্মানিত সামাজিক অস্তিত্ব অসম্ভব। তাই মেয়েটিকে বালবিধবা পরিচয় দিতে হয়। সত্যবতীর দায়িত্ব তার অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। আর তা সম্ভব বিবাহের মধ্য দিয়েই। এই সমস্যার একটা সমাধান হয়। এই সমাধান প্রায় রূপকথার মতোই। কথক এই রূপকথাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেন যথেষ্ট। কিন্তু রূপকথাটির বিশ্বাসযোগ্যতার সমস্যাটা গুরুতর নয়। আমাদের লক্ষ করা দরকার যে সারা আখ্যানে এই একমাত্র বিবাহ যার সঙ্গে 'প্রেম' অনুভূতিটি যুক্ত। সেই জন্যই এর মধ্যে রূপকথার লক্ষণ। কিন্তু শুধু রূপকথা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি সমাজে নারীর এক ট্রাজিক পরিস্থিতি।

আমরা আগে দেখেছি যে ভবতোষ এবং নিতাই উভয়েই সত্যবতীর প্রতি আগ্রহী। এক সময় শাশুড়ির নির্যাতন থেকে সত্যবতীকে বাঁচানোর জন্য নিতাই-ভবতোষ এবং নবকুমার একত্রিত হয়েছিল। সত্যবতীর বাকি জীবনেও এই তিনজনের একত্রিত রূপ স্মরণীয়। কিন্তু তার মধ্যে ভবতোষের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। রামকালীকে বাদ দিলে যে একমাত্র পুরুষকে সত্যবতী সম্মান করেছে সে ভবতোষ : শিক্ষক। আমাদের সমাজে শিক্ষক ও পিতার একটা সমীকরণ আছে। রামকালী ও ভবতোষের একটা সমীকরণ ঘটে গেছে সত্যবতীর মনে। সত্যবতীর গ্রাম থেকে শহরে আসা এবং শহরে বসবাসের পেছনে আছে ভবতোষ। শহর জীবনে সত্যবতীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পুরুষ ভবতোষ। ভবতোষ এবং নিতাই এই দুই পুরুষকে সত্যবতী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু

দুজনের ওপরেই তার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। নিতাইর স্ত্রী ভামিনী সত্যবতীকে দীর্ঘকাল তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী (সতীনের বিকল্প ?) ভেবেছে, আর ভবতোষ চিরকাল সত্যবতীর দ্বারা আবিষ্ট থেকেছে। একদিক থেকে একেই বলতে পারি শুধু তার যৌনতার আধিপত্য নয়, এ যেন তার যৌনতার জয়, তার অধিকারের প্রসার। এর মধ্যে আছে তৃপ্তি এবং জয়ের বোধ। যখন সে ভবতোষকে উদ্বুদ্ধ করে সুহাসিনীকে বিবাহ করতে এবং ভবতোষ মেনে নেয় তার নির্দেশ ('তুমি কি আমাকে আমার চিরদিনের অপরাধের শাস্তি দিতে চাও...') তখন এখানে অনুচ্চারিত থাকেনা আর ভবতোষ-সত্যবতীর হৃদয়ের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ট্রাজিক রূপকথাটি।

সুহাসিনীই একমাত্র নারী এই আখ্যানে, যার প্রাক-বিবাহ জীবনে একটি পুরুষের প্রতি আকর্ষণের কথা আমরা জেনেছি। আর এই জায়গায় সত্যবতীর সঙ্গে তার ঐক্য ও অনৈক্যটি লক্ষণীয়। দুজনেই ভবতোষের অনুরাগিনী, কিন্তু সত্যবতীর মনোভাবের প্রকাশ সুহাসিনীর প্রকাশ থেকে ভিন্ন। আখ্যানের প্রথমে আমরা যে রাসুর বিবাহের কথা শুনেছিলাম এখন দেখা যাবে যে সুহাসিনীর বিবাহ ঠিক তার প্রতিবিম্ব। রাসুর বিবাহ দেয় রামকালী একটি মেয়ের সামাজিক সম্মান বাঁচাবার জন্য, ভবতোষের বিবাহ দেয় সত্যবতী একটি মেয়েকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। রামকালী অবশ্য সেই বিবাহের জন্য অন্য কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ভাবেনি এবং অন্য একটি নারী (রাসুর স্ত্রী) যে আহত হতে পারে, আত্মহত্যা করতে চাইতে পারে তা কল্পনা করতে পারেনি। তার কাছে বিবাহ একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠান হবে পুরুষ-প্রধানের ইচ্ছায়। সত্যবতী যে বিবাহ দেয় সে বিবাহ অনেকটাই দুটি নারীপুরুষের ইচ্ছার পরিণতি। ভবতোষের কোণের ঘরে যখন সুহাসিনীকে দেখা যায় তখন এই আখ্যানে প্রথম আবির্ভূত হয় একজন আনন্দিতা, বালিকা নয়, তরুণী নারী, তার "মুখে এক ঝলক আলো', স্বভাব-বহির্ভূত উচ্ছ্বাসে বলে ওঠে "পিসিমা, দেখবে এস কত বই। উঃ আমার এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছেনা।" সুহাসিনীর মধ্যে সত্যবতীরই একটি প্রসার, বই সম্বন্ধে আকর্ষণ, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা। সত্যবতী তার মধ্য দিয়েই নিজেকে বিস্তারিত করতে চাইছে। ('সুহাসকে বুঝি এমন মনের মত গড়তে চেষ্টা করেছি আপনার কথা ভেবেই। শুধু সে কথা নিজেই টের পাইনি এতদিন।") সত্যবতী তাই বলতে পারে, 'এ আমার এতকালের শিক্ষাদীক্ষার গুরুদক্ষিণা।' আর বিব্রত ভবতোষকে স্মরণ করিয়ে দেয় বৃদ্ধ শিব ও তরুণী উমার গল্প। আখ্যানে এই একমাত্র প্রেম, একমাত্র 'হৃদয়ের উৎসব'। এই মনোরম রূপকথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে গভীর সামাজিক ট্রাজেডি—স্বাধীন প্রেমের অবরুদ্ধ স্রোত।

সাত

গ্রাম-শহর

গ্রাম দুটো আলাদা, কিন্তু প্রাকৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে একই ভূগোলের প্রসার। সময়টাও যেন স্তব্ধ। একটা অনড় সময়ের মধ্যে অনড় শাস্ত্রবিধিতে বাঁধা মানুষ-মানুষী। বিশ তিরিশ মাইল দূরে কলকাতা শহর। সেখানে চলেছে জীবনের নতুন পরীক্ষা। গ্রামগুলি তাই শুধু স্বতন্ত্র ভূখণ্ড নয়, তারা যেন স্বতন্ত্র কালখণ্ড। কালের দিক থেকে গ্রামকে শহরের কাছে আনতে চেয়েছিল ভবতোষ ("আসল নষ্টের গোড়াতো ওই ভবতোষ বিশ্বাস। কলকাতা থেকে ইংরেজি শিখে এসে গাঁয়ে এখন ইস্কুল খোলা হয়েছে বাবুর।")। কলকাতা শহর ইংরেজি শিক্ষা এবং ইউরোপিয় সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত। এই শহর সৃষ্টি করেছে গ্রাম-ভারতবর্ষের সঙ্গে এক বৈপরীত্য। শুধু বৈপরীত্যই নয়, কলকাতা যেন ঘোষণা করছে ইউরোপিয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব। দেড়শ বছর আগের বাঙালি শিক্ষিত সমাজ মোটামুটি ইউরোপিয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছিল এবং আজ সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আমাদের মন ইউরোপ বা পাশ্চাত্য সভ্যতামুখী, আমাদের চিন্তায় ইউরোকেন্দ্রিকতা প্রবল ভাবেই উপস্থিত। কাজেই সত্যবতীও যে পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে তা সমকালীন মনোভাবেরই প্রতিফলন। তার মধ্যে যদি ইংরেজ শাসনের প্রতি সমর্থন থাকে, সেই সমর্থনের যদি কোন 'critique' নাও থাকে কথকের ভাষ্যে, তাকে ঔপনিবেশিকতার নির্জলা সমর্থন মনে করার কারণ নেই। সত্যবতী ইংরেজ শাসনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত নয় এবং ইংরেজের সাংস্কৃতিক আধিপত্য সম্বন্ধে তার ধারণাও অস্পষ্ট। শুধু সত্যবতীই নয়, আখ্যানের কোন চরিত্রই ইংরেজ শাসন, ইংরেজি শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবহিত নয়। এমন কি কলকাতা শহরর নতুন চিন্তাধারা, ইউরোপিয় জীবনধারা সম্বন্ধেও তাদের অভিজ্ঞতা অস্পষ্ট। নবকুমার শুনেছে "সায়েবরা শুধু একটা বিয়ে করে। কখনো অনেক বিয়ে করেনা"। ভবতোষ যে সত্যবতীর প্রতি নির্যাতনের প্রতিকারে তৎপর হয়েছিল তার একটা কারণ, "সাহেবদের দেশে কদাপি কেউ স্ত্রীজাতির প্রতি নির্যাতন সহ্য করেনা।" সত্যবতী জেনেছিল, "কলকাতার মেয়েরা আর মুখ্যু থাকবেনা", জেনেছিল "ওদের সমাজে (অর্থাৎ ইংরেজ সমাজে) পরিবারই সর্বেসর্বা"। কিন্তু ইংরেজ শাসন যে পরাধীনতা সেই কথাটি সত্যবতীর মতো বুদ্ধিমতীর

পক্ষে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই "ওরা সমুদ্রের ওপার থেকে এসে তোদের কত ভাল করছে" এই মন্তব্যের প্রতিবাদ শুনি সত্যবতীর মুখে : "ভাল করছেনা হাতী। অনেক লোকসানই করছে বরং ..." কিন্তু 'লোকসান'টা যে কী তা আমরা শুনিনা। আসলে এখানে সত্যবতীর কাল থেকে সাম্প্রতিক কথকের কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ প্রভাবের যে বিতর্ক চলেছে তাকে কথক সত্যবতীর আচরণে ও জীবনে সম্পূর্ণ মেলাতে পারছেন না। ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজ ডাক্তার এবং কলকাতা শহর তার কাছে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। দেশাভিমান কোথাও নেই তার। তার মুখে হঠাৎ ইংরেজি শাসকের যে— প্রতিবাদ শুনি তাকি তাহলে অসঙ্গত? বরং সৌদামিনীর উক্তি, "আজন্ম পরাধীনতায় কাটল, স্বাধীনতা কাকে বলে তাই জানলাম না। ...মানুষ পরাধীন হয় তাই জানি। দেশের আবার স্বাধীন পরাধীন?" অনেক বেশি স্বাভাবিক এবং গভীর। যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা গত শতাব্দী থেকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত বলে এসেছে তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে নারীমুক্তির প্রশ্ন ছিল গৌণ। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও সৌদামিনীর কথাটি বলতে পারত। অর্থাৎ নারী এবং দরিদ্র-দলিত সাধারণ পুরুষ দুই গোষ্ঠীই "আজন্ম পরাধীন"। দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতায় তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে কি? এই প্রসঙ্গটা অবশ্য আখ্যানে প্রাধান্য পায়নি। পাবার কথাও হয়তো নয়। কিন্তু এড়ানো যে যায়নি তার কারণ ইংরেজ শাসনের প্রতি সত্যবতীর গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে একটা দ্বিধা ছিল কোথাও। এই যে ইংরেজি শিক্ষা তা যেমন একটা মুক্তির আলো, তেমনই তা একটা দাসত্বের শৃঙ্খল। ভবতোষ বুঝিয়েছিল, "ইংরেজি শিখলে সাহেবের অফিসে মোটা মাইনের চাকরি অবধারিত।' নবকুমার গিয়েছিল কলকাতায়, চাকরি তার লক্ষ্য। সত্যবতী গিয়েছিল কলকাতায়, তার লক্ষ্য ছিল মুক্তি। একজন গড্ডালিকা স্রোতে ভাসে, একজন যেতে চায় স্রোতের উল্টো দিকে।

গ্রামখণ্ডে সত্যবতী যেমন প্রতিবাদী, তেমনই সহিষ্ণুও। কোথা থেকে সে পেয়েছিল প্রতিবাদের শক্তি, সহিষ্ণুতার শক্তি? ইংরেজি শিক্ষার বাইরে আর একটা শিক্ষা ছিল কি কোথাও গ্রাম সমাজে? নির্দয় শাশুড়ির সঙ্গে তার যে ব্যবহার প্রতিবাদ ও সহিষ্ণুতা এই যুগল শক্তির উৎস কোথায়? পরনারী লোভী শ্বশুরকে প্রণামের অযোগ্য ঘোষণা এক বৈপ্লবিক প্রতিবাদ। কথক যখন সত্যবতীর "ভয়ানক এক দুঃসাহসিক সংকল্প"-এর কথা বলেন, তখন তার মধ্যে একটা কৌতুকের মাত্রা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর বৈপ্লবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়না। শ্বশুরকে প্রণাম অস্বীকার করা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উচ্চাবচতা ও শ্রদ্ধার পাত্র নির্ণয়ে মানদণ্ডের মর্মভেদী সমালোচনা। শাশুড়িও যে প্রণম্য তা নয়, কিন্তু সত্যবতীর আচরণ কোন অনমনীয় যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, শাশুড়ির ক্ষেত্রে সে প্রথাকে অস্বীকার করেনি। প্রথাপালন এবং প্রথা বিরোধিতার দ্বন্দ্ব তার আচরণকে করে তোলে গতিশীল এবং ক্রমশই দৃঢ়তর। শ্বশুর-শাশুড়ি গৃহত্যাগের ভয় দেখায়। কিন্তু তাদের ভঙ্গুর সংকল্প পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সত্যবতীর মনেও একটা সংকল্প গড়ে ওঠে। সেই সংকল্প পরিবর্তিত হয়না, সেই সংকল্প নতুন জীবনের সন্ধানের। কলকাতা যাবার সংকল্প।

এখানেই কলকাতা খণ্ডের সূচনা হতে পারত। কিন্তু আরো অনেকটা সময় গ্রামখণ্ডের আখ্যান চলেছে। কিন্তু সময় সত্যবতীর সংকল্প বোঝাতে পারেনি। কলকাতা যাবার পেছনে কী যুক্তি? কথক বলেন, ছেলেদের শিক্ষা। আমরা বলতে পারি স্বাধীনতা অর্জন। সত্যবতী চরিত্রের প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু কোন্ কলকাতায় নিয়ে পৌঁছল সত্যবতী ? যে-কলকাতায় সে পৌঁছল তা এই গ্রামখণ্ডের এক সম্প্রসারণ। সেখানে অর্থের অহঙ্কার। জাতপাতের বিচার। কলকাতা শহরে থাকলেই মানুষ বদলায় না—তার প্রমাণ মুকুন্দ মুখুজ্যে, তার প্রমাণ নবকুমার। কলকাতার কোন্ শিক্ষা, কোন্ আন্দোলন, কোন্ মানুষ সত্যবতীর জীবনে স্পর্শ করল? সত্যবতীর জীবনে কলকাতা খণ্ডের ভূমিকাকে তাই মনে হয় অগভীর, প্রান্তিক। তবে একেবারেই কোন ছাপ পড়েনা কলকাতার জীবনের তা বলা ঠিক হবেনা। সে ইংরেজি শেখে, সে বই পড়ে। কী বই পড়ে আমরা জানিনা। তবে বই-পড়ার প্রসঙ্গের মধ্যেই নিহিত থাকে একটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা। কিন্তু কোন নতুন মানুষ আনে না নতুন প্রশ্নের সঙ্কেত। বরং তার জীবন আবর্তিত হয় সেই বারুইপুর আর নিত্যানন্দপুরের লোকজনদের নিয়েই।

তবে কলকাতায় নেই গ্রাম জীবনের নির্যাতন। তাহলে তার মনে কেন প্রশ্ন ওঠেনা পরিবার সংগঠনের। পিতৃতান্ত্রিক একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের তুলনায় ছোট পরিবারে যে নারীর স্বাধীনতা অনেক বেশি তা নিশ্চয়ই সে বোঝে। এখানে সে স্বাধীন অনেক বেশি। শ্বশুড়-শাশুড়ি নেই, সমাজের বাধা নেই, এমনকি তার স্বামীও কোন কাজেই বাধা নয়। কিন্তু যে-যুদ্ধে প্রতিপক্ষ বিনীত এবং দুবর্ল, সে যুদ্ধ জয়ে গৌরব কোথায়? কলকাতা খণ্ডে সত্যবতীর জীবন বিকশিত হয়েছে, সে স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু তার সংগ্রামী ভূমিকা নেই। কলকাতা খণ্ডে তার প্রতিপক্ষ নেই।

গ্রাম-শহরে বোনা এই আখ্যানে গ্রাম ও শহরের প্রতীকী তাৎপর্যের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বারুইপুর নিত্যানন্দপুরের ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক অর্থাৎ বাস্তব মাত্রাকে উপেক্ষা করতে পারিনা। এই আখ্যান একটা বিশেষ কালের আখ্যান। সেই কাল আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা বড়ো

পরিবর্তনের কাল। সেই ইতিহাসে আমাদের সমাজের আশঙ্কা ও চিন্তার কেন্দ্রে ছিল নারী। পুরুষ প্রধান সমাজ যেন হঠাৎ সমাজে নারীর ভূমিকার নানামাত্রা আবিষ্কার করে ফেলেছিল। তাই প্রধান লক্ষ্য নারীকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনগুলি — সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ বিরোধিতা। তারই ফল স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং নারীপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে একটা নতুন সাহিত্য। এই আশঙ্কাও ভাবনার পেছনে অনেকরকম প্রশ্ন ছিল : নারীর সংকীর্ণ জগৎ-কে কতটা প্রসারিত করা উচিত? কতটা প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন তার কর্মক্ষেত্র? পুরুষ ভেবেছিল ইউরোপিয় ঝোড়ো-হাওয়ায়, আমাদের সভ্যতার কেন্দ্রকে অবিচালিত রাখতে হবে। সেই কেন্দ্রীয় শক্তি নারী। আর বহুদিন পর্যন্ত নারীকে ইউরোপিয় সাংস্কৃতিক শক্তির সঙ্গে পরিচয়ের ব্যাপারে একটা সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষার পেছনে তাই অনেকে লক্ষ করে থাকেন পুরুষেরই প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা। সমস্ত সাংস্কৃতিক পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব নারীর ওপর। নারীর সমস্ত মুক্তি প্রচেষ্টার পেছনে যতটা সমর্থন ছিল, তার চেয়ে বেশি বাধা ছিল। কলকাতা শহর সেই মুক্তি এবং প্রতিরোধের কেন্দ্রভূমি। এই ঐতিহাসিক কলকাতা এই আখ্যানে অনুপস্থিত। কলকাতা খণ্ড তাই আখ্যানের দুর্বল খণ্ড।

কলকাতা খণ্ডে পৌঁছবার আগেই আমরা জেনে গেছি যে এই আখ্যান নারী কথিত নারী রচিত নারীর ইতিহাস। সেই ইতিহাসের একটা অংশ নির্যাতন ও নির্যন্ত্রণা। আর একটা অংশ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। এর নায়িকার যথার্থ ঐতিহাসিক অস্তিত্বের প্রশ্ন অবান্তর, সে, আগেই বলেছি, কতকগুলি ঐতিহাসিক শক্তির পুঞ্জীভূত রূপ। তাই আমাদের মনে একটা স্বাভাবিক প্রত্যাশা তৈরি হয় কীভাবে শহরের নতুন জীবন তাকে প্রতিরোধে ও প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করছে। সত্যবতীর গ্রামের অন্তঃপুর থেকে কলকাতার অন্তঃপুরের ইতিহাস বড়ো সহজ সরল। এখানে হঠাৎ তাকে দেখতে পাই সুখী তৃপ্ত প্রতিবাদহীন 'সাধারণ'। শিক্ষা ও চাকুরি, মানুষ-হওয়া এবং বড়ো পদ পাওয়া যেন হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য তার কাছে এক হয়ে যায়। যে সন্তানদের জন্য তার কলকাতা আসা তারাও কোন নতুন তাৎপর্যের সংকেত দেয় না। শহর তাহলে সত্যবতীকে কোন্ শক্তি দিল?

তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে সত্যবতী ভাবছে কেমন স্বভাব হবে এই নবজাতকের। শাস্ত্র বলে মানুষ মাতুলের ধারা পায়। কিন্তু শাস্ত্রে দাদামশায়ের কথা লেখেনি কেন? সত্যবতীর মনে যে আদর্শ দীপ্যমান তা তার পিতার। কিন্তু পিতার আদর্শের সঙ্গে শহরের আদর্শের কোন সঙ্গতি আছে আমরা জানতে পারিনা। শহর খণ্ডে গ্রাম-থেকে-আসা কোন মানুষেরই কোন দ্বন্দ্ব নেই। না নবকুমার, না সৌদামিনী, না ভাবিনী কেউ কোন প্রশ্ন তাড়িত নয়। এ কি আখ্যানের দুর্বলতা, না, আখ্যান পরিকল্পনার কৌশল?

আট

পরাজয় ও বৃহত্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি

গ্রাম শহরের দ্বন্দ্ব কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে আর সেই আখ্যান পৌঁছে যায় তুঙ্গে। সুখী তৃপ্ত সত্যবতী আবার যেন ভস্মশয্যা ছেড়ে বীরের চরিত্র অর্জন করে। গোড়ায় বলেছি, এই আখ্যানের কেন্দ্রীয় রূপক বিবাহ। আখ্যানের প্রথম বিবাহে নারী প্রথার বর্শায় বেঁধা বোবা জানোয়ার, বহু বিবাহের বলি। দ্বিতীয় বিবাহ সুহাসিনী-ভবতোষের। এই বিবাহ-যতটা আদর্শগত, যতটা ইচ্ছাপূরণ, যতটা সত্যবতীর ব্যক্তিগত প্রাধান্যের ফল ততটা স্বাভাবিক নয় (এমনকি এ বিবাহ হিন্দু সমাজের কাঠামোর থেকেও বাইরে, ব্রাহ্ম সমাজের আবহাওয়ায়)। তৃতীয় বিবাহে আখ্যান শেষ। আবার একটা বলি। সত্যবতীর বিরুদ্ধে পিতৃতান্ত্রিক প্রথানুগত গ্রামখণ্ডের প্রতিশোধ।

তৃতীয় বিবাহের আগে আর একটি বিবাহের কথা আছে। সে বিবাহ এখনও সম্পন্ন হয়নি। চলছে তার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। এই পরিকল্পনা সত্যবতীর। এখানে সত্যবতী পুরোপুরি প্রথাসম্মত। এই বিবাহ প্রসঙ্গ শেষ বিবাহের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবেই গড়ে উঠেছে। সত্যবতী যে বিবাহের পরিকল্পনা করেছিল সে বিবাহ হয়নি। আর যে-বিবাহ সম্পন্ন হলো সে-বিবাহে সে যোগ দিল না। আখ্যানের পর্বে পর্বে এই বিবাহ-ঘটনা তাই এত তাৎপর্যপূর্ণ। একটি বিবাহ নিয়ে সে তর্ক শুরু করেছিল; একটি বিবাহে সে একটি নারীকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল এবং একটি স্বপ্নকে বাস্তব করতে চেয়েছিল; আর শেষ বিবাহ তার পরাজয়, এবং বৃহত্তর যুদ্ধের আহ্বান।

সত্যবতী একদিন নবকুমারকে শপথ করিয়েছিল যে মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দেবেনা। 'সুবর্ণকে মেরে ফেলো না। একে বাঁচাতে হবে। হাজার হাজার সুবর্ণকে বাঁচাতে হবে।' নবকুমার ভেবেছিল, 'পাগলের সঙ্গে চাতুরিতে দোষ কি?' সত্যবতী পাগল, নবকুমার চতুর। ইতিপূর্বে নবকুমার কোন কাজেই সত্যবতীকে বাধা দিতে পারেনি। প্রত্যেকটি প্রতিরোধেই সত্যবতী জয়ী। এইবার নবকুমারের ষড়যন্ত্রের সামনে সে অসহায়। সুবর্ণলতাকে রক্ষা করতে পারেনা সত্যবতী। স্বামীকে সে বলে, "স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে ভাই হয়ে ছেলে হয়ে তোমরা অভিশাপ দিয়ে আসছ আবহমানকাল থেকে" — পিতৃতান্ত্রিকতার ষড়যন্ত্র দেখতে পাই স্পষ্ট ভাবে। এখন সে প্রশ্ন করে বিবাহ প্রথাটাকেই বিবাহের অমোঘ অচ্ছেদ্যবন্ধনকে সন্দেহ করতে পারে।

চাতুরী ও প্রবঞ্চনার দ্বারা সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলে পরাভূত করে সত্যবতীকে। যখন সে ভেবেছিল তার জীবন সার্থক, যখন সে তৃপ্ত ঠিক তখনই তার জন্য অপেক্ষা করছিল এই ধূলিশয্যা। এই ট্রাজিডিই তার জীবনের ইতিহাস। কিন্তু সত্যবতীর ট্র্যাজিডিতেই আখ্যান সমাপ্ত নয়। এখান থেকে আরম্ভ হয় নতুন একটা জীবন। সত্যবতী এইবার আবার গ্রাম ছেড়ে চলেছে। এইবার সে পরিত্যাগ করছে গ্রাম এবং স্বামী, পুরোনো স্থান এবং কাল।

"ধীরে ধীরে বটতলায় এসে থামে। গরুর গাড়ির পথ শেষ

হয়।" এখন সত্যবতীই শুধু কলকাতায় প্রবেশ করছেনা, এইবার কলকাতা প্রবেশ করছে তার জীবনে। "সব গাঁটছাড়াই জন্মজন্মান্তরের বাঁধন কিনা" এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সে চলেছে পিতার কাছে। পিতৃতান্ত্রিকতার কাছে কোন উত্তর পাওয়া যাবে এই বিশ্বাস তার এখনও আছে। কোন উত্তর সে পাবে জানিনা, কিন্তু এবার সে গ্রাম ছেড়ে চলেছে শহরে, আরেকটা জীবনের সন্ধানে। □

চতুরঙ্গের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে আগামী শ্রাবণ মাসে। এখন থেকে চতুরঙ্গের প্রতি সংখ্যার মূল্য ধার্য হয়েছে বারো টাকা। পত্রিকার কলেবরের অনুপাতে এই মূল্য যে খুবই কম, অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই সেকথা বুঝবেন। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়েছে এবং যাঁরা নতুন গ্রাহক হতে চান তাঁদের এখন থেকে মাস কিংবা বৎসরের হিসাবে নয়, সংখ্যা হিসাব করে গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা ৪টি, ৮টি, কিংবা ১২টি সংখ্যার গ্রাহক হতে পারেন। যে কটি সংখ্যায় গ্রাহক হবেন সেগুলির মূল্য একত্রে যত দাঁড়ায় ততই গ্রাহকচাঁদা পাঠাবেন। আমরা কেবল ডাকখরচা বহন করব। গ্রাহক চাঁদা মানিঅর্ডার কিংবা ড্রাফটে পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরের চেক ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ সহ পাঠাতে হবে। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়নি তাঁদের যতগুলি সংখ্যা এখনও প্রাপ্য, যেমন যেমন পত্রিকা প্রকাশিত হবে তাঁরা পেতে থাকবেন।

বাঙালিয়ানার প্রতীক

আবদুর রউফ

ভারত উপমহাদেশে কাজী নজরুল ইসলাম যে সমাজে জন্মেছিলেন সেখানে প্রকট ছিল সংখ্যালঘু মানসিকতা। যদিও জনসংখ্যার অনুপাতে তৎকালীন উভয় বাঙলাকে হিসাবের মধ্যে নিলে বাঙালি মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিল না, কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার সর্বক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দুদের দাপট নিরঙ্কুশ থাকায়, পিছিয়ে পড়া মুসলমানরা সংখ্যালঘু সুলভ হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়েছিল। নজরুলের কাব্য আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি এর ব্যতিক্রম হতে পেরেছিলেন সর্ব অর্থে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কবি না হয়ে তিনি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন মানবতার কবি এবং ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত জাতীয় কবি। কেমন করে তাঁর পক্ষে ব্যতিক্রম হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল সেটা খতিয়ে দেখাই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য।

সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বার বৈশিষ্ট্য

একটা জিনিস লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সংখ্যালঘুরা তাদের আইডেনটিটি রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বিশেষ করে তারা যদি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হয় এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের সম্পর্কে যদি থাকে উপেক্ষা বা উন্নাসিকতার ভাব, তাহলে মাইনোরিটিদের স্পর্শকাতরতা শতগুণ বেড়ে যায়। তখন দেখা যায় তাদের নিজেদের ধর্ম-কৃষ্টির সবকিছুকেই ভাল বলে প্রতিপন্ন করার প্রবণতা। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সন্তান সন্ততিদের কতকগুলি বিষয়ে এমনভাবে প্ররোচিত করা হয় যাতে তারা নিষ্ঠাবান ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্কের প্রশ্নেও কোনরকম আন্তর্ধর্মীয় ব্যাপার সংখ্যালঘুদের পছন্দ নয়। তবে কন্যাপক্ষ ধর্মান্তরিত হয়ে এসে তাদের সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধি করলে, আলাদা কথা। জীবনসংগ্রামের সর্বক্ষেত্রেই সংখ্যালঘুদের মনের মধ্যে এমন আশঙ্কা বাসা বেঁধে থাকে যে তাদের যোগ্যতার যথোপযুক্ত বিচার হয় না, সংখ্যালঘু বলেই তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এইসব কারণে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সাধারণ সমস্যাগুলি বিচার করার প্রশ্নেও প্রায়ক্ষেত্রেই এক ধরনের বিশেষ মাইনোরিটি কমপ্লেক্সজনিত দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা তাদের এমনভাবে পেয়ে বসে যে অনেক সময় অতি সরল বিষয়ও তারা বাঁকা ভাবে গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে স্থান কাল পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সত্যের স্বরূপ চিনতে তাদের প্রায়শই ভুল হয়ে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্যের বিন্দু বিসর্গও লক্ষ করা যায়নি। এই রকম একটা ব্যতিক্রমী ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য কবির মানসিক গঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে উপায় নেই।

নজরুলের মানসিক গঠন

কাজী নজরুলের ইসলামের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে। সময়টা এখানে খেয়াল করা প্রয়োজন। জন্মস্থান চুরুলিয়া, পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম। বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত আধুনিকতা তখনও বর্ধমান জেলার এই প্রত্যন্ত গ্রামের পরিবেশকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি। এই গ্রামীণ পরিবেশে কেটেছিল কবির শৈশব এবং কৈশোরের কিছু অংশ। দশ/বার বছর বয়স থেকেই তাঁর সৃজনশীলতার স্ফুরণ শুরু হয়ে যায়। ভেবে দেখা প্রয়োজন এত অল্প বয়সে সৃজনশীল হয়ে ওঠার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তা কবি লাভ করেছিলেন কী ভাবে?

পিতৃহীন নজরুলকে পেটের দায়ে কাজি রোজগারের চেষ্টা করতে হয়েছিল দশ বছর বয়স থেকেই। তাঁর পড়াশুনা তাই নিয়মাফিক পদ্ধতিতে আর এগোতে পারেনি। ১৯০৯ সালে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় পাশ করে নজরুলকে কাজ নিতে হয় ওই মক্তবে, হাজী পালোয়ানের মাজারে এবং পীরপুকুরের মসজিদে। ইসলামের ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান এবং মুসলমানদের সমাজ সম্পর্কে কবির যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল এইসব কাজ থেকেই। নজরুল ফারসির প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন চুরুলিয়া মক্তবের শিক্ষক মৌলবী কাজী ফজলে আহমদের কাছে। ফারসি চর্চা এবং এই ভাষায় কবিতা লেখার ব্যাপারে উৎসাহী আরও একজন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ তখনই তিনি পেয়েছিলেন। এই ব্যক্তির নাম বজলে করীম, সম্পর্কে নজরুলের চাচা। এই রকম দুর্লভ যোগাযোগ ঘটে যাওয়ায় মিশ্র ভাষায় কবিতা লেখার ক্ষমতা কবি এই বয়সেই অর্জন করে ফেলেন।

নজরুলকে আর এক দিক থেকে শিক্ষিত করে তোলার ভূমিকা নিয়েছিল লেটোর দল। মনে রাখতে হবে তখনও গ্রামে গ্রামে রেডিও, টি.ভি. সিনেমা ইত্যাদির প্রভাব তেমনভাবে বিস্তার লাভ করেনি। তখনও বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া অঞ্চলের পল্লীবাসীদের মনোরঞ্জনের মাধ্যম ছিল লেটোর দলের পল্লী কবিদের ছন্দগাথায় রচিত নাটক, গ্রাম্য অভিনেতাদের নাচ-গান, বিভিন্ন দলের কবির লড়াই ইত্যাদি। খেয়াল রাখতে হবে এসবের দ্বারা গ্রামবাসীদের শুধু মনোরঞ্জনই হতো না, এতে জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ তো ছিলই তাছাড়াও এসবের প্রভাবে গ্রামবাসীদের মধ্যে গড়ে উঠতো ভালমন্দ বিচারধারা। এইভাবে তারা প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ পেত, নিরক্ষর হলেও মূর্খ থাকতো না মোটেই। নজরুল সেই বাল্য বয়সেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন পূর্ণ মাত্রায়। তিনি কেবলমাত্র দর্শক কিংবা শ্রোতা হয়ে না থেকে যোগ দিয়েছিলেন লেটোর দলে।

নজরুলের জনৈক আত্মীয় লিখেছেন,

> "বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না তাই নজরুল এই সব লেটোর দলে গান এবং নাটক রচনা করে দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর বয়স যখন বার-তের বৎসর মাত্র অথচ এ সময়ে রচনা তাঁর এত ভাল হতে লাগলো যে ক্রমে তিনি নিমসা, চুরুলিয়া এবং রাখাখুড়া এই তিনটি লেটো নাচের দলে নাটক রচনার ভার পেলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি গ্রামে বড় বড় ঐতিহাসিক নাটক ও মেঘনাদ-বধ নামে একটি নাটক রচনা করেন" (নজরুলের বাল্যজীবন-কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, কবিতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১)।

এই যে মাত্র বার তের বছর বয়সেই কবি ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটক লিখতে শুরু করে দিলেন এর জন্য যে পর্যাপ্ত শিক্ষা এবং অনুশীলন প্রয়োজন তার সুযোগ তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? এর উত্তর অতি সহজ। তখন পর্যন্ত পল্লী অঞ্চলে প্রবল প্রাণশক্তি নিয়ে বিদ্যমান লোকসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমগুলি তাঁকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিল। যা আজকের দিনে রেডিও-টিভি-চলচ্চিত্রের যুগে প্রায় অকল্পনীয়।

লোক সংস্কৃতির উপকরণ

এখন এই লোকসংস্কৃতি চর্চার বিষয়গুলি নিয়ে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন। নজরুলের বাল্য বয়সের রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা করলেই তৎকালীন লোকসংস্কৃতির অবয়বটিকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। কবি সেই বয়সে লিখেছিলেন "চাষার সং", "মেঘনাদ-বধ," 'শকুনি-বধ', 'দাতা কর্ণ,' 'রাজপুত্র', 'আকবর বাদশা' ইত্যাদির মতো অখ্যায়িকামূলক নাটক এবং প্রহসন। তাছাড়াও তিনি কবির লড়াইয়ের জন্য গান লিখেছেন। এই কবির লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক কবিতাও বানিয়েছেন অনেক। তাঁর 'চাষার সং' নাটকের দুটি গান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর মধ্যে রয়েছে রামপ্রসাদের ভক্তিমূলক গানের প্রভাব।

(১)

চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে
নামাজে জমি 'উগালে',
রোজাতে জমি 'সামালে',
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এই ভবেতে।..

(২)

জীবন যাপন করিতে
চাষ কর বিধি-মতে
রবে যদি সুখেতে
এ পৃথিবী মাঝার।

গান দুটি পড়লেই রামপ্রসাদের সেই বিখ্যাত ভক্তিমূলক, "মন তুমি কৃষি কাজ জাননা, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা' গানটির কথা মনে পড়ে যায়। অথচ কেমন অনায়াসেই শ্যামাসঙ্গীত ইসলামি সঙ্গীত হয়ে গেছে।

তরজা গানের ঢঙে কিছু বাঙ্গরীতি কিশোর নজরুল রচনা করেছিলেন, মিশ্রভাষা রীতিতে। এর মধ্যে আরবি-ফারসি ছাড়াও ইংরেজি শব্দের মিশ্রন দেখে মনে হয় ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব তখন গ্রামাঞ্চলেও বিস্তার লাভ করায় বাঙলার লোকসংস্কৃতির মধ্যেও ইংরেজি শব্দভাণ্ডার স্থান করে নিচ্ছিল। কবির লড়াইয়ে

প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে কিশোর কবি গেয়েছিলেন,

ওরে ছড়াদার that পাল্লাদার
মস্ত বড় mad
চেহারাটাও monkey like
দেখতে ভারী cad
monkey লড়বে বাবর কা সাথ
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত,
জানেনা ও, ছোট হলেও
হামভি lion cub।

তখন বাঙলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ তাদের কাব্য, নাটকে যে ধরনের ইঙ্গ বঙ্গ মার্কা রচনার ধারা তৈরি করেছিলেন তার প্রভাবেও যে গ্রামের লোকসংস্কৃতির উপর গিয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কিশোর নজরুলের কৌতুক রচনার কোন কোন নমুনা থেকে। এই রকম একটা কৌতুক রচনায় কবি লিখেছেন,

রবনা কৈলাসপুর
আই অ্যাম কালকাটা গোইং।
যত সব ইংলিস ফেসেন।
আহা মরি কি লাইটনিং॥
ইংলিস ফেসেন সবি তার
মরি কি সুন্দর বাহার।
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার
কামন ডিয়ার গুড মর্নিং॥

অর্থাৎ কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলিম ধর্ম, ঐতিহ্য, পুরাণ কথা-ইতিহাস ইত্যাদি নয়; আধুনিক ভাবধারাও নজরুল আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মাত্র বার তের বছর বয়সে। আর এই ভাবেই কবির মানসভূমিতে তৈরি হয়েছিল প্রকৃত বাঙালি সত্তার বুনিয়াদ।

বাঙালি সত্তার স্বরূপ

বাঙালি সত্তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের আগে কতকগুলি স্বীকৃত তথ্যের প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন। যেমন, একথা আজ সবাই জানেন যে খাঁটি আর্য রক্ত বাঙালিদের মধ্যে খুব কমই আছে। সৈয়দ, সেখ, মোগল পাঠান ইত্যাদি বহিরাগত মুসলমান বাঙালিদের মধ্যে আছে ঠিকই কিন্তু বাঙালি মুসলমান বলতে যে বিশাল জনগোষ্ঠীকে বোঝায় তাদের মধ্যে এই বহিরাগত তথাকথিত অভিজাতদের অন্তত রক্তের বিশুদ্ধতার কারণে আলাদা করে চিহ্নিত করা আর সম্ভব নয়। যাঁরা বংশ পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামান তাঁদের পক্ষেও রক্তের বিশুদ্ধতার প্রমাণ দেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি যারাই যখন বাইরে থেকে এসেছে তাদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি এমন কি তাদের বংশগতিকেও বাঙালি এমন ভাবে আত্মস্থ করে ফেলেছে যে সেটার মধ্যে বাঙালিয়ানা প্রকট হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি।

তাই বাইরে থেকে আসা বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাঙালিরা তাদের লৌকিক দেব-দেবী এবং ধর্মাচরণের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এমন চেহারা দিয়েছে যে পরবর্তী কালে বাঙলায় বৈদিক ধর্মের আদি রূপ উদ্ঘাটন গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে আছে। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। স্থানীয় লোকধর্ম, তন্ত্রসাধনা ইত্যাদির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বাঙলামুলুকে বৌদ্ধধর্ম নিয়েছিল একেবারেই ভিন্ন ধরনের চেহারা।

তথাকথিত আপ-কান্ট্রির মুসলমানরা যে বাঙালি মুসলমানদের ইসলামের প্রকৃত অনুসারী বলে গণ্য করতে চাইত না তার কারণও এই মুলুকের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাড়াবাড়ি রকমের বাঙালিয়ানা। ইসলামও এখানকার লোকবিশ্বাস এবং লোকাচারের সঙ্গে মিলেমিশে এমন চেহারা নিয়েছিল যে তাও হয়ে উঠেছিল বাঙালির নিজস্ব ধর্ম। যার সঙ্গে আপ-কান্ট্রির মুসলমানদের ধর্মের মিল নেই।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ একেবারে ঊনবিংশ শতকে এসে ফরাজি ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাবে ইসলামপন্থীদের মধ্যে বিশুদ্ধিকরণের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু ইসলামের সঙ্গে স্থানীয় লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকসাধনা ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যেসব নতুন নতুন লোকধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল তার প্রভাব গণমানস থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। বাঙালির প্রকৃত ধর্মচেতনা তাই, ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ কিংবা ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধতার মধ্যে নিহিত নয়। তাদের ধর্মভাবনার স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায় বাংলামুলুকের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা লোকধর্মগুলির মধ্যে।

বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিল যেমন কিছু পরিমাণে আছে তুলনায় গরমিল অনেক বেশি। সবচেয়ে বড় গরমিল হল যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে সবসময়ই অন্য ধর্মগুলির তুলনায় নিজের স্বাতন্ত্র্য সোচ্চার রাখতে হয়। ঠিক তার বিপরীতভাবে বাঙলার লোকধর্মগুলি সব সময় সমন্বয়বাদী। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য জাহির করার দিকে তাদের তৎপরতা খুবই কম। তাই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ভাবে, দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন লোকধর্মের অনুসরণকারীদের মধ্যে এই বাঙলায় কোন সংঘাত ছিল না। অথচ বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুসরণকারীদের ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় বিশ্বাসীদের মধ্যে সংঘাতময়। বহু সময়েই সেই সংঘাত রচনা করেছে ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়। হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-ইসলাম ইত্যাদি সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুসরণকারীদের ইতিহাসই হয় নিজেদের আভ্যন্তরীণ নয় তো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত রক্তপাত-হত্যাকাণ্ডের ঘটনার দ্বারা কলঙ্কিত।

অথচ এই বৈদিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম এমনকি খৃস্টান ধর্মও যখন বাঙলায় এল দেখা যাচ্ছে এদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণায় উন্মুখ মারমুখী চেহারা পাল্টে গেছে। এদের অনুসরণকারীদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় ভিন্নতা দেখা দিলেও তা কোন সময়েই সংঘাতের চেহারা নিচ্ছে না।

এর অর্থ হল বাঙালি বৈদিক-ধর্মের অনুসারী, বৌদ্ধ ইসলামপন্থী কিংবা খৃস্টান কিনা সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা বাঙালির একটা নিজস্বতা আছে, সেখানে সমস্ত রকম ধর্ম বিশ্বাস মত ও পথের সমন্বয় ঘটে যাচ্ছে। অথবা এভাবেও বলা যায়, ধর্মবিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে এক ধরনের বাঙালিয়ানা আরোপিত হচ্ছে। এই বাঙালিয়ানায় মিল থাকায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী হলেও তাদের একসঙ্গে মিলে মিশে থাকতে কোন অসুবিধা হয় না। মনে রাখতে হবে এখানে বলা হচ্ছে কেবলমাত্র নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের কথা। বাংলার তথাকথিত উচ্চবর্গীয় হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে যাঁরা বহিরাগত, তাঁদের এই মুলুকে আগমন শাসক হিসাবে কিংবা শাসকবর্গের অনুগ্রহ পুষ্ট হয়ে তাঁদের স্বার্থের সংরক্ষক হিসাবে। এদের সংখ্যা কালে কালে অনেক বেড়েছে ঠিকই, কারণ নিম্নবর্গীয়রাও অনেকেই আভিজাত্যপ্রাপ্তির লোভে পদবী পাল্টে এই বর্গে ঢুকে পড়ার তাল করেছেন, তবু আজও একথা সত্যি, উচ্চবর্গীয়দের ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং স্বভাব-চরিত্র দিয়ে বাঙালিয়ানার আসল মর্ম বোঝা যায় না।

প্রকৃত বাঙালিরা অর্থাৎ তথাকথিত নিম্নবর্গীয়রা যেসব পালাগান, পুঁথি পাঁচালি ইত্যাদি চর্চা করত, সবকিছুর মধ্যেই দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী মানুষদের সম্মিলিত অংশগ্রহণ। মুসলমান কবি অনায়াসেই হিন্দু দেব-দেবীর কাহিনী নিয়ে পালা গান, পুঁথি ইত্যাদি লিখতে পারতেন; আবার হিন্দু কবির ক্ষেত্রেও মুসলিম ঐতিহ্য অজানা ছিল না। এইসব কবির হিন্দু এবং মুসলিম ঐতিহ্য ব্যবহার করার মধ্যেও বাঙালিয়ানা প্রকাশ পেত। ঐতিহ্যের যেসব উপকরণ সংগৃহীত হত বহিরাগতদের কাছে থেকে, বাঙালি কবিরা নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে সেগুলোর চেহারা পাল্টে দিত। এইভাবে বহু আর্য দেব-দেবী, ইরান কিংবা আরবের পুরাণকথার, এমনকি ইতিহাসেরও বহু নায়ক-নায়িকা কিঞ্চিৎ কিংবা অত্যধিক রঙ বদল করে হয়ে পড়েছিল বাঙালির ঘরের মানুষ। হিন্দু এবং মুসলমান কবিদের সম্মিলিত ঐতিহ্যচর্চার এই ধারাটা বিদ্যমান ছিল মোটামুটি অষ্টাদশ শতক অবধি। ঊনবিংশ শতকেও বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে এই সম্মিলিত ঐতিহ্য চর্চার ধারা উপধারা একেবারে মিলিয়ে যায়নি। এই শতকে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব যে "যত মত তত পথ"—এর কথা বলেছিলেন, ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রকৃত বাঙালির অর্থাৎ তথাকথিত নিম্নবর্গীয়দের প্রাণের বাণী ছিল এটাই।

বাঙালি কীভাবে পেল সমন্বয় চেতনা

এই জিজ্ঞাসার সঠিক জবাবের জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। তবে মোটামুটি এইটুকু অনুমান করা যায় যে কোন একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর প্রাবল্য এবং তজ্জনিত জাতভিমান বাঙালিদের মধ্যে না থাকাটাই এর প্রধান কারণ। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা নিয়ে বাঙালিকে কোনদিনই মাথা ঘামাতে হয়নি। সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব এবং পশ্চিমের যারাই এই উর্বর ভূখণ্ডে এসে বসবাস করতে চেয়েছে তাদের পৃথক জাতিসত্তা রক্ষা করে চলার কোন প্রয়োজন ঘটেনি। বাস্তবিক বাঙালি কোন সময়েই বহিরাগতদের কোন রকম বাধা দিয়েছে এই ইতিহাস প্রায় নেই বললেই চলে। খাদ্য বস্ত্র এবং জীবনধারণের অন্যান্য সামগ্রী বাঙালির ছিল অঢেল। তাই বাইরের লোক এসে পড়লে নিজেদের জীবন ধারণের উপকরণে টান পড়তে পারে এমন দুশ্চিন্তা বাঙালিকে করতে হয়নি। সুতরাং সবার জন্য দ্বার ছিল উন্মুক্ত।

'ধনধান্য পুষ্পভরা' বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রাচীন কাল থেকেই কৌতূহল ছিল বিশ্বব্যাপী। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে যা জানা যায় তাতে বুঝতে অসুবিধা হয়না, কেন ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ দলে দলে এসে এখানে বসবাস করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

বাংলার ধনৈশ্বর্য বিশেষ করে এখানকার উন্নত মানের পণ্যদ্রব্যের খ্যাতি প্রাচীন কাল থেকেই বিদেশের পর্যটকদের বারবার আকর্ষণ করে এনেছে। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে বাংলার তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসেছেন গ্রিক পর্যটক প্লিনি। দ্বিতীয় শতকে টলেমি এসেছেন গঙ্গারিডি বা গৌড়ভূমিতে। পঞ্চম শতকে আবার তাম্রলিপ্তে এসেছেন চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। সপ্তম শতকে হিয়েন-সাঙ্ এসেছেন মহাস্থানগড়, সমতট, কর্ণসুবর্ণ এবং তাম্রলিপ্তে। তারপর সারা মধ্যযুগ ধরে ইউরোপ আফ্রিকা আর এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন বহু পর্যটক। এঁরা প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন বাংলা মুলুকের সমৃদ্ধির কথা।

ঐশ্বর্যময়ী বাংলা সম্পর্কে এদের কারো কারো উক্তি তো প্রবাদ বাক্যে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন মধ্যযুগের পর্যটক ইবন বতুতা লিখেছেন, বাংলা হল, 'দোজাখ-ই পুর নিয়ামত', অর্থাৎ ভাল ভাল জিনিসের নরক। (H.A.R.GIBB edited Ibn Battuta—Travels in Asia and Africa, London, 1957)এই বাংলাদেশ বসবাসের পক্ষে এমনই মনোরম ছিল, জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ এখানে এতই সুলভ আর লোভনীয় ছিল যে বহিরাগতরা এখানে এসে আর ফিরে যেতে চাইত না। সেই কারণেই পর্যটক বার্নিয়ার লিখেছেন, "Bengal has hundred gates open for entrance, but not one

for departure." বাংলায় প্রবেশের শত দরজা, কিন্তু বেরোবার দরজা একটাও নেই। (S.M Taifoor, glimpses of Dhaka—Dhaka 1952) বাংলায় উৎপন্ন ফসল এবং শিল্পসামগ্রীর প্রাচুর্য আর মনোরম আবহাওয়া দেখে পর্যটক ভারথেমা বলেছেন বাংলা হচ্ছে, "The best place in the world to live in" (J.N.Dasgupta, Bengal in the Sixteenth Century A.D.Calcutta, 1914)

বাংলায় জীবনধারণের উপকরণ তথা পণ্যের স্বল্পমূল্য মধ্যযুগের পর্যটকদের বিস্মিত করত। এই ব্যাপার বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন ইবন বতুতা (১৩৪৬ খ্রি.), ডুয়ার্তে বারবোসা (১৫১৪ খ্রি.), সিজার ফ্রেডরিক (১৫৬৭ খ্রি.), সেবাস্টিন মানরিক (১৬২৮ খ্রি.) টমাস বাওরি (১৬৬৯ খ্রি.) প্রভৃতি পর্যটকবৃন্দ। ইবন বতুতা লিখেছেন, "এমন দেশ আমি দেখিনি যেখানে খাদ্যদ্রব্য এত সস্তা হতে পারে।" তাঁর প্রায় একশো বছর পরে ঐ একই ভাষায় ইতালির পর্যটক ভারথেমা (১৫০৫ খ্রি.) লিখেছেন, "I never saw a country in which provisions were so cheap." (Bengal in the Sixteenth Century A.D.) ভারথেমার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আর এক ইতালিয়ান পর্যটক সিজার ফ্রেডরিক (১৫৬৭) সন্দীপের পণ্যদ্রব্যের সস্তা দাম দেখে লিখেছেন, "We were amazed at the cheapness there ..." (Blochmann, Contribution to the Geography and History of Bengal) বাংলায় মধ্যযুগে প্রায় চারশো বছর ব্যাপী পর্যটকবৃন্দ পণ্যদ্রব্যের যেসব মূল্যতালিকা উল্লেখ করেছেন, তার তুলনামূলক বিচার করলে বোঝা যায় প্রাচুর্যের কখনও ঘাটতি পড়েনি। তাই পণ্যমূল্যের দামেরও তেমন কোন হেরফের ঘটেনি। (দ্র.তুলনামূলক পণ্যতালিকা, বাংলায় বিদেশী পর্যটক-ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ৮—১০)

তাই এই প্রাচুর্যের দেশে বহিরাগতদের কখনই এমন অবাঞ্ছিত মনে হয়নি যে লড়াই করে তাদের আগমনে বাধা দিতে হবে। বসবাসের উদ্দেশ্যে যাঁরা বাংলায় এসেছিলেন তাঁদের এখানে ঠাঁই পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। বরং যারা লুণ্ঠতরাজের মতলবে আসত তাদের হাতেই বাংলার অধিবাসীদের দুর্গতির একশেষ হয়ে যেত। কারণ আরাম আয়াসে থাকতে থাকতে বাঙালির অবস্থা এমন হয়েছিল যে লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধেও তেমন কোন বলিষ্ঠ প্রতিরোধ তারা গড়ে তুলতে পারত না। এই কারণেই মগ, হার্মাদ কিংবা বর্গী হামলায় বিভিন্ন সময়ে বাঙালিজীবন পর্যুদস্ত হয়েছিল।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, প্রাচুর্যের দেশ বাংলায় বসবাসের উদ্দেশ্যে কিংবা ভাগ্যান্বেষণে বাইরে থেকে যারাই এসেছে এখানকার অধিবাসীরা তাদের ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেনি। কারণ, জীবনধারণের উপকরণে টান পড়ে যাওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। বাংলার মাটি অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় ফসল ফলানোর জন্য এখানকার মানুষকে খুব বেশি মেহনৎ করতে হতো না। কারিগর হিসাবে বিশেষ করে তাঁত শিল্পে বাঙালির দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। বাংলার মসলিন ছিল ভুবন বিখ্যাত। মধ্যযুগে পর্যটকদের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে সারা পৃথিবী থেকে বণিকেরা আসত বাংলার কৃষিজাত এবং শিল্পজাত পণ্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য।

ইবন বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী 'দোজখ-ই-পুর-নিয়ামত' বা 'প্রাচুর্যের দোজখ' এই বাংলার অধিবাসীদের একটা বড় অংশকেই জীবিকার জন্য বেশি সময় ব্যয় করার প্রয়োজন না থাকায় ফলে তাদের ভাবনা চিন্তার অবকাশ ছিল অনেক বেশি। তারা তাই বাইরে থেকে যারাই এসেছে তাদের সম্পর্কে জানবার, তাদের ধর্মচিন্তা এবং ধ্যান ধারণাকে অনুধাবন করবার আগ্রহ দেখিয়েছে অনেক বেশি পরিমাণে। আর যা কিছু বাঙালির কল্পনা এবং আগ্রহকে উদ্দীপিত করেছে, সেটাকেই সে নানা ভাবে রপ্ত করার চেষ্টা করেছে। এইভাবে তার ধর্ম এবং সংস্কৃতি ভাবনায় এসেছে সমন্বয়। বহিরাগতদের কাছ থেকে বাঙালি যা কিছু শিখেছে সেগুলিকে সে নিজের পূর্বধারণার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এমন এমন চেহারা দিয়েছে যে তা কালক্রমে হয়ে গেছে বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। নজরুল তাই অনায়াসেই বলতে পেরেছেন,

"সকল কালের, সকল দেশের, সকল মানুষ আসি
এক মোহনায় দাঁড়ায়ো শুন এক মিলনের বাঁশী।"

'সাম্যবাদী' কবিতায় তিনি যে সামের গান গেয়েছেন তার মধ্যেও এই চেতনাই প্রবল—

"গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলীম-ক্রীশ্চান
গাহি সাম্যের গান"

প্রাক বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বৈদিক ধর্ম, বৌদ্ধ জৈন ধর্ম এমন কি ইসলাম ধর্মও বাংলামুলুকে এসে এমন চেহারা নিয়েছে যে পরবর্তী কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে হিন্দু কিংবা ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বাঙালিকে প্রকৃত হিন্দু কিংবা প্রকৃত মুসলমান বলে স্বীকার করতে দ্বিধাবিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে, বাংলার অধিবাসীদের তথাকথিত উচ্চবর্গীয় কোন কোন অংশ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রয়াস শেষ পর্যন্ত চালিয়ে গেছে।

সমন্বয় চেতনায় নানা বিঘ্ন এবং বিপত্তি

উনবিংশ শতকে ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে এবং নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে

হিন্দুত্বের নবমূল্যায়নের ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের মনোভাব প্রাবল্য লাভ করলে, ধর্মীয় স্বতন্ত্রবাদীদের সংখ্যা সমাজে বেড়ে যায়। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত বাংলা মুলুকে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় সমন্বয়বাদের ধারাই ছিল প্রবল। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকেও বোঝা যায় বাঙালির ইতিহাসের সেই অধ্যায়গুলিই সবচেয়ে সমৃদ্ধ যখন কোন রকম বহিরাগত আভিজাত্যের চেতনা তাদের সমাজ-জীবনের মূল ধারাকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। জাতপাতের ভেদাভেদ-চেতনা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকীর্ণ করে তোলেননি। এই সমন্বয়বাদী চেতনা থেকেই বাঙালি কবি পৌঁছেছিল সেই সত্যে যেখানে— "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। এখানে 'মানুষ' হয়ে গিয়েছিল ঈশ্বরেরই নামান্তর। বাঙালি কবির সাধনার এই ধারারই সার্থক উত্তরসূরি নজরুলের কণ্ঠে মানুষের উদ্দেশ্যে তাই আমরা শুনি:

"তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ।
এই কন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম গান।
মিথ্যা শুনিনি ভাই—
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।"

সত্যি কথা বলতে কি বাঙালিত্বের প্রকৃত বুনিয়াদ প্রোথিত রয়েছে তার সমন্বয় চেতনার মধ্যে। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা বিরোধী এই চেতনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাঙালির মূল প্রাণশক্তি। মনে রাখতে হবে বাংলার জনজীবনের একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ না করলে সমন্বয় চেতনার এই ফল্গুধারার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। নজরুল ছিলেন একেবারে সেই অন্তঃপুরের মানুষ। তাঁকে তাই ফল্গুধারার সন্ধান করে ফিরতে হয়নি, কিংবা চেষ্টা করে সমন্বয়চেতনা আয়ত্ত করতে হয়নি। তিনি শুধু আপন স্বরূপ জেগে উঠতে পেরেছিলেন পরিপার্শ্বিক শিক্ষার প্রভাবে।

কেউ যদি বর্তমানে অর্থাৎ এই বিংশ শতকের শেষপাদে এসে বাঙালি জনজীবনের অন্তঃপুরের এই সমন্বয় চেতনার প্রবাহ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হন, তাহলে তিনি পরম বিস্ময় দেখবেন ইংরেজ শাসনের সময় থেকেই এই ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে বর্তমানে শুষ্কপ্রায়। সম্ভবতঃ কবি কাজী নজরুল ইসলামই বাঙালির এই সমন্বয় চেতনার সর্বশেষ স্বাভাবিক ফসল। স্বাভাবিক বলছি এই কারণে যে তারপর যাঁরা হিন্দু মুসলিম সমন্বয়পন্থী হয়েছেন তাঁদের সেই ধ্যানধারণা ছিল চেষ্টাকৃত, বাঙালি জনজীবনের অন্তঃপুরের ফল্গুধারা দ্বারা প্রভাবিত নয়। কারণ সেই ধারাই ততদিনে শুকিয়ে গেছে, কিংবা কোথাও কোথাও অত্যন্ত শীর্ণ অবয়বে বর্তমান থাকলেও হালের সমন্বয়পন্থীরা সেই খবর খুব কমই রাখতেন। তাই তাঁদের ঐক্যপন্থায় জোড়াতালির ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রকট। নজরুলের মধ্যে কিন্তু কোন জোড়াতালি ছিল না। এখানে হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারটাই কীরকম গৌণ হয়ে গেছে। নজরুলের চেতনায় উদ্দীপিত হতে পারলে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু ব্যাপারটাই মন থেকে মুছে যেতে চায়। হৃদয়কন্দরে বেজে ওঠে কবির সেই উদাত্ত ঘোষণা:

"হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন,
কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।"

নজরুল বর্ণিত এই ডুবন্ত "মানুষ" বিশ্বমানবতার অংশীদার হলেও বাঙালিও বটে। কারণ কবি প্রথমে ছিলেন জাতীয়তাবাদী, বাঙালি জাতীয়তাবাদী, তারপর বিশ্বমানবতাবাদী।

যেহেতু বাঙালি চেতনার মূল প্রবাহ থেকে নজরুলের বিকাশ তাই তাঁর ভাষাতেও রয়েছে অকৃত্রিম সমন্বয়ধর্মীতা। এবং এই গুণেই ভাষা হয়ে উঠতে পেরেছে দুর্বার প্রাণশক্তির বাহন। মনে রাখতে হবে নজরুল কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। তাই তৎকালীন এই রাজধানীকেন্দ্রিক সংস্কৃতি চর্চার জনজীবনবিচ্ছিন্নতার দ্বারা তিনি— আক্রান্ত হননি। রাজধানীতে জনজীবন থেকে দূরে থাকার কারণে কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীবাদের ভাষায় এসেছে অনেকখানি কৃত্রিমতা। ভাষাকে তাঁরা এমন চেহারা দিয়েছেন যে বাঙালি চাষীর ঘরের ছেলেকে তাদের ভাষা আয়ত্ত করতে হয় অনেকখানি বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করার ঢঙে। তথাকথিত শিক্ষিতজনের ভাষাকে প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করায় নজরুলের পক্ষেও এই কৃত্রিমতা পুরোপুরি বর্জন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনি কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিতজনের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার কৃত্রিমতার খোলসকে অনেকখানি ছাড়িয়ে ফেলতে পেরেছিলেন।

ইংরেজের দেওয়া পাঠক্রম দ্বারা শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা দ্বারা পুষ্ট কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ যেমন হয়ে পড়েছিল ইংরেজ তথা ইউরোপিয়দের নকলনবীশ আর একটা অংশ ক্রমেই ঝুঁকছিল মূলতঃ বৈদিক হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের দিকে। রামকৃষ্ণ যত মত তত পথের কথা বললেও বিবেকানন্দের প্রচারের দ্বারা মূলতঃ মদৎপুষ্ট হয়েছিল হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী দ্বারা যে জাতীয়তাবাদের জয়গান গেয়েছিলেন তা ছিল পুরোপুরি হিন্দু ঐতিহ্যনির্ভর। পাশ্চাত্যের নকলনবীশ কিংবা হিন্দুপুনর্জাগরণবাদীদের প্রভাবে কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিরা প্রায় ভুলেই গেল বাংলার আপামর জনসাধারণের ভাষা, তাদের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার কথা। নজরুলের মানসিক বিকাশ

কলকাতার আবহাওয়ায় ঘটেনি। তিনি যখন তৎকালীন কলকাতার বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডলে পদার্পণ করেন ততদিনে তাঁর কবিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে গেছে।

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় বাঙালিত্ব হচ্ছে এক ধরনের সমন্বয়বাদী চেতনা। বহিরাগতদের সংস্পর্শে যখনই সে নতুন কোন ধর্ম বা সংস্কৃতির পরিচয় পেয়েছে সেটাকে সে গ্রহণ করেছে আপন বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে, নিজস্ব ধরনে। বাঙালিত্বের বৈশিষ্ট্য এইভাবেই বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ হয়েছে। এর সঙ্গে তাল রেখে বাংলা ভাষার প্রভাবাধীন বিভিন্ন আঞ্চলিক ডায়ালেক্টগুলিও সমৃদ্ধতর হয়েছে। কিন্তু বহিরাগতদের সবাই বাঙালির সমন্বয়বাদী চেতনার অংশীদার হয়ে উঠেছিল এমন নয়।

বিশেষ করে সেন রাজত্বের কালে যেসব কুলীন ব্রাহ্মণেরা এখানে বসবাসের জন্য এসেছিল এবং দীর্ঘ মুসলিম শাসনের আমলে সৈয়দ, সেখ, মুঘল, পাঠান গোত্রীয় যেসব মুসলমানের আগমন ঘটেছিল, এরা সবাই বাঙালিত্বের অংশীদার হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ শুরু থেকেই নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে এরা ছিল তৎপর। বাংলা মুলুকের আপমর জনসাধরণেরও এই মুষ্টিমেয় অভিজাতদের নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না। কারণ বাংলার সমৃদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি আপনাতে আপনি তুষ্ট ছিল। রাজন্যকে সময় মত নির্ধারিত কর দিতে পারলেই রাজার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চুকে যেত। রাজারা যে যুদ্ধবিগ্রহ করত তার বেশির ভাগটাই ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থে। বহিরাগত দস্যুরা যখন প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত, দেশের রাজা দস্যু প্রতিরোধের জন্য কখনও কখনও বেশ সক্রিয় ভূমিকা নিত ঠিকই, কিন্তু সেটাও তারা করত মূলত নিজেদের স্বার্থবোধ থেকে। যেমন, শায়েস্তা খাঁ মগ নামক জলদস্যুদের ঠেকিয়েছিলেন। নবাব আলিবর্দি খাঁ প্রতিরোধ করেছিলেন বর্গীদের। এসব করার কারণ, দস্যুরাই যদি প্রজাদের সব কিছু লুটে পুটে নিয়ে যায় তাহলে রাজন্যদের জন্য খাজনা আসবে কোথা থেকে? তাই বাংলামুলুকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে স্বয়ংসম্পর্ণ গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে আপামর বাঙালির জীবনধারা ছিল একরকম, আর রাজা এবং রাজানুগৃহীতদের নিয়ে রাজধানীর জীবন ছিল আর একরকম। বাঙালির পল্লীজীবন রাজধানীর উপর নির্ভরশীল ছিল না। তাই সেখানে তথাকথিত অভিজাতরা কী করছে না করছে সেসব নিয়ে বাঙালির মাথাব্যথা ছিল না। এই কারণে বাংলার পল্লীসংস্কৃতি এবং রাজধানীর সংস্কৃতি প্রবাহিত হত সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে। বাঙালির সমন্বয়বাদী চেতনাসম্ভূত সংস্কৃতি বলতে আমরা বোঝাতে চেয়েছি এই পল্লী সংস্কৃতিকে। নজরুলের কবিসত্তার প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছিল এই পল্লীসংস্কৃতির প্রভাবেই। যদিও বংশধারার সূত্রে নজরুলও ছিলেন বহিরাগত মুসলমানদেরই একজন।

বহিরাগতদের মধ্যে যাদের পক্ষে রাজধানীতে কিংবা সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি, যাঁরা পল্লী বাংলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের পক্ষে বাঙালি না হয়ে ওঠাটা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবুও হয়ত অনেকেই মনে প্রাণে বাঙালিত্বকে স্বীকার করেনি। আবার অনেক তথাকথিত অন্ত্যজ বাঙালিও কেবলমাত্র অর্থকৌলিন্যের জোরে হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই বহিরাগত রাজানুগৃহীতদের দলভুক্ত হয়ে অভিজাত হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। এই দেশজ তথাকথিত অভিজাতদের সংখ্যা কিছু কম নয়। এত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কিংবা সেখ, সৈয়দ বাইরে থেকে কখনও আসেনি। এর বেশির ভাগই দেশজ নাম ভাঁড়ানো অভিজাতদের দল। সময় এবং সুযোগ মত বাঙালিত্বকে এরাই সবচেয়ে আগে বর্জন করেছে। বংশসূত্রে নজরুল বহিরাগত অভিজাতদের একজন হলেও সম্ভবতঃ কঠোর দারিদ্র্যের কারণেই স্বাতন্ত্র্যাভিমানী অভিজাত মানসিকতার অংশীদার না হয়ে তিনি পল্লী বাংলায় আবহমানকাল ধরে লালিত বাঙালি মানসিকতার অংশীদার হয়ে উঠেতে পেরেছিলেন। তাই অনায়াসেই তিনি বলতে পেরেছেন:

মুর্খরা সব শোনো,/

মানুষ এনেছে প্রভু! গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো! /আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ/কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, কবীর, বিশ্বের সম্পদ,/আমাদেরি এঁরা পিতা পিতামহ, এই আমাদের মাঝে/তাঁদেরি রক্ত কম বেশি করে প্রতি ধমনীতে বাজে।/আমরা তাঁদেরি সন্তান, জ্ঞাতি, তাঁদেরি মতন দেহ।/কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ।

বাঙালি জীবনের অবক্ষয়

ইংরেজ আমলে এসে গ্রাম এবং শহরের স্বতন্ত্র জীবনধারা যখন রইল না, যখন দেখা গেল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পালা বদলে ফলে গ্রাম ক্রমেই শহরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় বাঙালি জীবনের অবক্ষয়। ইংরেজ বণিকদের শোষণমূলক মনোবৃত্তি এই কাজটাকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। এই বণিকেরা বাইরে থেকে আনা তাদের পণ্যের বাজার সৃষ্টির অভিলাষে গ্রামবাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙে দেয়ার মতলবে যতরকম নিষ্ঠুর পন্থা থাকতে পারে সবই অবলম্বন করেছিল। তাঁতীরা যাতে তাঁত বুনতে না পারে, বিশেষ করে ঢাকাই মসলিনের মত সূক্ষ্মবস্ত্র তৈরি করতে অক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যে দক্ষ কারিগরদের বুড়ো আঙুল কেটে দেয়া হয়েছিল। এসব তথ্য সবার জানা। বাঙালির নিজস্ব অর্থনীতিকে ধ্বংস

করার মতলবে এর চেয়ে নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের উদাহরণ আর কিইই বা থাকতে পারে। চাষবাস তুলে দিয়ে বাঙালি চাষীকে ইংরেজ বণিকেরা ফসলি জমিতে নীল চাষে বাধ্য করেছিল। কেউ অবাধ্য হলে তার কপালে কী ধরনের দুর্ভোগ জুটত তার বর্ণনাও 'নীলদর্পণ'-এর কল্যাণে সবাই অবহিত। এই ভাবেই বাঙালির স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি দ্রুত ভেঙ্গে পড়তে থাকে। জমিদারি শোষণ নিপীড়নও বাড়তে থাকে দ্রুত লয়ে। কারণ ইংরেজ বণিক সরকারের নতুন ধরনের খাজনা আদায়ের ব্যবস্থাপনার কারণে যেসব নতুন নতুন জমিদারের উদ্ভব ঘটতে থাকে তারা বেশির ভাগই ছিল শহরের মানুষ। ইংরেজ বণিকদের দালালি করে অগাধ অর্থের মালিক হয়ে সেই অর্থের জোরে তারা পুরাতন সব জমিদারি কিনে নিতে থাকে। গ্রাম বাংলার প্রতি এদের এতটুকু মমত্ব বোধ ছিল না। জমিদারি ছিল এইসব নয়া বেনিয়া জমিদারদের কাছে মুনাফার জন্য অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্র। শিল্পক্ষেত্রে তাদের এই অর্থ বিনিয়োগ প্রয়াস বাধা প্রাপ্ত হচ্ছিল ইংরেজ বণিকদের দ্বারা। তাই অর্থলগ্নীর ক্ষেত্র হিসাবে এইসব মুৎসুদ্দিরা বেছে নিয়েছিল জমিদারি গুলিকে। জমিদার হিসাবে এদের একমাত্র করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল জবরদস্ত সব অত্যাচারী কর্মচারী নিযুক্ত করে প্রয়োজন হলে প্রজাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েও কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা। গ্রামের রাস্তাঘাট, কৃষিতে জলসেচ, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে এইসব নয়া জমিদার কোন রকম কর্তব্য পালন না করলেও তাদের ভয় পাবার কিছু ছিল না। কারণ ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা এবং বিচার ব্যবস্থা ছিল এদের স্বার্থের প্রহরী। এই স্বার্থসর্বস্ব জমিদারদের অত্যাচারে গ্রামবাংলার অর্থনীতি আরও দ্রুত ভেঙে পড়ে। গ্রামের মানুষ বাধ্য হয়ে জীবিকার সন্ধানে শহরে দিকে পা বাড়াতে থাকে। কবি নজরুলকেও বালক বয়সেই এই কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু পল্লীবাংলার সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির যতটুকু অবশেষ তখনও ছিল তার দ্বারাই সেই বাল্য বয়সেই নজরুলের কবিসত্তা প্রভাবিত হয়েছিল প্রভূত পরিমাণে। তাই সেই বয়সেই 'রাজপুত্র' পালাগানে তিনি স্বদেশপ্রেমের অনুরণন তুলে লিখতে পেরেছিলেন:

চলো ওহে মন্ত্রীপূত স্বরাজ্যে ফিরে
ঈশ্বরের অপার মহিমা দেখি নাই দেশ-দেশান্তরে।
অসংখ্য গ্রাম-নগরাদি,
দুর্গগুহা পর্বত আদি, কত নদ-নদী
দেখিলাম, কিন্তু নিরবধি স্বদেশ জাগিছে অন্তরে।

গ্রামবাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ায় গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থাও ভেঙে পড়তে থাকে। মনে রাখতে হবে এই গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থার বেশির ভাগটাই তখন ছিল এখনকার ভাষায় প্রথা-বর্হিভূত বা নন কনভেনশনাল শিক্ষা। ইংরেজ আমলে যেসব নতুন নতুন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির বিকাশ ঘটল সেসবের শুরু, কলকাতাকে কেন্দ্র করে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে ইংরেজের দেওয়া শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে ভাল ভাল চাকরি-বাকরি পাওয়া তখন অসম্ভব ব্যাপার। তাই জীবিকার সন্ধানেই শুধু নয় শিক্ষার সন্ধানেও গ্রামের মানুষকে শহরে আসতে হল। শহরে ততদিনে দালাল শ্রেণীর লোকদের রমরমা। বাঙালির বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে এদের কোন যোগ ছিল না। আগে থেকেই বাংলামুলুকে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে যেসব বহিরাগত তথাকথিত অভিজাতরা বসবাস করত তারা বাঙালির কেউ ছিল না। ইংরেজের কলকাতাতেও দেখা গেল বাঙালির এই অমিত্ররাই আগে থেকে আসর জমিয়ে বসে আছে। এই অমিত্রদের অনুগ্রহ ছাড়া গ্রামবাংলার হিন্দু-মুসলমান কোন বাঙালির পক্ষেই জীবনের সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলনা। কিন্তু এই অমিত্ররা গ্রামবাংলার সমন্বয়বাদী বাঙালি সংস্কৃতির কোন খবরই রাখত না। এরা হয়ে উঠেছিল হয় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণকারী নয়ত হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী। মুসলমান অভিজাতদের একটা অংশ অবশ্য ইংরেজদের সঙ্গে প্রারম্ভিক কিছু দ্বন্দ্বের ফলে একটু ভিন্নরকম কারণে ইসলামিক পুনর্জাগরণবাদীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এদের প্রভাব গ্রামবাংলাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল দ্রুত বেগে। ওয়াহাবি এবং ফরাজি আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিগণ সবাই এই খবর রাখেন। তথাকথিত এইসব পুনর্জাগরণবাদী (হিন্দু মুসলিম দু তরফেরই) এবং পাশ্চত্যের অন্ধ অনুসরণকারীদের চাপে পড়ে সমন্বয়বাদী বাঙালি সংস্কৃতির নাভিশ্বাস উঠতে লাগল। কবি নজরুলের মানসিক বিকাশ কলকাতাকেন্দ্রিক না হওয়ায় এবং পল্লীবাংলার যে অঞ্চলে ছিল তাঁর বাল্য বয়সের বিচরণক্ষেত্র সেখানে মুসলমান পুনর্জাগরণবাদীদের তেমন কোন প্রভাব না পড়ায়, তিনি বাঙালি সত্তার মর্মবস্তুকে ধারণ করতে পেরেছিলেন অনেকখানি অবিকৃত রূপে। তাই তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর কাব্যে, তাঁর গানে, তাঁর ব্যবহৃত ভাষায় হিন্দু মুসলমান ব্যাপারটা এমন ভাবে মিলে মিশে যেতে পেরেছিল যে সেটাকে আলাদা করে চিহ্নিত করার যে কোন প্রয়াসকে নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়।

বাঙালির আপন সত্তার প্রকৃত পরিচয়

নজরুল কাব্যের ভাবসম্পদ এবং ভাষায় বাঙালির সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি সবচেয়ে জোরাল অভিব্যক্তি পেয়েছিল বলেই তা এতখানি প্রাণবন্ত। তাঁর দুর্বার সমন্বয়বাদী ভাবধারায় আপ্লুত হয়ে বাঙালি বারবার ফিরে পায় আপন সত্তার প্রকৃত পরিচয়। যেখানে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু নেই, অথবা আছে সবাই, কিন্তু সবার উর্ধ্বে আছে মানুষ।

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'। বাঙালি তার সমন্বয়বাদী চেতনার দ্বারা বারবার উপনীত হয়েছে এই পরম সত্যে।

বাঙালি যখন প্রথম প্রথম ইংরেজদের হাত থেকে দেশ স্বাধীন করার কথা ভেবেছিল তখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার জন্যই দেশ স্বাধীন হবে এমন কথা স্পষ্ট করে না ভাবলেও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের প্রসঙ্গ তখনও তেমন প্রাবল্য লাভ করেনি। নজরুলের বাঙালি চেতনা তাই জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্দীপিত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতার বাণী তাই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির চেতনার জগতকে আলোড়িত করেছে, তাঁর গানে বাঙালি উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং মরণপণ সংগ্রামে এগিয়ে গেছে। নজরুলের এইসব দেশাত্মবোধক কাব্যের ভাব ভাষা, চিত্রকল্প ইত্যাদি একটু তলিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করলেই বোঝা যায় হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়বাদী বাঙালি সংস্কৃতি কেমন গতিশীল স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি পেয়েছে। আর যে কারণেই এইসব কাব্যের বাণী বাঙালি হৃদয়ের একেবারে মর্মে গিয়ে বিঁধেছিল। কিছু নমুনা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না:-

"সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,/নেই কি রে কেউ সত্য সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?/শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,— /বজ্র-হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?/নাজাত-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা/ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষের খাঁচা?"

.....

"বন্দী থাকা হীন অপমান। হাঁকবে যে বীরতরুণ,
শিরদাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।"

.....

"হঠাৎ দেখি আসছে বিশাল মশাল হাতে ও কে?
"জয় সত্যম্' মন্ত্র শিখা জ্বলছে উজল চোখে?
রাত্রি-শেষে এমন বেশে কে তুমি ভাই এলে?
"সেবক তোদের, ভাইরা আমার? জয় হোক মা'র।"
হাঁকলো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে।"

বাঙালি আর বাঙালি রইল না

সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘু নয়। সমন্বয়বাদী বাঙালি চেতনার মর্মমূল থেকে নজরুল মানসের বিকাশ বলেই তার মধ্যে এত প্রাণাবেগ, এত দুর্বার তার গতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নজরুলের জীবদ্দশাতেই বাঙালি আর বাঙালি থাকেনি। মানসিকতার দিক থেকে তারা হয় হিন্দু নয়ত মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের সেই অদম্য প্রাণশক্তি যা তাদের সারা ভারত উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে অগ্রগণ্য জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল; (স্মরণীয় গোখেলের সেই বিখ্যাত উক্তি, What Bengal thinks today the rest of India thinks tomorrow) প্রাণশক্তির সেই সৃজনশীলতা তাদের আর অবশিষ্ট ছিল না। শুধুমাত্র নেতাজি মধ্যে সেই শক্তি শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। কারণ তিনি কোনদিনই সাম্প্রদায়িক অর্থে হিন্দু কিংবা মুসলমান হয়ে যাননি। আবার কমিউনিস্টও হননি, তিনি বাঙালি ছিলেন।

যেসব বঙ্গসন্তান সাম্প্রদায়িক অর্থে হিন্দু কিংবা মুসলমান না হয়ে মার্কসবাদের প্রভাবে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন তাঁরাও বর্জন করেছিলেন বাঙালিত্বকে। এইভাবে নিজেদের শিকড় থেকে ছিন্ন করে ফেলায় তাদের দেহেও প্রাণশক্তিরসের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নজরুলও এদের মধ্যে কিছুদিন ভিড়েছিলেন ঠিকই কিন্তু একজন পরিপূর্ণ বাঙালি কবির পক্ষে বিদেশী নেতৃত্বের অন্ধ অনুসরণকারী কমিউনিস্টদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন মানিয়ে চলা সম্ভব হয়নি। সাম্যবাদী ভাবধারাকে আয়ত্ত করার মধ্যে নজরুলের বাঙালি মন যেভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তার সঙ্গে যারা আত্মসাৎ করতে চায় না শুধুই অন্ধভাবে অনুসরণ করতে চায় তাদের মিল হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সাম্যবাদী ভাবধারা নিয়ে কবিতা লিখেও যখন নজরুল বাঙালির মধ্যে আরও অধিকতর জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তখন কিন্তু মার্কসবাদীদের তথাকথিত অফিসিয়াল নেতৃত্ব হাজার তত্ত্বচর্চা এবং বক্তৃতাবাজি সত্ত্বেও কোনদিনই বাঙালির মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিতে পারেনি। যদি তা পারত তাহলে পরবর্তীকালে এমনকি তাদের অনুসারীরাও এমন করে সাম্প্রদায়িক অর্থে হিন্দু কিংবা মুসলমান বনে যেত না। এইভাবে বাঙালি সংকীর্ণ অর্থে হিন্দু অথবা মুসলমান হয়ে গিয়ে ক্রমাগত উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নিজেদের আইডেনটিটি খুঁজে বেড়াতে শুরু করায় সারা ভারত উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। বর্তমানে স্বাধীন ভারতবর্ষে বাঙালির অবস্থান মোটেই গৌরবোজ্জ্বল নয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় সাময়িক ভাবে হলেও বাঙালির মহিমা যেন আবার ফিরে এসেছিল। তখন আবার হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটা গৌণ হয়ে গিয়েছিল। বাঙালির মহিমা আবার জেগে উঠেছিল। নজরুল আবার তার যথার্থ স্পিরিটে বাঙালি চিত্তকে আলোড়িত করতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথের যেসব গান এবং কবিতা বাঙালিত্বের চেতনায় উদ্ভাসিত সেইগুলির আর

জীবনানন্দ দাশের সে সব কবিতা যেগুলির অন্তর বাহির আপ্লুত করে আছে 'রূপসী বাংলা', এইসব সবকিছুই আবার বাঙালির একান্ত চর্চার জিনিস হয়ে উঠছিল। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর যত দিন যাচ্ছে ততই বাঙালি যেন আবার নতুন করে তার বাঙালিত্বের চেতনাকে বর্জন করে অন্য ধরনের কোনো আইডেনটিটির খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। তাই আবার নতুন করে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক মুসলমানত্ব কিংবা হিন্দুত্বের মধ্যে নিজেদের স্বরূপ সন্ধানের প্রবণতা বাড়ছে। সমন্বয়বাদী বাঙালি চেতনার মধ্যে নিহিত থাকে যে দুর্বার প্রাণশক্তি যার যাদু স্পর্শে স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের মানুষ অদম্য তেজে জেগে উঠেছিল, নতুন করে নিজেদের ধ্যান ধারণা থেকে সেই চেতনাকে বিদায় দিতে শুরু করায় বাংলাদেশের বাঙালিও আবার তাদের মহিমা হারাতে শুরু করেছে। সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু সমস্যার আবার উদ্ভব ঘটছে এই কারণেই। কোন জাতি তার ঐতিহ্যসম্মত বৃহত্তর ভাবাদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে, ধীরে ধীরে তারা যে সংকীর্ণ চিততায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, এটাইতো স্বাভাবিক। এইভাবেই বাংলাদেশের বাঙালিও বিচ্যুত হচ্ছে নজরুলের ভাবাদর্শ থেকে। □

চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে ঐতিহাসিক বিনয় চৌধুরীর ধারাবাহিক সন্দর্ভ— **'ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক', ৩য় কিস্তি।** অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় এই কিস্তি ছাপা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থসমালোচনা

নাগ–রলাঁর পত্রবিনিময়

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

"গোল্ডেন বুক প্রকাশ করতে গিয়ে কাজের অতিরিক্ত চাপে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, বইটা এখন লোকজনকে দেওয়ার পর্যায়ে এসেছে, আর সেজন্য আমি আপনার কাছে কত আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। গুরুদেব, এই কাজে আপনি আর ভগ্নী মাদলিন আমাকে যে কতভাবে সাহায্য করেছেন! বাইরের জগৎ জানতেও পারবে না এই গোল্ডেন বুকের ইতিহাস কিন্তু আমি প্রচ্ছন্নভাবে তার সাক্ষ্য রেখেছি, গ্রন্থের শেষে আপনার সেই ঐতিহাসিক আবেদনটি, মূলে এবং অনুবাদে, অন্তর্গত করে।"

কালিদাস নাগের এই চিঠিতে, কলকাতা থেকে লেখা ৩১ জানুয়ারি ১৯৩২ তারিখে, ভগ্নী মাদলিনের উল্লেখে বোঝাই যাচ্ছে, এই চিঠিতে 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথ নন, রোম্যাঁ রলাঁ। কালিদাসের দুই গুরু, রবীন্দ্রনাথ আর রলাঁ। কিন্তু এই দুই গুরুর মধ্যে ভারসাম্য রাখতে শিষ্য কম হিমসিম খান নি, যার অনেক তথ্য আছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে।

গোল্ডেন বুক অফ টেগোর রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে পরিচিত গ্রন্থ, কিন্তু ততটা পরিচিত নয় এই গ্রন্থপ্রকাশের ইতিহাস। নাগ-রলাঁর পত্র বিনিময় থেকে সেটা স্মরণ করা যেতে পারে।

১৯৩০ সালে কালিদাস ইয়োরোপে, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসুও ইয়োরোপে। রলাঁর সঙ্গে তিনজনেরই দেখা হয়েছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। রলাঁ তাঁর ডায়েরিতে (যেটার ভারতীয় অংশ Inde নামে রলাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়) ২১ সেপ্টেম্বর জানাচ্ছেন, কালিদাস রলাঁকে অনুরোধ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ৭০ তম জন্মবার্ষিকী উৎসবের আবেদন জানাতে রলাঁ যেন উদ্যোগী হন, তাতে স্বাক্ষর থাকবে আইনস্টাইন, পালামাস আর জগদীশচন্দ্রের।

(হঠাৎ পালামাস কেন? ইয়োরোপের প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেওয়াতে রলাঁ চিরকালই উদ্‌গ্রীব, যেমন উদ্‌গ্রীব প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতাদের খপ্পর থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচাতে। যেমন কার্ল স্পিটেলারের উপর রলাঁর প্রবন্ধ রলাঁ পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। স্পিটেলারকে রলাঁ মহাকবি মনে করতেন, ইয়োরোপে গ্যেটের পরেই। কিন্তু তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ রলাঁর পাঠানো জার্মান ভাষায়, স্পিটেলারের Olympian Spring পড়তে পারেন নি, ভাষা না জানার জন্য। রলাঁর এবারের ইচ্ছা গ্রীসের কবি কাস্তিস পালামাস-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের জন্য যা করেছেন, পালামাস গ্রীসের জন্য তাই করছেন বলে রলাঁর ধারণা; পালামাস রবীন্দ্রনাথের মতোই মুখের ভাষা দিয়ে তাঁর জাতির কাব্যের নতুন ভাষা সৃষ্টি করছেন। কিন্তু রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে অ্যাথেন্সে পাঠাতে পারেন নি, পেরেছিলেন কালিদাসকে। রবীন্দ্রনাথের বার্তা নিয়ে কালিদাস পালামাসের সঙ্গে দেখা করেন এবং মুগ্ধ হয়ে ফেরেন।)

এই দিনলিপি লেখার কয়েক দিন পর রলাঁ লিখছেন, কালিদাস তাঁকে আবার অনুরোধ করেছেন আবেদনপত্রটি লিখতে, স্বাক্ষর থাকবে পূর্বোক্ত তিনজনের সঙ্গে রলাঁর। আবেদনপত্র লিখে রলাঁ কালিদাসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

১৬ অক্টোবর ১৯৩০ কালিদাস রলাঁকে লিখলেন, রথীন্দ্রনাথের (যিনি তখন লন্ডনে) ইচ্ছা আবেদনপত্রটি সর্দারসিংজি রানা (প্যারিসে বসবাসকারী ব্যবসায়ী, দেশে ফেরা যাঁর নিষেধ রাজনীতির জন্য, আর ঠাকুর পরিবারের বন্ধু) যেন পান। প্যারিস থেকে রানা আবেদনটি ছাপিয়ে বিলি করবেন, রলাঁ যাঁদের যাঁদের কাছে পাঠাতে বলবেন। রথীন্দ্রনাথের ইচ্ছা, শরীর ভালো থাকলে আঁদ্রে কার্পেলেস পাণ্ডুলিপি প্রকাশযোগ্য করার ভার যেন নেন। ছাপার দায়িত্ব রথী নেবেন, রলাঁর ইচ্ছা মতো, ফ্রান্স কিংবা জার্মানিতে। কালিদাস ওই চিঠিতে রলাঁকে অনুরোধ জানালেন, কার কার কাছে আবেদনপত্রটি যাবে, তার তালিকা যেন রলাঁ রানাকে পাঠিয়ে দেন। কালিদাসের ইচ্ছা, কার্পেলেস দায়িত্ব নিতে না পারলে পাণ্ডুলিপি যেন রানার কাছে বা রলাঁর কাছে পাঠানো হয়।

এই চিঠি পেয়ে রলাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি এর মধ্যেই আবেদনপত্রটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আইনস্টাইনকেও পাঠিয়েছেন, আইনস্টাইন সেটা পেয়েওছেন এবং প্রবন্ধ পাঠাবেন জানিয়েছেন। অথচ, রথীন্দ্রনাথ রামানন্দের কোনোও উল্লেখ না করে চিঠি লিখছেন রলাঁর বোন মাদলিনকে, যেন পুরো বইটার ব্যবস্থা হবে ফ্রান্সে আর ব্যবস্থা করবেন রানা বা কার্পেলেস। কিন্তু কালিদাস রলাঁকে অন্যভাবে বুঝিয়েছিলেন। রলাঁ ভেবেছিলেন আবেদন এবং গ্রন্থপ্রকাশ হবে ভারতবর্ষ থেকে এবং জগদীশচন্দ্র রামানন্দের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদকের দায়িত্ব নেবেন। নাহলে, বইটা মনে হবে রবীন্দ্রনাথের ইয়োরোপিয় অনুরাগীদের অবদান। রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশবাসীর কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার মতো হবে কাজটা। বইটির শিকড় অবশ্যই হতে হবে ভারতের মাটিতে। নাহলে গ্রন্থটির কোনও তাৎপর্যই থাকবে না, বিশেষ করে এমন একটা সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথের দেশবাসীরা মনে করতে পারেন রবীন্দ্রনাথ দেশের কথা ভাবেন না।

রলাঁর এই আশঙ্কার কারণ, এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করে রলাঁ দেখেছিলেন, গান্ধী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত, রাজনীতি নিয়েও, তিনি মেতে আছেন ছবি আঁকায় এবং এমন সব লোকের সংস্পর্শে বা চাটুবাক্যে ভুলে আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য নন। রলাঁ এতে এতই বিরক্ত যে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রদর্শনী দেখতেও যান নি। তাঁর দিনলিপিতে বিস্তৃতভাবে এই প্রসঙ্গে রলাঁ লেখেন এবং যখন দিনলিপি পরে প্রকাশিত হবে, তখন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ক্ষিপ্ত হবেন।

সম্পাদনের ব্যাপারে বা লেখক নির্বাচনে রলাঁ রানা বা কার্পেলেসকে যোগ্য মনে করেনি নি। তাঁরা মননশীল নন, নির্বাচনে স্বাধীনচেতা হতে পারবেন না। রলাঁ নিজেও নন, তার কারণ ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের মননশীল বন্ধু কারা সে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। এমন লোককে এই ভার দিতে হবে যিনি খুশি মনে কাজটি করবেন, আনন্দের সঙ্গে অনুরোধ করতে পারবেন। তাছাড়া, রলাঁর হাতে অতো সময়ও নেই। এই ভার এবং দায়িত্ব তিনি নেবেন না। রলাঁর মতে কালিদাসেরই এই যোগ্যতা আছে, ইয়োরোপ এশিয়া আমেরিকায় কারা কারা লিখতে পারবেন সেই তালিকা কালিদাসই করতে পারবেন। কালিদাসের হাতে যত কাজই থাকুক না কেন। এই তালিকাটি, রলাঁ জানালেন, কালিদাসের পাঠানো উচিত শ্বশুর রামানন্দকে, রথীন্দ্রনাথকে আর অবশ্য রানাকে। যদি এটা না হয় তাহলে একটা হাস্যকর জরবজঙ্গ তৈরি হবে। এতে সুবিধা হবে তাঁদের যাঁরা "রবীন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গ" বলে এগিয়ে আসছেন। তাঁরা যেন কিছুতেই অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সব কিছু হাতিয়ে নিতে না পারেন। রানা বা রথীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সব ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তবে, যাই করা হোক, যেন তাড়াতাড়ি করা হয়। কাজের সময় অল্প লোককেই পাওয়া যায়, তাদেরই সব কিছু করতে হয়।

এই চিঠি পেয়ে কালিদাস অবশ্যই বিব্রত হলেন এবং কেন তিনি বা রামানন্দ ভয় পাচ্ছেন বা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না, সেটা রলাঁকে খুলে বললেন। রবীন্দ্রনাথের অনুচরদের সম্পর্কে কালিদাস অত্যন্ত সতর্ক, বিশেষ করে মুসোলিনি ঘটিত কোলাহলের পর। কিছু লোক ওই ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ এবং তার সহচরদের উপর যেরকম প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাতে শান্তিনিকেতনের কোনও কল্যাণ হতে পারে না। রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসেন, তাঁর রবীন্দ্র-বিশ্বস্ততারও কোনও হানি হয় নি, যদিও বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তিনি সমালোচনা করতে পিছপা হন নি। আর বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনায় তো এখন রথীন্দ্রনাথই নেতা। সেইজন্যই, এই গ্রন্থের ব্যাপারে রামানন্দ নেপথ্যে থাকলেই ভালো হতো। বিশ্বভারতীর বর্তমান কর্তারা কালিদাসকেও পছন্দ করেন না। তাঁর সামান্য 'বৃহত্তর ভারত সমাজ' বিশ্বভারতীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে এমন কথাও তারা বলাবলি করছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও সেই কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। কালিদাস এতে ভেঙে পড়েন নি, রবীন্দ্রনাথে তাঁর শ্রদ্ধা আর আস্থা এতই প্রবল। সুতরাং প্রবল বাধা থাকলেও কালিদাস রলাঁর আজ্ঞা পালন করবেন। যতদিন তাঁর শরীরে বল আছে ততদিন রলাঁকে খাটুনির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন, এই কথা জানিয়ে কালিদাস রলাঁকে যে চিঠি লিখলেন আমেরিকা থেকে সেই চিঠির তারিখ ২৩ অক্টোবর ১৯৩০।

এর পরেই মার্চ-এপ্রিল ১৯৩১ সালের প্রবাসী রলাঁর ফরাসি ভাষায় লেখা রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আবেদনটি ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারী হলেন যথাক্রমে জগদীচন্দ্র বসু, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, রম্যাঁ রলাঁ, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এবং কস্টিস পালামাস। এবং সব রচনা পাঠানোর ঠিকানা হলো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন।

গোল্ডেন বুক প্রসঙ্গ এই আলোচনায় আনার উদ্দেশ্য দুটো। এই গ্রন্থ প্রকাশে কালিদাস নাগের ভূমিকা তেমন পরিচিত ছিল না, রলাঁ-নাগ পত্রালাপ প্রকাশ করার আগে। তাছাড়া মুসোলিনির ইটালি-ভ্রমণে কালিদাস-রামানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ-প্রশান্তচন্দ্র-রথীন্দ্রনাথ —এদের সম্পর্ক যে কত তিক্ত হয়েছিল, সেটাও জানা যায় এই গ্রন্থ-প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের মুসোলিনি-প্রীতি এবং ইটালি-ভ্রমণ আমাদের কাছে পরিচিত তথ্য। সে বিষয়েও নূতন খবর পাওয়া যায় রলাঁ-নাগ চিঠিপত্র থেকে। রলাঁ রবীন্দ্রনাথের ইটালি আসার সম্ভাবনা শুনে বারবার কালিদাসকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন কালিদাস রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে অবহিত করে রাখেন। ১৯২৬-এর ইটালি-ভ্রমণ বিষয়ে পরিকল্পনা বছরখানেক ধরেই রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন এবং সে খবর রলাঁও পান। ৮ জুলাই ১৯২৫ রলাঁ কালিদাসকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য একটি নোট পাঠান। সেটা তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু কালিদাস অবশ্যই যেন সে বিষয়ে অবহিত থাকেন, জানান রলাঁ, (আলোচ্য পত্রাবলীতে অবশ্য নোটটি নেই)। রলাঁ জানাচ্ছেন, এখানে একটা খবর, রবীন্দ্রনাথ নাকি ইটালিতে বসবাস করবেন। কালিদাসের জেনে রাখা দরকার, ফ্যাসিস্ট তরুণরা কোনও কিছুই শ্রদ্ধা করে না। ৬ আগস্ট ১৯২৫ কালিদাস রলাঁকে জানালেন, ইটালির লোকেরা কীভাবে দেখে রবীন্দ্রনাথকে, সেটা রবীন্দ্রনাথের উপদেষ্টাদের তিনি জানিয়েছেন। রলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কথা না-বলা পর্যন্ত ইটালিতে যেন কোনও সফরসূচি রাখা না হয়। সেবিষয়েও তিনি তাঁদের বলেছেন। ১৫ মার্চ ১৯২৬ রলাঁ কালিদাসকে লিখছেন, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ইটালি দিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু করছেন। এটা

অত্যন্ত অন্যায়, শুধু স্বাস্থ্যের বিবেচনাতেই। রুগ্ন রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপে এসে বিশ্রাম না নিয়ে, অস্বাস্থ্যকর ইটালিতে বক্তৃতায় নেমে পড়েবেন, ডাক্তাররা বলছেন এটা হৃদযন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত। রলাঁ রথীন্দ্রনাথকেও লিখছেন, ডাক্তাররা কী বলছেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রলাঁ সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন, এমন কি ডাক্তার পর্যন্ত, অথচ তাঁর কথা কেউ কানে নিচ্ছেন না!

সে যাত্রায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ রওনা হতে পারেন নি, স্বাস্থ্যের অবনতির জন্যই। কিন্তু জুন মাসেই রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপে গেলেন এবং প্রথমে ইটালিতেই। মুসোলিনি-প্রশস্তির পর নানা নাটকের পর রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, ফ্যাসিস্ট ইটালি সম্পর্কে তিনি নানা কথা অবশ্যই শুনেছিলেন ইটালি যাওয়ার আগেই। আমরা ধরে নিতে পারি, সেই অনেক কথার একটা সূত্র নিশ্চয়ই রলাঁ, কালিদাসের মাধ্যমে। কিন্তু রলাঁর পরামর্শ তিনি শোনেন নি, ইটালি ভ্রমণের আগে বা পরে। রলাঁ পীড়াপীড়ি করছিলেন, ফ্যাসিস্ট-ইটালি সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত রবীন্দ্রনাথকে দিতেই হবে, নাহলে ফ্যাসিস্ট-পীড়িত ইয়োরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হতাশ হবেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট মাতামত দেন নি। রলাঁ রবীন্দ্রনাথের আত্মার আত্মীয়, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ আগে-পরে বহুবার বলেছেন। কিন্তু দেখা গেল সে-সব কেবল কথার কথা। রলাঁর কোনও পরামর্শই তিনি শোনেন নি। রলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দু সপ্তাহ কাটান। কালিদাসকে ৭ জুলাই ১৯২৬ লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিবোধ নিয়ে তিক্ত কথা লিখলেন রলাঁ, কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রানুরাগী।

এই চিঠি পাওয়ার পর কালিদাস রলাঁকে জানালেন, ইটালি যাওয়ার আগে কালিদাস রলাঁর কথামতো বারবার রথীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনেন নি। এবার কিন্তু ধমক খাওয়ার পালা কালিদাসের। মডার্ন রিভিউ'র ফ্যাসিজম-প্রীতি, রবীন্দ্রনাথকে ইটালি যাওয়ার জন্য প্রবাসীর সাময়িক সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ করার ধৃষ্ঠতা রলাঁ ক্ষমা করেন নি, এমনকি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কৈফিয়ৎও রলাঁ গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ভুল করতে পারেন, কিন্তু তিনি এতই বিরাট যে মডার্ন রিভিউ আর প্রবাসী এই সময়ে রলাঁর কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল। ফ্যাসিজম-রলাঁ-রবীন্দ্রনাথ একটা বড়ো প্রসঙ্গ— আমরা এক্ষেত্রে কালিদাসের অবস্থানটাই শুধু লক্ষ্য করছি।

রবীন্দ্রজীবনীতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন প্রাচ্যশাস্ত্রবিৎ সিলভ্যাঁ লেভি রবীন্দ্রানুরাগী, শান্তিনিকেতনে অতিথি অধ্যাপক, কিন্তু পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ লোকমুখে শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেভি তেমন ভালো কথা বলছেন না। সৌজন্যবশত সম্ভবত জীবনীকাররা নিন্দাবাদ স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন না, কিন্তু তাতে জীবনের অস্পষ্টতা বাড়েই। প্রভাতকুমার লিখেছেন, "শোনা যায়, কয়েকজন য়ুরোপ প্রত্যাগত ভারতীয় ছাত্রের কাছ হইতে কবি তাঁহার ও বিশ্বভারতী সম্পর্কে অধ্যাপকের বিরূপ মনোভাবের কথা জানিতে পারেন। এই সব কানভাঙানিতে কবির মন বিরূপ হয় এবং সেই খবরটিও অধ্যাপকের কাছে পৌঁছিয়া যায়।" এই ছাত্রদের একজন কালিদাস নাগ হওয়া সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের উপদেশ শুনে কালিদাস ইংল্যান্ডে না গিয়ে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন তাঁর গবেষণা-ডিগ্রির জন্য। ১৯২১ সালে লেভি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে, অতিথি অধ্যাপক তিনিই সেখানে প্রথম। আর সেই বছরই কালিদাস যান সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেভির তত্ত্বাবধানে গবেষণার জন্য। ১৯২৩ সালে ডিগ্রি নিয়ে তিনি ফিরে আসেন ভারতবর্ষে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে।

ভারতীয় ডায়েরি পড়লে জানা যায়, রলাঁ লেভি সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। আর রলাঁর মহাত্মা গান্ধী ১৯২৪ সালে বের হলে লেভি নাকি বিষম চটে যান, কেননা প্রাচ্যবিৎ তিনিই, এর মধ্যে রলাঁ ঢুকে পড়লেন কী করে। 'মহাত্মা গান্ধী' জীবনীটি লেখার সময় কালিদাস রলাঁকে সাহায্য করেছিলেন তথ্যাদি দিয়ে, সেজন্য ভূমিকাতে রলাঁ কালিদাসকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানান। এতে লেভি কালিদাসের উপরও চটে যান। রলাঁ লিখেছেন ডায়েরিতে, ভাগ্য ভালো, কালিদাসের গবেষণা শেষ হয়ে গেছে, নাহলে ডিগ্রি জুটত না।

১৯২৪ সালেই কালিদাস রবীন্দ্রনাথের সহচর হয়েছিলেন চীন ও জাপান যাত্রায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা করে যেসব বক্তৃতা করেন, লেভি সেই বক্তৃতা পছন্দ করেন নি। বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য একটি কাল্পনিক প্রাচ্য। এই সব বক্তৃতা এশিয়া আর ইয়োরোপের কাছে তো অপকারী বটেই, রবীন্দ্রনাথেরও আদর্শবিরোধী। রলাঁর গান্ধীজীবনী এবং রবীন্দ্রনাথের চীন-জাপান বক্তৃতার সমালোচনা করে লেভি লেখেন The call of the Orient-এ। সেকথা জানান রলাঁ কালিদাসকে ২মে ১৯২৫ চিঠিতে। পরেও উল্লেখ করবেন লেভিকে 'Cautious and calculating savant' বলে।

রলাঁর ভারতীয় ডায়েরি Inde ফরাসি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে, নতুন সংস্করণ ১৯৬০ সালে। এই ডায়েরিতে রলাঁর রবীন্দ্রানুরাগ ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যেসব আচরণ বা মতামত রলাঁর মনঃপূত হয় নি সেসব নিয়ে সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেন নি। ডায়েরিটি রলাঁ প্রকাশের জন্য লেখেন নি, ভারত ও ভারতীয়দের সম্পর্কে তিনি যা জেনেছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন লিপিবদ্ধ করে গেছেন ভবিষ্যতে

সেসব সম্পর্কে যদি প্রকাশ্যে লেখেন তখন সেই তথ্য মতামত তাঁর লেখার সহায়ক হবে বলে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করেন তাঁরা অবশ্যই ক্ষিপ্ত হবেন এই ডায়েরি পড়ে। তাঁদের একজন সৌরীন্দ্র মিত্র। শান্তিনিকেতনের এই অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথকে বড়ো আর তাঁর পাশ্চাত্য বন্ধুদের অসূয়াপরায়ণ ক্ষুদ্রচেতা প্রতিপন্ন করার জন্য যথেচ্ছ তথ্যবিকৃতি ঘটিয়েছেন তাঁর 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' গ্রন্থে। আমরা রলাঁ প্রসঙ্গে, যে সব ক্ষেত্রে কালিদাস নাগও আছেন, সে সবের কয়েকটা উল্লেখ করব, আলোচ্য গ্রন্থটি অবলম্বনে।

সৌরীন্দ্র লিখছেন, "এই সময় (২৬শে জুন) জাপান থেকে লিখিত কালিদাস নাগের এক পত্রে রোলাঁ জানতে পারলেন যে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে পেরু সরকার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছেন এবং কালিদাস নাগেরও কবির সহযাত্রী হওয়ার সম্ভাবনা। সেই চিঠিতেই কালিদাস নাগ রোলাঁকে পেরু সম্বন্ধে খোঁজখবর এবং প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্রাদি দিয়ে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই অনুরোধ সম্বন্ধে কিছু জানতেন এমন সঠিক প্রমাণ নেই।"

কালিদাস তাঁর ২৬ জুন ১৯২৪-এর চিঠিতে রলাঁকে জানিয়েছিলেন, "দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলোর প্রতিনিধিরা আগামী ডিসেম্বরে তাঁদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকীতে সদ্য নিমন্ত্রণ করে গেছেন।" কালিদাসের এই খবরের কোনও অর্থ হয় না, 'তাঁদের শতবার্ষিকী' অর্থহীন, দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলোর একসঙ্গে 'স্বাধীনতার শতবার্ষিকী' হতে পারে না। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার, কালিদাস পেরু সম্বন্ধে খোঁজখবর বা প্রয়োজনীয় পরিচয় পত্রাদি রলাঁর কাছে চান নি। রলাঁ ২৬শে জুনের চিঠি পড়ে বুঝতেই পারেন নি, কোন্ দেশে রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছেন। তাই তিনি জানতে চান, ১৮ জুলাই, কালিদাসের 'ল্যাটিন আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলোর' মানে কী? তাঁর সন্দেহ, রবীন্দ্রনাথ হয়ত পেরুই যাচ্ছেন এবং পেরু দক্ষিণ আমেরিকার সবচাইতে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র এবং রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সৌরীন্দ্র কালিদাসের চিঠির বিকৃতি করে বলছেন, যেন কালিদাসই আগ বাড়িয়ে রলাঁর কাছ থেকে পরিচয় পত্রাদি চাইছেন। রবীন্দ্রনাথের পেরু যাত্রা হয় নি, নানান নাটকের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। রলাঁ পেরুর অত্যাচারী শাসন সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু রলাঁর পরামর্শে রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সহচররা গুরুত্বই দেন নি, এবং শেষ পর্যন্ত রলাঁর এই বিষয়ে চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথ আদৌ পান নি। কালিদাসের পক্ষেও রবীন্দ্রনাথকে অবহিত করা সম্ভব ছিল না, তিনি তখন ভারতের বাইরে।

আর একটি তথ্যবিকৃতির উদাহরণ, হিটলার প্রসঙ্গ। সৌরীন্দ্র জানিয়েছেন, রলাঁ মুসোলিনি নিয়ে এত চেঁচামিচি করেছেন, কিন্তু হিটলার নিয়ে তিনি নীরব কেন? সৌরীন্দ্র লিখেছেন, "সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে ১৯৩৩-এর ২৫শে নভেম্বর, হিটলার সম্বন্ধে যে মন্তব্য তিনি (রলাঁ) করেন সেটা বিশেষ কারণে স্মরণীয়। মুসোলিনির উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আত্মম্ভরিতার তুলনায় হিটলারকে তিনি বলেছিলেন 'বুদ্ধিতে খাটো কিন্তু অনেক বেশি খাঁটি অর্থাৎ সৎ এবং সরল।" এরপর সৌরীন্দ্রের রলাঁর বোধশক্তি সম্পর্কে ব্যঙ্গ।

এটা আবার তথ্যবিকৃতি। হিটলারের প্রতি প্রশংসাবাক্য যে আসলে ব্যঙ্গ সেটা সৌরীন্দ্র না ধরতে পারেন, কিন্তু হিটলারের Mein Kamf পড়েও যিনি হিটলারের রাজনীতি না বোঝেন, তিনি কোন্ আক্কেলে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি নিয়ে পরামর্শ দেন, এই প্রশ্ন তিনি তুলেছেন। কালিদাস নাগকে রলাঁ ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৩ তিনি এই Mein Kamf প্রসঙ্গ তুলেই হিটলারের স্বরূপ কী এই বিষয়ে দীর্ঘ হিটলারের সমালোচনা করেছিলেন। সৌমোন্দ্রনাথ রলাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, হিটলারের চরিত্রটি তিনি যেন রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে বলেন, কেননা হিটলারের চররা শান্তিনিকেতনে প্রভাব বিস্তার করছে। রলাঁ হতাশ হয়ে বলেছিলেন, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক ইটালিয় বন্ধু হারিয়েছেন বলে ভাবছেন, এখন হিটলার-সমালোচনা করলে, তাঁর জন্য, রবীন্দ্রনাথ আবার জার্মান বন্ধু হারাবেন।

বিশ্বসৌহার্দ। রলাঁ আর রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। আর কালিদাস তাঁদের শিষ্য। রলাঁর সঙ্গে কালিদাসের পত্রালাপের অধিকাংশ বিষয়ই এই বিশ্বসৌহার্দ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার স্বপ্ন এবং রূঢ় বাস্তবের ধাক্কায় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা নিয়ে। রলাঁ বা রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির লোক নন। রাজনীতির জন্য রলাঁ স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছিলেন, দেশের লোকজনকে বন্ধুবান্ধবদের বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিলেন, যুদ্ধের সময় তাঁর শান্তির বাণী দেশদ্রোহিতা মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির জন্য অতটা ত্যাগ করেন নি। তাহলেও জঙ্গী দেশাত্মবোধের কালে রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করেছিলেন, সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সাময়িক পত্রে, গ্রন্থে, বক্তৃতায় এই বিশ্বসৌহার্দের প্রচার। শুধু বাণীর সাহায্যে বিশ্বসৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, রলাঁ সেটা বুঝেই গিয়েছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসোন্মাদনায়। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়, রলাঁর চেষ্টার কোনও ঘাটতি ছিল না। কালিদাসের কাছে লেখা চিঠিগুলো সেই আন্তরিকতার স্বাক্ষর নিয়ে আছে। এই আন্তরিকতার জন্য

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রলাঁ ক্রমশই পশ্চিমী সভ্যতা থেকে প্রাচ্য সভ্যতার দিকে ঝুঁকেছিলেন, সেজন্যই তিনি গান্ধী, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় কেউ এলেই তিনি জানতে চাইতেন এঁদের কথা। কালিদাসও রলাঁর কাছে ছিলেন প্রাচ্যের দূত।

চিঠিগুলো সংকলন করে এবং অনুবাদ করে চিন্ময় গুহ আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তবে, টীকার ব্যাপারে তিনি আরো একটু নিষ্ঠাবান হতে পারতেন। পত্রোক্ত অনেক ব্যক্তি, রচনা, ঘটনা আমাদের কাছে অপরিচিত, টীকাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিঃশব্দ। গ্রন্থভুক্ত অধিকাংশ চিঠিই এই প্রথম প্রকাশিত হলো। স্পষ্টই বোঝা যায়, চিঠিগুলো অনুসরণ করলে, অনেক চিঠিই হারিয়ে গেছে। যেমন ধরা যাক, কালিদাস বিয়ে করার পর রলাঁকে চিঠি লেখেন, সেই চিঠির উল্লেখ করেন রলাঁ স্নেহের সঙ্গে। সেই চিঠিটা নেই। সম্পাদক এই হারিয়ে যাওয়া চিঠিগুলো সম্পর্কে অবহিত, তবে টীকায় সর্বত্র তিনি হারিয়ে যাওয়ার উল্লেখ করেন নি। কোনও কোনও চিঠি সম্পর্কে খটকাও লাগে। কালিদাসের লেখা ২৬ জুন ১৯২৪ চিঠিটা দীর্ঘ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন-জাপান ভ্রমণ বিষয়ে। এই চিঠিটা রলাঁও ব্যবহার করেছেন তাঁর ডায়েরিতে। আশ্চর্যের বিষয়, রলাঁর ডায়েরিতে উদ্ধৃত একটি দীর্ঘ অংশ চিন্ময় গুহ-সংকলিত চিঠিতে নেই। অংশটি জরুরি, কেননা চীন ও জাপানের আধুনিক চিন্তাধারা নিয়ে মন্তব্য আছে সেখানে এবং চীনের তরুণরা যে রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনতে চাইছে না সেই ইঙ্গিত সেখানে স্পষ্ট। এই অংশটি কেন বাদ গেল? কালিদাস ইংরেজিতে চিঠি লেখেন রলাঁকে , মাদলিন সেটা ফরাসিতে অনুবাদ করে দেন রলাঁকে। এটা স্বাভাবিক, মাদলিন কোনও কোনও অংশ অনুবাদ করলেন না। কিন্তু দীর্ঘ এক অনুচ্ছেদ তিনি অনুবাদ করবেন, যা কালিদাস আদৌ লেখেন নি? সংশয় আরো বাড়ে যখন রলাঁ লেখেন, কালিদাস চিঠিটি শুরু করেন জাপানে ২৬শে জুন, শেষ করেন শাংহাইতে ২৮শে জুন। চিন্ময় গুহের অনুবাদে এটা বোঝা যায় না। চিন্ময় গুহ Inde-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন কালিদাসের অপ্রকাশিত চিঠিগুলো, সম্পাদকের অনেক টীকা থেকে তা বোঝা যায়। কিন্তু এই চিঠিটি বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেন নি।

কালিদাস রলাঁর বহু রচনার বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রবাসী আর মডার্ন রিভিউতে ছেপেছিলেন, এমন কি রলাঁর সদ্যোরচিত অনেক প্রবন্ধের। কিন্তু তিনি যে রলাঁর চিঠিগুলো ছাপেন নি, অনেকে যেমন সেই সময়ে ছাপতেন রবীন্দ্রনাথের পত্র বা পত্রপ্রবন্ধগুলো, তাতে বোঝা যায়, কালিদাস রলাঁর চিঠিগুলো ব্যক্তিগত, এমন কি তাঁর রলাঁ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করলে মনে হয়, পবিত্র মনে করতেন। কিন্তু রলাঁ, কালিদাস এবং তাঁদের কাল ও দেশ বুঝতে হলে এই চিঠিগুলো সাহায্য করে। সেজন্য, পত্রগুলো অনুবাদ করার এবং প্রকাশ করার দরকার ছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তাভাবনার প্রচার, বিদেশে তাঁর কর্মকাণ্ডের documentation-এর জন্য তরুণ ছাত্র, অধ্যাপক, শিল্পীদের উপর নির্ভর করতেন। এমন একজন ছিলেন প্রশান্ত, আরও ছিলেন কালিদাস বা অপূর্বকুমার চন্দ। চিঠিটা লেখা ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৯। অপূর্ব সম্পর্কে স্নেহাসিক্ত সুরে রবীন্দ্রনাথ জানান, অপূর্বকে দিয়ে কিছু হবে না, ওর মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই, ধৈর্য নেই, প্রাচ্যবাসীদের উপর শ্রদ্ধা নেই। "একদা কালিদাস নাগের পরেও আস্থা রেখেছিলুম। কিন্তু তার একটা গুণ আছে—আমার সঙ্গে থেকে সে যে সব সুযোগ পেয়েছিল অন্তত তা নিজের কাজে লাগিয়েছে—।" মন্তব্যটি অকরুণ। এবং এটা স্বীকার করতেই হবে, রোলাঁর পত্রগুলো নিভৃতে রেখেছিলেন কালিদাস, "কাজে লাগান" নি। □

■ **Romain Rolland and Kalidas Nag Correspondence—The Tower and the sea**
Edited and translated by Chinmoy Guha
Papyrus, Calcutta 700004 / Rs. 300.00

''চতুরঙ্গ' থেকে'

স্বপন মজুমদার

প্রসঙ্গ যদি হয় ৪০ দশকের বাঙলা সাহিত্য যা বিশেষ ক'রে কবিতা, শ্রীঅশোক মিত্রের মতো দ্বিতীয় কোন অনুকম্পায়ী পাঠকের নাম কেউ সহসা ভেবে উঠতে পারবেন ব'লে মনে হয় না। 'চতুরঙ্গ থেকে' সম্পাদনার জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন। একসময়ে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, তারপরে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, বর্তমানে রাজ্যসভার মুখর সাংসদ থেকে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ত্রিনয়ন কলমচি শ্রীমিত্র তাঁর বহুপটু ব্যস্ততার মধ্যেও যে বাঙলা সাহিত্যের মতো 'অপক্ক কদলী' বিষয়ে উৎসাহ হারাননি, অনেকেরই কাছে তা কম বিস্ময়ের নয়।

'উৎসাহ' অবশ্য একটু উনকথনই হ'ল ; সঙ্গত হ'ত 'উচ্ছ্বাস'। এই উচ্ছ্বাস থেকেই অকস্মাৎ শিশুসুলভ তিনি ব'লে ওঠেন, 'বাংলা সাহিত্য তখনো সেভাবে শিবির বিভক্ত হয়নি, হয়তো রাজনীতি চর্চাই তখন পর্যন্ত চেতনার অস্পষ্টতার মধ্যে অবস্থিত ব'লেই।' (পৃ[৬]) শিবির-বিভাজন তাহলে গৌরবের মনে করেননা এবং রাজনীতিকেই প্রকারান্তরে দায়ী করেন বিভাজনের জন্য এই রাজনীতি-নিমজ্জিত কর্মী! কিন্তু শিবির কি গড়েছে শুধু রাজনীতি? কলকাতা আর ঢাকা জেলাপ্রীতি থেকে ধর্মবিশ্বাস, বিদেশস্পর্শ থেকে বিত্তবিভব, তুখোড় ইংরেজি বলা-না-বলা কি তৈরি করেনি অসংখ্য শ্রেণী গোষ্ঠী শিবির?

রাজনৈতিকই হোক্, সাহিত্যনৈতিক অথবা অন্যতর, সত্যিই কি শিবির-বিভক্ত ছিল না বাঙলা সাহিত্য জগৎ? একটু ভেবে লিখলে তাঁকে এমন আলঙ্কারিক প্রশ্নও করতে হ'তনা : 'বাঙালি সমাজ ব্যবস্থার একটি স্তরে [স্তর?] তখন কি আরো অনেক সহিষ্ণুতাস্নাত ছিল....।' (পৃ[৭]) শ্রীমিত্রের আমার থেকে ভালো জানবার কথা, কী সম্পর্ক ছিল 'শনিবারের চিঠি' 'পরিচয়' 'কবিতা' 'পূর্বাশা' 'সাহিত্যপত্রে'র মধ্যে, কেন এমনকি সামাজিক সৌজন্য সম্মোধনও ছিল না সমকালীন সাহিত্যিকদের উত্তরযৌবনে? কেন বুদ্ধদেবকে স'রে আসতে হয় সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' থেকে, আবার সুধীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে বুদ্ধদেবের সন্নিহিত হ'লে কেন অভিমানরুষ্ট হয়ে ওঠেন 'পরিচয়'-'সাহিত্যপত্রে'র বন্ধুরা : কেন লেখা হয় বিষ্ণু দে-র "রাজায়-রাজায়" ; ৪৬ নম্বর কী চোখে দেখত সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্রকে? তবে 'চতুরঙ্গ' প্রাথমিকভাবে এই অধিকারপ্রবণ কলহপরায়ণতা থেকে মুক্ত ছিল সম্পাদক হুমায়ুন কবীরের ঔদার্যে, যদিও দশকপূর্তির আগেই তারও মতাদর্শগত পক্ষপাত আর গোপন রইলনা। এর বাইরে অবশ্যই ছিলেন শ্রীমিত্রের মতো দু-একজন যাঁরা হয়ত দূরে ছিলেন ব'লেই ভালো থাকেন, অর্জিত রাজনৈতিক বিশ্বাস যাঁদের যৌবন সম্পর্কগুলোকে ইকেবানা ক'রে ফেলেনা।

যৌবনস্মৃতির এই উচ্ছ্বাসই সম্পাদক শ্রীমিত্রকে অসতর্কে লিখিয়ে নেয় : 'যে-কোনো চিন্তার ঝোঁক বা আবেগের উৎক্ষেপণ, যা লণ্ডনে বা প্যারিসে বা নিউ ইয়র্কে ঢেউ তুলেছে, তার কিঞ্চিৎ ঘাত-প্রতিঘাত কলকাতার উপকূলে কেন ধাক্কা দেবে না, সেই তুড়ি মারা অহংকার 'চতুরঙ্গ' জুড়ে, অর্ধশতাব্দী আগেকার কলকাতার বহু-বগ্‌গা সাহসের কাহিনী।' (পৃ[৮]) ঠিকই লিখেছেন। লণ্ডন প্যারিস বা নিউ ইয়র্ক যত স্বচ্ছন্দে চ'লে আসে তাঁদের ভূগোলে, ততই যেন সুদূর মনে হয় ত্রিপুরী, সবরমতী নোয়াখালি।

৪০ দশকের প্রতি উচ্ছ্বাস অবশ্য দ্রুত পরিণত হয় বর্তমানের প্রতি বিক্ষোভে : 'কে জানে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চৌহদ্দির মধ্যে হয়তো বাংলা ভাষা তথা সাহিত্য আর তেমন বেশিদিন টিকবে না, কতিপয় পূর্বলক্ষণ দেখে অন্তত সেরকম সন্দেহ হয়।' (পৃ [৫]) কিন্তু এই মন্তব্য যদি বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে যেতেন তিনি, তাহলে হয়ত তাঁর মতো ধীমানের পক্ষে লক্ষ করা দুরূহ হ'ত না, এমন পরিণতি অনেকটাই ঘটল কিন্তু এ-রাজ্যের বাঙলা-মাধ্যম বিদ্যায়তনগুলির অধঃপাতের ফলেই ; আর তা হ'তে দিলেন যে শাসকগোষ্ঠী, শ্রীমিত্র তাঁদেরই একজন। ৪০ দশকের 'খুদে' পত্রিকা ব'লে যিনি 'চতুরঙ্গ'কে সম্মান দেন, তিনিই আবার খুদে পত্রিকার বর্তমান বিস্তার সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্যে কোন আশার আলো দেখতে পান না ঐ উচ্ছ্বাসবিহ্বলতায়। ভুলে যান, এক সময়ের খুদে পত্রিকা যদি ৫০ বছর পরে আজ সম্ভ্রান্তের মর্যাদা পায়, এখনকার কোন অনতিগোচর পত্রিকারও আগামী শতাব্দীর অর্ধেক পেরিয়ে সে-সম্ভ্রম পাওয়া অসম্ভব নয়।

এই স্ববিরোধের দায় কেবল সম্পাদকের ওপর আরোপ করলে অন্যায় হবে। যে-যুগের প্রমাণপ্রশস্তি রচনা করতে নিয়েছেন তিনি, তারই মূলে ছিল স্বরূপের সংকট। তা সত্ত্বেও—এবং হয়ত সেই কারণেই, না-মেনে উপায় নেই, কয়েক দশক আগেও বড়ো ও মাঝারি সাহিত্যপত্রিকার প্রবল উপস্থিতি ছিল বাঙলা সাহিত্যে। ২০, ৩০ বা ৪০ দশকে অবিভক্ত বাঙলায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের বিস্ফোরণ একাধিক সাহিত্যপত্রের উদ্দাম সম্ভব ক'রে তুলতে পেরেছিল—যদিও দীর্ঘস্থায়িত্ব পাওয়া সম্ভব হয়নি অধিকাংশেরই। 'চতুরঙ্গে'র প্রকাশ (1938) পর্যন্ত ২০ ও ৩০ দশকের কয়েকটি পত্রিকা ছিল : 'বঙ্গবাণী' (1922), 'ধূমকেতু' (1922/1931), 'কল্লোল' (1923), 'শনিবারের চিঠি' (1924), 'লাঙল' (1925), 'কালিকলম' (1926), 'উত্তরা' (1926), 'প্রগতি' (1927), 'বসুধারা' (1928), 'মহাকাল' (1929), 'রবিবারের লাঠি' (1930), 'জয়শ্রী' (1930), 'পরিচয়' (1931), 'পূর্বাশা' (1932), 'দেশ' (1933), 'কবিতা' (1935)। এই সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (1922) ও 'যুগান্তর' (1937)। মনে রাখা দরকার, তখনও 'প্রবাসী' (১৯০১), 'ভারতবর্ষ' (1912), সাপ্তাহিক (1896) ও মাসিক (1922) 'বসুমতী' ছিল বড়ো সাময়িকপত্র। অসম্ভব নয়, এগুলির সম্পাদকদের প্রতিপত্তি, সম্পাদক হয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ বহু লেখককেই এক বা একাধিক সাময়িকপত্রের অধিকারী হওয়ার বাসনা জুগিয়েছিল। 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রগতি' 'পরিচয়' 'পূর্বাশা' 'কবিতা' 'চতুরঙ্গ' তখন ছিল খুদে পত্রিকারই দলে গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা হ'ত বড়ো পত্রিকা আর করতেন প্রবীণরা। নবীনদের উৎসাহ ছিল স্বাভাবিকভাবেই খুদেদের জন্য। ৩০ দশকের প্রমুখ কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী ছাড়া প্রায় সকলেই সম্পাদনার দায় যেচে নিয়েছিলেন : সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র, সঞ্জয়,

বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, সমর সেন, এমনকি নামত হ'লেও জীবনানন্দ পর্যন্ত। পত্রিকার সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছিল তখন থেকেই।

তবে শুধু পরিসংখ্যানে মুগ্ধ না-হয়ে যদি কেউ এইসব পত্রিকার পাতা উল্টে দেখেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন, লেখকগোষ্ঠী, সামান্য অদলবদল ছাড়া প্রায় অপরিবর্তিত; সংকলিত রচনা, দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, একান্তভাবেই সাহিত্য-নির্ভর। তার মধ্যেও বিষয়সঙ্গতিতে কোন যোগসূত্র তাঁরা আনতে পেরেছেন কদাচ কোন সংখ্যায়। লেখক তৈরি বা আবিষ্কারের চাইতে পরিচিত বন্ধুবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন লেখকগোষ্ঠী। বড়ো পত্রিকায় যত মহিলার লেখা প্রকাশ পেত, তার তুলনায় বিস্ময়করভাবে সংখ্যাল্প ছিল তাঁদের রচনাপ্রকাশ খুদে পত্রিকায়। দেশ ও জাতির জীবনে নেমে-আসা ক্রমান্বয় বিপর্যয়— বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ— তাঁদের অপাপবিদ্ধ অলীক সাহিত্যবাসনাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। সম্পাদক যদিও বলেছেন, 'চতুরঙ্গে'র প্রথম পর্ব, চেকোস্লোভাকিয়ার তলিয়ে যাওয়া থেকে শুরু ক'রে মহাযুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর পেরিয়ে গ্লানিসমাচ্ছন্ন দেশভাগ-স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মুহূর্ত: এই পটভূমিতে বাঙালি মনীষীকবিসাহিত্যিক সম্প্রদায় যেমন 'পরিচয়' পত্রিকায়, অনুরূপ 'চতুরঙ্গে', সৃষ্টির তিতিক্ষায় নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন। বাঙালিদের পক্ষে বড়ো যন্ত্রণার সময় ছিল সেটা, বর্তমান সংকলন অন্তত সাক্ষ্য বহন করবে, সেই যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের অন্বেষণেও খামতি ছিল না। (পৃ [৯]) কিন্তু আত্মপ্রসন্ন বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়— দু-চারজন সম্মানিত ব্যতিক্রম ছাড়া— সত্যিই কতটা বিদ্ধ হয়েছিলেন এ-দুর্যোগে? নাকি এক আত্মরতির নির্বেদে পৌঁছেছিলেন তাঁরা, না-হ'লে এই যন্ত্রণার কোন স্বাক্ষর কেন আমরা পাবনা শুধু 'চতুরঙ্গে' নয়, তার সমবয়সী প্রায় কোন সাহিত্যপত্রে? 'তিরিশ-চল্লিশের দশক-জোড়া ঘটনাবলীর স্মৃতি ক্রমশ ধূসর থেকে ধূসরতর' (পৃ[৫]) তাহ'লে আজ হয়নি; সমকালের ভাবুক-শিল্পীদের অনচ্ছ মনেই ধূসর ছিল তার প্রতিফলন। সন-তারিখের সংখ্যাগুলো সরিয়ে নিলে লেখার মধ্য থেকে কি বোঝবার কোন উপায় থাকবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমকালের পত্রপত্রিকা এগুলি? এসব সত্ত্বেও, কালের নিয়মে যখন তাদের একদা তরুণ সম্পাদক ও লেখকেরা প্রবীণ বয়সে সামাজিক গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠা পেলেন, তাঁদের সাহিত্যপত্রগুলিও কৌলীন্য পেল। খুদেরা বড়ো হয়ে ওঠার এই সামাজিক প্রক্রিয়া ঐতিহাসিক কারণেই মান্য।

'চতুরঙ্গে'র মতো দীর্ঘজীবী একটি পত্রিকার রচনা সংকলন অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বাজারমুখী ও মুনাফাপ্রবণ না-হ'য়েও কী ক'রে সম্ভব হ'ল এই দীর্ঘায়ু, কোথায় তার যথার্থ গুরুত্ব ও অভিঘাত, আবিষ্কার করাই সম্পাদকের পক্ষে গবেষণাতুল্য হয়ে ওঠে। এই দীর্ঘ পর্বে এক-একটি খণ্ডের পর্বাঙ্গকেই একক ধ'রে, নাকি খণ্ডসমবায়ে সমগ্র সংকলটিকেই গ্রন্থের এককে গ্রহণ করবেন সংকলক? লেখার মান বা লেখকের নাম কোনটি প্রধান হবে তাঁর কাছে: লেখা ভালো হ'লে একই লেখকের একাধিক লেখা, সংখ্যায় ভারসাম্য হারালেও, কি গৃহীত হবে সংকলনে? অথবা শ্রেষ্ঠ রচনাটিই প্রতিনিধিমূলক হিসেবে গ্রহণ করবেন তিনি? একালীন পাঠকের রুচি ও প্রত্যাশা মনে রেখেই কি সংকলন করা হবে, নাকি প্রকাশকালীন মনোভাব বা তার বিবর্তনই প্রাধান্য পাবে? বর্তমানে অন্যত্র পুনর্মুদ্রিত লেখাগুলির তুলনায় অলভ্য অপুনর্মুদ্রিত লেখার প্রতিই কি পক্ষপাত থাকবে তাঁর? আর সবচাইতে জটিল, কোথায় টীকা হবে নিছক সূত্রমূলক, কোথায় তথ্যমূলক আর কোথায়ই বা বিশ্লেষণধর্মী, নির্ধারণ করতে হয় সম্পাদককেই। শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত "চতুরঙ্গ থেকে" পত্রিকাটির প্রথম ন-বছরের নির্বাচিত সংকলন। তিনি প্রায় বড়ো হয়ে উঠেছেন এই পত্রিকার সঙ্গে; তা যেমন অনেকটা সহজ করতে পারে তার দায়িত্ব, আবার কমবয়সের কোন কোন উপলক্ষময় স্মৃতি কঠিনও ক'রে তুলতে পারে তাঁর নির্বাচন। তবে শ্রীমিত্র এমন কোন ভাবনার মধ্যেই যাননি। অকপটে— এবং পাঠককে নিরস্ত করতে— তিনি প্রথমেই আট তুরুপ ক'রে দিয়েছেন: 'এই নির্বাচন একান্তই ব্যক্তিগত, একজন বিশেষ মানুষের রুচি-অভিরুচি-বিবেচনার প্রতিফলন। আমার নির্বাচন, আমি ধরেই নিচ্ছি, অন্য অনেকেরই তেমন মনে ধরবে না। ...উৎকর্ষ-অপকর্ষের মানদণ্ডে আমার বাছাইকে ঠাসবুনুনি যুক্তি দিয়ে সমর্থন জানানো আমার নিজের পক্ষেই সম্ভব নয়।' (পৃ[৬]) এর পরে সম্পাদকীয় নির্বাচন নিয়ে কথা চলেনা। তবে পাঠকেরও কিছু বিবেচনা বা বাহাস থাকতে পারে।

অন্তত এই খন্ডের পরিকল্পনা একসঙ্গে ন-বছরের সংখ্যাগুলি দেখে করা হয়েছে ব'লে মনে হয়না। প্রথম দিকের থেকে লেখার সংখ্যা বেশি, ক্রমে সংখ্যা কমতে-কমতে পঞ্চম বর্ষে দুটি সংখ্যা থেকে চারটি, সপ্তমে একটি সংখ্যা থেকে একটি, অষ্টমে একটি সংখ্যা থেকে দুটি রচনা মাত্র সংকলিত হয়েছে। যেহেতু বইয়ের শেষে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র ছাপা হয়েছে, তার থেকে মনে হয়, অনুপস্থিত সংখ্যাগুলো পাননি ব'লে লেখা সংকলিত হয়নি, তা নয়।

প্রবন্ধ নির্বাচনে সম্পাদকের খুশি যদি মানদন্ড হয়, না-মেনে উপায় থাকেনা, তা পাঠককেও খুশি করে। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র সিংহ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুশোভন সরকার, সৈয়দ মুজতবা আলী আর স্বয়ং সম্পাদক হুমায়ুন কবীরের

প্রবন্ধ যে-কোন পত্রিকার— তখনকার বা এখনকার— পক্ষে উজ্জ্বল সংগ্রহ। 'সে-যুগের প্রতিটি বিখ্যাত জনের রচনা, সেই সঙ্গে যাঁরা কয়েক বছর বাদে বিখ্যাত হবেন, তাঁদের (পৃ[৭]) গল্প যে প্রকাশ পেয়েছিল 'চতুরঙ্গে'— সম্পাদকের এই দাবি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য ব'লে মনে হয় যখন দেখি, তারাশঙ্কর -বিভূতিভূষণ - প্রেমেন্দ্র - অচিন্ত্যকুমার - সরোজকুমার - সঞ্জয় - বুদ্ধদেব - মনোজ বসু - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - বিমল মিত্র - সন্তোষকুমার - নারায়ণ - নরেন্দ্রনাথ - অমিয়ভূষণ - রমাপদ — সত্যি কার-না গল্প প্রকাশ পেয়েছিল এই পত্রিকায়! বর্তমান আলোচকের মতো অনেকেই 'চতুরঙ্গ থেকে'র সম্পাদকের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন, এই অলক্ষিত দিকটি উন্মোচনের জন্য। আলোচনা বা গ্রন্থপরিচয় অংশ অবশ্য বেশ দুর্বলই এই সংগ্রহে। ধার বা ভার দুয়েরই অভাব। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, পরিমল রায়ের, একটি থাকলেও মন ভরিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে বিশেষভাবে ভালো লাগে বাঙলা ভাষা ব্যবহারের মুনশিয়ানা— যেমন প্রাঞ্জল তেমনি সাবলীল। লক্ষ করবার মতো, তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার পর থেকে কবিতা বিরল হয়ে এল এই সংকলনে, প্রবন্ধের গৌরবের স্থান ক্রমে অধিকার ক'রে নিল গল্প। মূল পত্রিকার চারিত্র্যে এই পরিবর্তন বিশ্বস্তভাবে ধরা পড়ে 'চতুরঙ্গ থেকে'তে। 'চতুরঙ্গে'র কার্যাধ্যক্ষ আতাউর রহমানকে তিনি যে-সম্মান দিয়েছেন তা দৃষ্টান্ত বিশেষ। সম্পাদক হুমায়ুন কবীরও আরো একটু গৌরব পেতে পারতেন বর্তমান সংকলকের কাছে।

নির্বাচনে সম্পাদকের খুশিকেই চূড়ান্ত মনে করলেও একটু অবাকই লাগে যখন দেখি বাদ পড়ল আশরাফ সিদ্দিকী-আহসান হাবিব-গোলাম কুদ্দুসের কবিতা, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর গোগলের গল্পের সমালোচনা, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের 'কারাকাহিনী' অনুবাদ, ইউসুফ মেহের আলীর শরৎচন্দ্র বিষয়ে প্রবন্ধ। উর্দু ভাষা-সাহিত্য সাহিত্য বিষয়ে দুটির মধ্যে একটি রেখে আনা যেত তামিল বিষয়ে প্রবন্ধটি। শ্রীচন্দ্র সেনের জয়েস্ ও উল্‌ফ্ বিষয়ে লেখাদুটি একটির বদলে আসা সঙ্গত ছিল হুমায়ুন কবীরের ইয়েট্‌স্ প্রসঙ্গে লেখা। হুমায়ুন কবীরের 'বাঙলার কাব্যের মধ্যবর্তী' একটি অধ্যায় বা 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র মাঝখান থেকে সপ্তম, নবম ও দশম খণ্ডের সমালোচনা কেন বাছা হ'ল, স্পষ্ট নয়। খুশি ছাড়া 'চাঁদ ও রাহু'র সমালোচনা কি ঠাঁই পেত আদৌ? প্রতিভা বসুর "গানে গায়কের স্বাধীনতা" খুশি ছাড়া বাদ পড়তনা বা 'উদয়ের পথে'র সমালোচনাও নয়। কিন্তু সম্পাদককে অমনোযোগী বললেও কম বলা হবে এ-সংগ্রহে বটকৃষ্ণ ঘোষের একটি রচনাও রাখলেননা ব'লে। বাংলায় মার্ক্সীয় আলোচনার ধারা বিষয়ে যথেষ্ঠ ওয়াকিফ্ হ'লে এ-বর্জনে তাঁর সন্তুষ্টি অটুট থাকত না। আর গান্ধী বিষয়ে একটি লেখাও— আলী আশরাফ বা অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধ বা লুই ফিশারের গান্ধীস্মৃতির সমালোচনা — যে রইলনা এই বইয়ে, তা সংকলন ও সম্পাদক কারও পক্ষেই গৌরবের হ'লনা।

শ্রীঅশোক মিত্র ও তাঁর লেখার গুণমুগ্ধ হ'লেও স্বীকার না-ক'রে উপায় থাকে না, এ-কাজ তিনি সযত্নে সমাধা করেননি। করলে তিনি নিশ্চয়ই পাঠকদের ধরিয়ে দিতেন বিমলচন্দ্র সিংহের "কাব্যে নবযুগ" 'কবিতা'য় অতুলচন্দ্র গুপ্তের আলোচনার আলোচনা বা 'চতুষ্কোণে'র আইয়ুবকৃত সমালোচনা নিবন্ধই হ'ল "সাহিত্যে যৌনপ্রসঙ্গ..."। অনুবাদগুলির মূল সূত্র বিষয়েও সম্পাদক নীরব। আসলে কোন টীকা দেওয়াই বাহুল্য বোধ করেছেন সম্পাদক। অথচ 330 পৃষ্ঠায় হঠাৎ দেখি 'চিঠিপত্র ১১'র উল্লেখ। ১৩৮১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বইয়ের সূত্র নিশ্চয়ই ১৩৪৯-এর পত্রিকায় ছিলনা। তাঁর মতো আন্তর্মহাদেশিক বিদ্বান্ কি একটু মনোযোগী হ'লে সম্পাদনার আন্তর্জাতিক মানের নজির ক'রে তুলতে পারতেন না 'চতুরঙ্গ থেকে' সংগ্রহকে? তাঁদেরই তো পারবার কথা। নাকি তাঁর কাছেও বাঙলা লেখালেখি দ্বিতীয় বা তদেতর স্তরের কাজ?

ন-বছরের সূচিপত্র সংকলিত হয়েছে সংগ্রহের শেষে। এই সূচির নির্ভর না থাকলে বর্তমান আলোচক এত কথা বলার সুযোগই পেতেনা। বিদ্যা কি এমনই গুরুমারা? 'মেনে নিই সে-নিন্দার কথা।' □

■ "'চতুরঙ্গ থেকে' প্রথম খণ্ড'
— অশোক মিত্র সম্পাদিত
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩
পৃ. [১৬]+৪৯৫, ১৯৯৬ / ১৭০ টাকা।

প্রতিভা বসুর এই আত্মকথা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রতিভা বসুর এই আত্মকথায় আমরা একই সঙ্গে খুঁজে পাই একাধিক মাত্রা। একে তো তিনি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, সেই অধিকারেই তিনি জানাতে পারেন নিজের কথা। সেই সঙ্গে তিনি এই বাংলার এক প্রধান কবি-ঔপন্যাসিক-প্রবন্ধকার-নাট্যকারের সহধর্মিণী। সুতরাং নিজের কথার বাইরে এই বইয়ের অনেকাংশ, এমন কি অধিকাংশই জুড়ে রয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু বুদ্ধদেব তো শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি এক ব্যক্তিত্ব; তার চেয়ে বড় কথা, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। তাই তাঁর সূত্রে

এই আত্ম কাহিনীতে এসে গেছেন কত বিখ্যাত কুশীলব। তাঁরা বিখ্যাত তো অবশ্যই, সেই সঙ্গে বিচিত্র চরিত্রেরও বটে।

বুদ্ধদেব বসু-প্রতিভা বসু সম্ভবত আমাদের সবচেয়ে সুপরিচিত সাহিত্যিক দম্পতি। কিন্তু সাহিত্যিক হওয়ার আগে প্রতিভা সোম ওরফে রানু সোম যে ছিলেন এক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী সে-কথা এই দম্পতির সাহিত্যিক খ্যাতির আড়ালে হারিয়ে গেছে। বিয়ের আগেই তিনি অনেক গান রেকর্ড করেছিলেন এবং তা যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছিল (একটি ছায়াছবির নেপথ্যশিল্পী হওয়ার আমন্ত্রণ আসায় কী বিভ্রাট হয়েছিল সেই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীও জানা গেল)। আর এই গানের সূত্র ধরেই কত দিকপালের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কাজি নজরুল ইসলাম, নলিনী কান্ত সরকার থেকে শুরু করে দিলীপ কুমার রায় এবং, সবচেয়ে বড় কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত।

ঢাকার বাড়িতে নজরুলের আকস্মিক আবির্ভাবের ছবিটি আঁকা হয়েছে নিপুণভাবে। নজরুলের অন্তরঙ্গ রূপটি ধরা পড়েছে কয়েকটি চমৎকার আঁচড়ে: "গানের সময়ে তাঁকে দেখাও গানের একটা অঙ্গ। সুরের তরঙ্গে তাঁর সারা শরীর যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠত। চোখের মণি জ্বলজ্বল করত, গানের প্রতি ভালোবাসার আবেগ লাবণ্যের আধার হয়ে ধরা দিত। গানের প্রাণ যেন মূর্ত হয়ে সারা ঘরের সব আবহাওয়াকে আনন্দসাগরে ভাসিয়ে রাখত।" নজরুলের কীর্তন লেখার শুরুর কথা যেমন আকর্ষক, তেমনই ঢাকার রাস্তায় পাড়ার ছেলেদের হাতে তাঁর প্রহৃত হওয়া এবং তাঁর রুখে দাঁড়িয়ে পাল্টা মার দেওয়ার ঘটনাও কম চমকপ্রদ নয়।

দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়ের সুযোগের কথাও প্রতিভা বসু লিখেছেন খুব চমৎকারভাবে। এখানেও যোগসূত্র দিলীপকুমার। শুধু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের সুযোগই নয়, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে গান শেখার সুযোগ। কিন্তু কবি যে "ঢাকার একটা শ্যামলা রোগা লম্বা বাঙাল মেয়েকে" একটি অনুষ্ঠানে গানে লিড দিতে বলেছিলেন এবং একলা গান গাইতে দিয়েছিলেন সেটা কবিকে যে-সব মহিলা ঘিরে রাখতেন তাঁদের সকলের ভালো লাগেনি। রবীন্দ্রনাথকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ অবশ্য পরেও তাঁর হয়েছে।

এখানে একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছে হয়। গানের জগৎ থেকে প্রতিভা বসু নিজেকে কেন ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলেন? লেখালেখির ব্যাপার এসেছিল, সংসারের চাপ এসেছিল, তবু গানের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় ছিল না।

এক হিসেবে দেখতে গেলে বুদ্ধদেবের সঙ্গে পরিচয়, প্রণয় ও বিবাহ প্রতিভার জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা, কারণ তা-ই পরবর্তী পর্বগুলিকে প্রভাবিত করেছে প্রবলভাবে। যে-কোনো নারীর জীবনেই অবশ্য বিবাহ সবচেয়ে বড় ঘটনা হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মতো একজন মানুষের সঙ্গে বিবাহ অবশ্যই একটু অন্য তাৎপর্য বহন করে। সাহিত্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ বুদ্ধদেব, সাহিত্যই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞই শুধু নন, উদাসীন। এমন একটি মানুষকে নিয়ে সংসার করাই তো নয়, এমনভাবে সংসার করা যাতে তাঁর সাহিত্য-সাধনার কোনো বিঘ্ন না হয়। সেই সঙ্গে সব দিক সামাল দেওয়া।

বুদ্ধদেবের অনুরাগী, অথবা বলা উচিত বুদ্ধদেবের লেখার অনুরাগী প্রতিভা বিয়ের আগে থেকেই ছিলেন। দিলীপ রায়ের ভাষায় বুদ্ধদেব তখন "ঢাকার সেরা ছেলে"। সেই বুদ্ধদেবের সঙ্গে পরিচয় ও পূর্বরাগের ছবি খুবই সংযতভাবে বলা হলেও তা কম আকর্ষক হয় নি; এই বিয়ে নিয়ে কোনো কোনো আত্মীয়স্বজনের আপত্তির কথা বেশ গুছিয়েই লেখা হয়েছে। বিয়ের পরও দিদিমাকে (অর্থাৎ বুদ্ধদেবকে যিনি মায়ের মতো করে মানুষ করেছিলেন) নিয়ে কম গোলমাল হয় নি। দীর্ঘ দিন ধরে সংসার সামলানোর জন্য প্রতিভাকে করতে হয়েছে অসচ্ছলতার সঙ্গে সংগ্রাম এবং প্রায় একা হাতে। এই প্রসঙ্গে আর এক বিখ্যাত দম্পতি, সুধীন্দ্রনাথ-রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করেছেন সুন্দরভাবে। কারণ সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী স্বামী এবং রাজেশ্বরীকে নানা বিষয়ে মাথা ঘামাতে হত না। তবে প্রতিভা বসুর কোনো অভিযোগ নেই। তাই তিনি লেখেন: "তথাপি একটা কথা গোড়া থেকেই আমার মাথার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল, এমন এক বিরল প্রতিভার ভার যখন ঈশ্বর আমার হাতেই সঁপে দিয়েছেন তখন সাধ্য মতো তাঁকে বিব্রত না করাই আমার কর্তব্য।"

চরিত্র হিসেবে যারা এসেছেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাতরা আছেন অনেকেই। বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, শান্তিনিকেতনের ডঃ সুধীন ঘোষ, কবি অজিত দত্ত, সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এক ও অদ্বিতীয় শিব্রাম চক্রবর্তী। শেষোক্তের ছবিটি ফুটে উঠেছে চমৎকার। শিব্রামের লেখটেখা আজকাল আর ছেলেমেয়েরা তেমন পড়ে না বলে আক্ষেপ করেছেন প্রতিভা যা অত্যন্তই সঙ্গত। শিবনারয়ণ রায় থেকে আরম্ভ করে অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র পর্যন্ত আরও অনেকেই এসে গেছেন অনিবার্যভাবে। প্রতিভা বসুর 'পাগলা-জামাতা' জ্যোতির্ময় দত্ত অন্তত একটি অকপট মন্তব্যে কৌতুক বোধ করবেন। প্রতিভা দেবী স্বপ্নের জামাতা হিসেবে চেয়েছিলেন অশোক মিত্রকে!

যদি এই সমালোচককে কেউ জিজ্ঞেস করেন, এই প্রায় চারশ পৃষ্ঠার কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে নাড়া দিয়ে যায় কোন্ অংশ, তবে নির্দ্বিধায় বলতে হবে, তা হলো পুত্র শোকাতুর এক মায়ের কথা। শুদ্ধশীল বা পাপ্পার অকালমৃত্যু পর "আমি অনুভব করলাম আমার বুকের ভিতর থেকে কে যেন উপড়ে টেনে ছিঁড়ে আমার হৃতপিণ্ডটা খসিয়ে নিল। আমি জানলাম পৃথিবীতে দৈহিক এবং মানসিক যতো দুঃখ বেদনা অপমান লাঞ্ছনা এমন কি অতি প্রিয়জনের মৃত্যু শোকই হোক না কেন, সন্তান বিয়োগের সমতুল্য কিছুই নয়। এবং মানুষের সহ্যশক্তি অপরিসীম। তা না হলে আমার মৃত্যু হল না কেন?" এই আত্মকাহিনী শেষও হয়েছে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষার কথা দিয়ে।

এই কাহিনী পাঠ শেষ করার পর একটি অভিযোগ কিন্তু থেকেই যায়। আমরা গৃহিনী সচিব সখা প্রতিভা বসুর কথা বিস্তারিতভাবেই জানতে পারলাম, কিন্তু তেমনভাবে জানতে পারলাম না সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর কথা। তিনি বেশ কিছু লিখেছেন, বেশ কিছু উৎকৃষ্ট লেখাই লিখেছেন, কিন্তু সেই সব লেখার প্রায় কোনো কথাই নেই, নেই তাঁর সাহিত্যজীবনের বিশদ কোনো বিবরণ। নিজেকে আড়ালে রেখে আত্মকাহিনী লেখাই হয়ত উচিত, হামবড়াই পাঠকের ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু তাই বলে নিজের সাহিত্যিক সত্তাকে প্রায় পুরোপুরি ঢেকে ফেলাও কি উচিত? □

■ **জীবনের জলছবি** — প্রতিভা বসু
আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কল-৯ / ৭৫ টাকা।

প্রভুত্ব বনাম হৃদয়

মীনাক্ষী ঘোষ

"...নারী আজও যেন সেই নতুন কাপড়ের যবনিকার আড়ালে অবমানিতা চিরন্তনী নারীর আত্মাকে লুকিয়ে রেখে দিলে, যেখানে কোন পুরুষের—অন্ন-আশ্রয় দাতার প্রবেশাধিকার নেই।" (নোরা ও নারী: ২১৬: ৩য় খণ্ড)

যুগ যুগ ধরে অন্ন-আশ্রয় দিয়ে পুরুষ শুধুই প্রভুত্ব লাভ করেছে, নারীর হৃদয়ের অংশীদার সে হ'তে পারেনি। অর্থের বিনিময়ে নারী-দেহকে সে ক্রয় করেছে মাত্র, আত্মাকে জয় করতে পারেনি।

উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধতে লেখিকা বার বার বিভিন্ন উপায়ে এই স্থূল পৌরুষের দীনতাকে তুলে ধরেছেন; এই নিরেট প্রভুত্বের দেওয়াল ভেঙে নারীর মুক্তিপথ নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আবার কখনো বা তিনি অন্ন-আশ্রয় দাতা মাত্র পুরুষকে নারীর হৃদয়ের দরজাটির বাইরে ভিখিরির মত দাঁড় করিয়ে রেখে করুণা যোগ্য করে তুলেছেন (উদাহরণ স্বরূপ চতুর্থ খণ্ডের ছোট গল্প 'প্রতিলোম'-এর ব্রজেনকে স্মরণ করা যেতে পারে।)

নারীবাদী লেখিকা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, "আমরা সন্তান হয়ে জন্মাই বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি সন্তান নই। আসলে একটা মেয়ে মাত্র।" (সন্তান: ৩২৩: ৩য় খণ্ড) এই 'মেয়ে মাত্র' দের নিঃস্বতার সমারোহে সুসমৃদ্ধ হয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন। অজস্র নারী চরিত্র দেখিয়েছেন তিনি যাদের মধ্যে মহত্ব এবং মনুষ্যত্ব সমুজ্জল কিন্তু সে ঐশ্বর্যের কোন স্বীকৃতি নেই পুরুষ-প্রভুর রাজত্বে। নায়িকারা যেখানে চিন্তাশীলা সেখানে তার চিন্তা সম্পর্কে পুরুষকুল সচেতনই নয় আবার যখন নারী স্নেহশীলা, সেবাময়ী, স্বার্থত্যাগে তৎপর তখনও সে পুরুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণে অক্ষম কারণ পুরুষের পায়ের নীচে তার স্থান। উদাহরণ হিসাবে 'নোরা ও নারী' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। গল্পের প্রথমে দেখা গেছে ইরা এবং তার স্বামীর মধ্যে সাহিত্যচর্চা এবং মানসিক আদান প্রদান চলছে বেশ সমানভাবে। এতেই স্বামী সোহাগিনী ইরা বিশ্বাস করে ফেলেছে বুঝি তার স্বামী প্রভুমাত্র নয়, বুঝি তার স্থান স্বামীর সিংহাসনের নীচে নয়, হৃদয়ের পাশে। কিন্তু সময় এলেই ইরা বুঝতে পারে যে গৃহস্থালী এবং গৃহস্থ সম্পদকে সে একান্ত আপনার জ্ঞান করে এসেছে তাতে আসলে তার কোন অধিকারই নেই। সামান্য এক টুকরো কাপড়ও নিজের বিবেচনা অনুযায়ী কাউকে দেবার মত স্বাধীনতা তার নেই। একারণে স্বামী তাকে অনায়াসে তিরস্কার করে বলতে পারে "তোমার এত খয়রাত করবার ইচ্ছা কোত্থেকে জন্মায় বলেতো?" (পৃ. ২১২: ৩য় খণ্ড) আবার যেদিন স্বামীর ইচ্ছা হয় সেদিন পত্নীর জন্য নতুন শাড়ি কিনে আনে সে, কিন্তু ইরার সূক্ষ্ম অথচ তীব্র অপমানবোধকে অনুভবই করতে পারে না। স্ত্রীজাতীর এই গ্লানিকে লেখিকা প্রকাশ করেছেন শানিত শব্দে—"খয়রাতের অধিকার যার নেই, তার নেওয়াকে কি বলে? বকশিস?"

এই জাতীয় দাসীত্বের যন্ত্রনা থেকে মুক্তিকামী একটি নারী জীবন সৃষ্টি করা হয়েছে ৩য় খন্ডের একমাত্র উপন্যাস 'ছায়াপথ'-এ। যদিও পরিণামে নায়িকার মুক্তিচিন্তা প্রেম চিন্তার রহস্যময় ঘেরা টোপের মধ্যে অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে। উপন্যাসের পরে সংযোজিত হ'য়েছে ছাব্বিশটি গল্প, অধিকাংশই নারীজীবনের নানা সমস্যার কেন্দ্রে আবর্তিত, অল্প সংখ্যক গল্পের বিষয় দেশভাগের করুণ পরিণতি (যেমন, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা)। এছাড়া আছে লেখিকার তীর্থ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৬টি রচনা এবং একরাশি কবিতা। কবিতাদের অবয়ব প্রাচীন। তবে কোনো কোনো কবিতার বিষয় বস্তু চিরকালীন। যেমন—"সমস্ত জীবনটাই যেন অবিচ্ছিন্ন প্রশ্নময় যদির মতন।

ঘিরে আছে চারিদিকে। টেনে নেওয়া যদি যেত কাছে একটা 'যদি'কে। (পৃঃ৩৭৪)

৪র্থ খণ্ডের ১৯টি প্রবন্ধে নারী জীবনের বিভিন্ন সমস্যা খুব বিস্তৃত এবং নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। সারা বিশ্বের নামী দামী পুরুষেরা (যেমন শোপেন হর, কাইসার লিং প্রভৃতি) যুগ যুগ ধরে কত অশ্রাব্য, অবজ্ঞা সূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন স্ত্রী জাতি সম্পর্কে তার নমুনা পাওয়া যাবে কিছু প্রবন্ধে এবং সে সম্পর্কে বেশ মনোজ্ঞ আলোচনাও করেছেন লেখিকা। নারী বিষয়ক প্রবন্ধ গুলি অনেকদিনের পুরানো হলেও তারা আধুনিকতম নারী মুক্তির হাতিয়ার হবার যোগ্যতা রাখে। সে তুলনায় তৃতীয় খণ্ডের ১১টি ব্যাঙ্গ প্রবন্ধ একালের বাতাসে টিকতে পারবে ব'লে মনে হয়না।

৪র্থ খণ্ডের উপন্যাস 'হরিজন উন্নয়ন কথা' একটি আশার আলোকস্তম্ভ।— "শূদ্রযুগ এল বলে"। এ উপন্যাসের মূল বিষয় নারীবাদ নয় জাতিভেদ। যদিও গল্পের মূল চরিত্র নারী এবং হরিজনদের উন্নয়ন প্রচেষ্টার কাহিনী বলা হয়েছে হরিজন-নারীর প্রগতি প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে।

উপন্যাসটির বিষয়বস্তু লেখিকার অন্যান্য উপন্যাস থেকে ভিন্ন হ'লেও স্বাদে কিন্তু বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। কারণ এখানে অন্যায় অবিচার অথবা আশার বাণীকে রাখা হ'য়েছে জ্যোতির্ময়ীদেবীর সেই পরিচিত ভঙ্গিমাতেই। স্পষ্টই দেখা যায় নম্র স্নিগ্ধ কল্যাণী একটি ব্যক্তিত্ব আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করে গেছে তাঁর কলমকে।

হরিজন উন্নয়ন কথা কত হাতে লেখা হ'তে হ'তে মহাভারতের আকার নিয়েছে ভারতবর্ষে। সে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে দগ্ধ হয়েছে কত তরতাজা প্রাণ, কত সবুজ গৃহস্থালী। সেই সব জ্বলন্ত ইতিহাস, দুরন্ত অত্যাচারের নজির যদি কেউ খুঁজতে যায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'হরিজন উন্নয়ন কথা' উপন্যাসে তবে তাকে হতাশ হতে হবে। কিন্তু সে সব না থাকলেও এ কাহিনীতে অনুভব করা যায় মানুষের পশুবৎ জীবন যাপনকে। দেশের একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র, অবহেলায় ভরা এমন এক ঘোর অন্ধকার জগতে বাস করে যে তারা নিজেদের উন্নতির কথা কল্পনা করতেও সাহস পায় না এবং তাদের উন্নতির প্রকল্প নিয়ে চলে নানা রকম রাজনৈতিক প্রহসন— এ সত্য লেখিকার অনুভবী কলমে স্পষ্ট হতে পেরেছে। এই পরিবেশের মধ্যে কাহিনীর নায়িকা লেখাপড়া শিখে 'বিবিজী'-দের মত ভদ্র জীবন যাপনের নজির সৃষ্টি করেছে, বাল্য বিবাহের কঠিন বিধি অতিক্রম ক'রে নার্স হয়েছে এবং অবশেষে ভিন্ন সমাজে বিয়ে করেছে। অর্থাৎ নায়িকার মধ্যে দিয়ে লেখিকা সমাজের এক আমূল পরিবর্তনের ছবি সৃষ্টি করেছেন।

উন্নতির অভিমুখে সামাজিক পরিবর্তনের পথ দেখবার চেষ্টা লেখিকা ক'রে গেছেন আজীবন। এব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা এবং লেখন-শক্তি প্রশংসনীয়। আবার অন্যদিকে বলা যায় স্রষ্টার থেকে কখনো কখনো সংস্কারকের সত্তা প্রবলতর হয়ে ক্ষুন্ন করেছে শিল্প কর্মকে। অত্যাচারিতদের প্রতি অতিরিক্ত দরদ গল্পের বাস্তবতায় ত্রুটি এনেছে। যেমন, 'চিরকালীন' গল্পে দুটি বারবণিতার প্রথম উপস্থিতিটি বেশ বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে ওঠেনি। সেখানে দেখা যাচ্ছে সরিৎ বারবণিতা দুটির দিকে এগিয়ে যেতেই মেয়ে দুটি "লজ্জা ও ভয়ে যেন প্রায় মিশেই গেল দেওয়ালের সাথে।" (পৃঃ ৪৪৫ : ৪র্থ খণ্ড)

অপরিচিত পুরুষ সম্পর্কে এই 'লজ্জা ও ভয়' বারবণিতার পরিবর্তে গৃহস্থ নারী চরিত্রকেই স্মরণ করায়। আসলে যে সহানুভূতি লেখিকার সম্পদ মাঝে মাঝে তারই মাত্রাধিক্য শিল্পীর সংযমকে নষ্ট করেছে।

জ্যোতির্ময়ী দেবী হৃদয় দিয়েই বুঝতে এবং বোঝাতে চেয়েছেন জাতির মুক্তিকে, নারীর মুক্তিকে। কোথাও জবরদস্তি নেই, সর্বত্রই স্নিগ্ধতা। সে কারণে জ্যোতির্ময়ী দেবীর চিন্তাধারা বৈপ্লবিক হ'লেও সমাজে তার ক্রিয়া ধীর এবং অন্তঃশীলা। □

■ জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন,
তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড —
সম্পাদনা : গৌর কিশোর ঘোষ
দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩
৩য় খণ্ড ১৩০.০০ টাকা; ৪র্থ খণ্ড ১২০.০০ টাকা।

না পাবার খেদ রয়েই গেল

রণেন্দ্রনাথ দেব

মীর মশাররফ হোসেন সম্বন্ধে একালে নানা বই প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তনু কায়সারের বইটি নবতম সংযোজন। বইটির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। অধ্যায়গুলিও চিত্তাকর্ষী— জগৎ পরাধীন, কিন্তু মন স্বাধীন, বিষাদ-সিন্ধু-শতবর্ষ পরে, গাজী মিয়াঁর তৃতীয় নয়ন, মীরের আত্মজৈবনিক রচনা বিষয়ে সংশয়, তাঁর নাট্যরচনা। বেশ কৌতূহল নিয়ে বইটি পড়া শুরু করেছিলাম। গ্রন্থের নাম নিয়ে খট্‌কা ছিল। লেখক ভূমিকা হিসেবে বলেছেন—

"মীর মশার্‌রফ হোসেন একদিকে ব্যক্তি, অন্যদিকে শিল্পী। প্রথম মীরকে যদি ব্যক্তি বিবেচনা করি, দ্বিতীয় মীর

তবে শিল্পী। কিন্তু এ দুয়ের দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এক তৃতীয় মীরের। তিনিই এ গ্রন্থের বিবেচ্য।"

বোঝা গেল ব্যক্তি ও শিল্পীর দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়াই লেখক ফোটাতে চেয়েছেন আলোচনাগুলিতে। কিন্তু এ জিনিসটি কতখানি স্পষ্ট হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেল।

সমালোচকের বক্তব্যের প্রধান কটি প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা করছি।

মীর তাঁর প্রথম বিবাহিতা পত্নী আজীজননেসার প্রতি বিরূপ ছিলেন। দুই বোন লতীফন ও আজিজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠা লতীফনের সঙ্গে মীরের প্রণয় ছিল এবং তাঁদের বিবাহ হবে এ-ও স্থির হয়েছিল। কিন্তু বিবাহবাসরে হঠাৎ প্রতারণা করে লতীফনের সঙ্গে এক স্থবির বৃদ্ধের এবং আজীজনের সঙ্গে মীরের বিবাহ দেওয়া হয়। লতীফন ও মীর দুজনেরই জীবন বিষময় হয় এর পরিণামে। লতীফন কিছুকাল পরে রোগে ভুগে মারা যান। মীরও আজীজনকে আজীবন ঘৃণা করেন। তিনি এর পরে কুলসুম নামে এক গুণবতী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। আজীজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং সপত্নীবাদে মীরের গৃহে অশান্তির আগুন জ্বলে। মীর এর কিছুদিন পরে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে এক জমিদারীর ম্যানেজার হয়ে চলে যান এবং দশবছর পরমসুখে কালাতিপাত করেন। সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন, মীর কি আজীজনের প্রতি অবিচার করেন নি? কুলসুমকে বিবাহ করার কিছুদিন পরেই মীর প্রথমা স্ত্রীর নামে "আজীজননেহার" নামে একটি পত্রিকা বার করেন। আজীজনের প্রতি অবিচার করেছিলেন বলেই কি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মীর তাঁর পত্রিকাটি তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নামে চিহ্নিত করেন?

"বিষাদ-সিন্ধুর" জায়েদা চরিত্রটির বিশ্লেষণ করে সমালোচক দেখিয়েছেন জায়েদা যে স্বামীকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছিল তাঁর প্রধান হেতু সপত্নী বিদ্বেষ। জায়েদা চরিত্রকে মীর ঘৃণার্হ করে আকেন নি। তার প্রতি এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সমবেদনা ছিল শিল্পীর। ব্যক্তি মীর ও শিল্পী মীরের এই দ্বন্দ্বটি কৌতূহলজনক।

সমালোচক মীরের আত্মজৈবনিক রচনার বহু অংশ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। লতীফনের বিবাহোত্তর জীবনের বর্ণনা, তাঁর মৃত্যুকালীন অভিমানমন্বিত আক্ষেপ কতদূর সত্য? সমালোচক এ বিষয়ে সন্দেহ গোপন রাখেন নি। বেগম ঠাকুরাণী, সোনা বিবি ও মণিবিবির যে চিত্র এঁকেছেন মীর, সমালোচক মনে করেন তা পক্ষপাতদুষ্ট। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মীর প্রধান হয়ে শিল্পী মীরের কলমকে বিপথে চালিত করেছেন। সমালোচকের এই সংশয় সম্পূর্ণ অকারণ না হলেও বলতে হয় এই তিন প্রতাপশালী মহিলার চরিত্র চিত্রণে মীর যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একশ বছর আগে মুসলমান জমিদার বংশে তিন নারী যেভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, স্বেচ্ছাচারের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন এবং তাঁদের সহযোগী রূপে একাধিক হাকিম ও সরকারি কর্মচারীকে হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁদের জীবন সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল শেষ অবধি অতন্দ্রভাবে জেগে থাকে। নিজ পরিবারের বিষয়ে মীরের বর্ণনাও তেমনি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। একদা ধনবান কিন্তু বর্ত্তমানে নিঃস্ব একটি পরিবারের সন্তানরূপে মীরের জীবনে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল। মীর অকপটে তা ব্যক্ত করেছেন। এতে মানুষ মীর জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছেন। সমালোচক তাঁর সমস্ত তথ্য সত্য বলে স্বীকার না-ও করতে পারেন, কিন্তু মানুষ মীর যে একটি চমৎকার প্রাণবন্ত পুরুষ ছিলেন তাতে সন্দেহ থাকে না।

মীরের আচরণে ও মতামতে অসংগতির অবশ্য অভাব নেই। তিনি "জমিদার দর্পণ" নাটকে জমিদারদের হীনবর্ণে চিত্রিত করেছেন। জমিদার সম্প্রদায়ের জীবন সম্বন্ধে মীরের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এ নাটক লিখতে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু যিনি জমিদদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদী তিনিই আবার নীলকর সাহেবদের উগ্র সমর্থক কেন? নীলকর বিরোধী আন্দোলনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে মীর বিষোদ্গার করেছেন। এমন কি দীনবন্ধু মিত্রকেও পাতফোঁড় বলতে ছাড়েন নি। সমালোচক দেখিয়েছেন এর আসল কারণ মীরের পিতা নীলকর কেনি সাহেবের একান্ত অনুগত ও প্রসাদভিক্ষু ছিলেন। ব্যক্তি মীর আবার বলীয়ান হয়ে শিল্পী মীরের কণ্ঠরোধ করেছেন এ ক্ষেত্রে। সমালোচক মীর চরিত্রে এই দ্বন্দ্ব ও অসংগতির কারণ হিসাবে ঔপনিবেশিক সমাজের পটভূমিটির উল্লেখ করেছেন।

মানুষ মীরের দুর্বলতা কম ছিল না। তিনি নানা তুকতাক জানতেন এবং এ-ও প্রকারান্তরে বলে দিয়েছেন এ সকল যাদুর মধ্যে অনেকটা মিথ্যাচার ছিল। সমালোচক মীর চরিত্রের এই দিকটির প্রতি অপ্রসন্নভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু মানবোচিত দুর্বলতা নিয়েই তো মীর মনোগ্রাহী। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথে মীর চরিত্রের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ ব্যাখাত হবে — এ-ও ঠিক বিশ্বাস্য মনে হয় না।

"তৃতীয় মীর" গ্রন্থের আলোচনা রীতি ও প্রকাশভঙ্গি খুব স্বচ্ছ নয়। সমালোচকের অনেক মত অভিনব, তা আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। কিন্তু এই কথাগুলি কি আরো স্পষ্ট ভাষায় সোজাসুজি বলা যেত না? মীর প্রধানতঃ শিল্পী। তাঁর শিল্প রচনায় কোথাও অস্পষ্টতা নেই, দ্বিধা নেই, জড়িমা নেই। মীরের ভাষারীতি সবল অথচ সূক্ষ্ম অনুরণনপূর্ণ। এখনো তাঁর কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। যাঁরা মীরকে নিয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা মীরের শিল্পকৌশল ও ভাষা সৌন্দর্যকে নিশ্চয়ই অবহেলা করবেন না।

গ্রন্থটিতে মীরের গ্রাম পরিবেশ, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের প্রভাব, মীর রচিত বাউল সঙ্গীত প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচনা পেলে খুশি হতাম। আসলে মীর সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ বই এখনো লেখা হয় নি। "মীরমানস" পড়ে পূর্ণ পরিতৃপ্তি পাই নি। "তৃতীয় মীর" অনেক প্রত্যাশা জাগালেও না পাবার খেদ রয়েই গেল। □

■ তৃতীয় মীর — শান্তনু কায়সার
বাংলা একাডেমী, ঢাকা / ১০০ টাকা।

দেশবিভাগ ঠেকানোর কোনও উপায় কি ছিল?

পুলক নারায়ণ ধর

ভারত উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হচ্ছে দেশভাগ। প্রায় দুশো বছর শাসন করার পর ইংরেজ যখন দেশছেড়ে চলে গেল তখন তারা তাদের মতন করেই দেশকে দু টুকরো করে গেল; এবং ভবিষ্যতে বহু ভাগে বিভক্ত হবার সম্ভবনা সৃষ্টি করে গেল।

ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ করা হ'ল। মুসলমানদের দাবি পূরণ করে সৃষ্টি হ'ল পাকিস্তান। পাকিস্তান কিন্তু টিকল না। পাকিস্তানও ভাগ হয়ে তৈরি হ'ল বাংলাদেশ। পাকিস্তানেও চলেছে মোহাজির কওমি আন্দোলন ও জাতি দ্বন্দ্ব। জিন্না আবিষ্কার করেছিলেন ভারতের দুটো জাতি— হিন্দু ও মুসলমান। আসলে ভারতে অনেক জাতি আছে। ধর্মের ভিত্তিতে জাতি তৈরি করে 'জাতীয়তাবাদকে' দমন করা যায় না এ কথা জিন্না বুঝলেও রাজনৈতিক কারণেই তাঁর পক্ষে তা মানা সম্ভব ছিল না। দেশ আরও কতভাবে বিভক্ত হবে কে জানে? এ সবই হচ্ছে আদি দেশ ভাগের অনুবর্তী ও অনিবার্য ঘটনা প্রবাহ।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল দেশ ভাগ হ'ল কেন? দেশভাগ কি অনিবার্য ছিল? কোন অবস্থাতেই কি দেশভাগ এড়ান যেত না? আরও একটু সাহস সঞ্চয় করে প্রশ্ন তোলা যায় এই ঘটনার জন্য কি ইংরেজই শুধু দায়ী ছিল? এই সব প্রশ্নের উত্তর নানা মুনি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেবার চেষ্টা করেছেন। এই সব প্রশ্নেরই উত্তর নিয়ে ভেবেছেন ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যাঁর 'দেশ বিভাগ' গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত।

নতুন কোনও তথ্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নয়, প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের কাহিনী তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক। ঘটনার পারম্পর্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন দেশ বিভাগের পশ্চাৎপট। ১৯৪৭ সালের অগস্টে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতালাভ করলাম। জওহরলাল নেহেরুর ভাষায় ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের অভিসার শুরু হয়েছিল (tryst with destiny) ১৫ই অগস্টের মধ্যরাত্রে। কিন্তু আসলে দুর্ভাগ্যের অভিশাপই আমাদের তাড়া করে বেরিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি স্তরে। দেশভাগজাত স্বাধীনতার বিড়ম্বনা একদিনে আসেনি। অনেকদিনের অনেক ঘটনা প্রবাহের পরিণতি হচ্ছে এই খণ্ডিত স্বাধীনতা। আসলে ঘটনাগুলি আমরা দেখতে পাই। একটা ঘটনা ঘটে আরেকটা ঘটনার ধাক্কায়। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে এই সকল ঘটনা ঘটেছে হিন্দু মুসলমানদের নিজেদের বিশিষ্ট মানসিক অবস্থার জন্য। তাদের মনের অভ্যন্তরে যা চলছিল ঘটনাগুলি তারই বাহ্যিক রূপ। ভবানীবাবুও সে কথাই মুখবন্ধে বলছেন: "বস্তুত, দেশবিভাগের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকলেও এর জন্য প্রস্তুতি চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধীরে ধীরে এর জন্য প্রস্তুতি পর্ব চালিয়ে গিয়েছিল। তাদের বিষের বাঁশির সুরের তালে তালে প্রলয় নাচন নেচেছে ভারতবর্ষের মানুষ।"

যে মানবিক বিচ্ছিন্নতার পর্দা হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক করে রেখেছিল অন্ততঃ সামাজিক ক্ষেত্রে, ইংরেজ তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে মাত্র। এই মানসিক বিচ্ছিন্নতা কিন্তু অনেক দিন থেকেই আছে। ইবন বতুতার ভ্রমণ কাহিনী থেকেও চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দু মুসলমানের তিক্ত সম্পর্কের বিবরণ পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমানের সমাজের চেহারাটাই ছিল ভিন্ন। বিদ্যাপতির উক্তিতে: "কতহুঁ মিসিমিল কতহুঁ ছেদ।" উভয় সমাজের স্বভাব-বৈপরীত্যের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এটাই মানতে হয় যে হিন্দু ও মুসলমানদের স্থায়ী বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে এই বৈপরিত্য বার বার ছোটবড় বাধা সৃষ্টি করেছে যদিও তা সর্বক্ষেত্রেই অলঙ্ঘনীয় ছিল না।

এই অপ্রীতির সম্পর্ক দূর করতেই মধ্যযুগে দাদু, কবীর, রজ্জব, আউল বাউল দরবেশরা আবির্ভূত হয়েছিলেন নতুন মানবিক বাণী নিয়ে। আধুনিক যুগে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক রাজনৈতিক কারণে জটিলতর হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক আনুগত্য ও ধর্মীয় আনুগত্য এমন ভাবে মিলে মিশে গেছে যে তার নাগ পাশ থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার।

দীর্ঘদিন ভারতের শাসক থাকার পর স্বাভাবিক কারণেই সিংহাসনচ্যুত হয়ে মুসলমানরা ইংরেজদের মেনে নিতে পারে নি। হিন্দুদের কাছে কিন্তু মুসলমান শাসন ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠছিল। তাই তারা ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানাতে

দ্বিধা বোধ করে নি। স্বয়ং রামমোহন রায় ইংরেজ শাসনের সূত্রপাতকে "ঈশ্বরের আশীবাদ" বলেই গণ্য করে ছিলেন। মুসলমান শাসনের অবসান ঘটলে সমাজও শাসন বিন্যাসে যে পরিবর্তন এল তার ফলে মুসলমানদের পূর্ব প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হ'ল। আর্থিক নিরাপত্তা কিন্তু সার্বিক ভাবে অতটা খর্ব হয় নি। অভিজাত মুসলমানদের অভিমান যতটা আহত হয়েছিল সাধারণ মানুষের, এমন কি সাধারণ জমিদারদের অবস্থার তেমন হেরফের হয় নি। বরং পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের যারা জাহাজ জমিজমা ও অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সম্পদের দিক থেকে তারা বঞ্চিত হন নি। ঐতিহাসিক পিটার হার্ডির ভাষায়: "For a minority it destroyed not a livelihood, but a way of life, and damaged not so much their pocket as their pride." মুসলমান সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা ইংরেজ শাসনকে খ্রিস্টিয় শাসন বলেই মনে করতেন, এবং পুনরায় শরিয়ত শাসন প্রবর্তনের কথা ভাবতেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে 'শরিয়তের' মেল বন্ধন ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের জাড্য দূর করার প্রয়াসে যত্নবান ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজদের কর্মকাণ্ডে মুসলমান সম্প্রদায় যদি সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ না করে তবে ভারতের নতুন কর্মযজ্ঞে তারা হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে যাবে। তাঁর দূরদর্শীতার কোন তুলনা হয় না। একই সঙ্গে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব মনে করেছিলেন। কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠন বলে অভিহিত করে তার সংস্রব সর্বৈব পরিত্যাগ করতে মুসলমান জনগণকে বুঝিয়েছিলেন। তাঁরই রচনায় প্রথম 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' উল্লেখ পাওয়া যায়। "ভারতকে এক জাতি মনে করে এমন যে কোন ধরনের কংগ্রেসে" স্যার সৈয়দ আহমেদ আপত্তি জানিয়ে ছিলেন।

১৮৫৭ সালের ব্যর্থ সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব ও শক্তি সম্বন্ধে মুসলিমদের আর কোনো সন্দেহ রইল না। ইংরেজদের সঙ্গে মানিয়ে চলার নীতি তারা গ্রহণ করলে ইংরেজ শাসকরাও তাদের নানাভাবে শাসনের অঙ্গিভূত করে নেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে যে ইংরেজ আগমনকে রামমোহন "ঈশ্বরের আশীর্বাদ" বলে অভিহিত করেছিলেন হিন্দু উত্থানের আশঙ্কায় স্যার সৈয়দ আহমেদ সেই ইংরেজ শাসনকেই মুসলমানদের ওপর আল্লাহর ইচ্ছা বলে মেনে নিলেন।

তিনি মুসলমানদের ভবিষ্যৎ গতি নির্দেশ করে লিখলেন 'The Loyal Muhammadens of India' (1860)। প্রতিষ্ঠা করলেন 'Mahomedan Anglo—Oriental College' যা আজকের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়।

অন্য দিকে ব্রিটিশ তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একটু একটু করে এগিয়েছে। ১৯০৯ সালে মর্লি মিন্টো রির্ফম, ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড এর ভারত শাসন আইন, ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশন, গোলটেবিল বৈঠক ১৯৩২ সালে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' এবং পরিশেষে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন সাম্প্রদায়িক ভোটাভুটি, জাতপাতের রাজনীতি প্রভৃতির প্রবর্তন করে। মোজেসের দণ্ড স্পর্শে ভারতীয় জন সমুদ্রকে বহুধা বিভক্ত করে দেশভাগের সুনির্দিষ্ট পথ তৈরি করার সংকল্পে ব্রিটিশ এগিয়ে যায়। জাতীয় ঐক্য রচনার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়।

সংখ্যালঘু বিভিন্ন সম্প্রদায় ইতিমধ্যে স্বাতন্ত্রের স্বাদ পেতে শুরু করেছে। তাদের নেতারা বুঝতে পারলেন যে পৃথক পৃথক গণ্ডীতে যদি নিজেদের সম্প্রদায়ের মানুষদের আটকে রাখা যায় তবে সংক্ষিপ্ত পথে দ্রুত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

সমগ্র ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে না হলেও এই বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাবিত বেঙ্গল প্যাক্ট (ডিসেম্বর ১৯২৩) হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের উন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থার সন্ধান দিয়েছিল। কিন্তু কোকোনাডা কংগ্রেস বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল করে দিল। সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা দেশবন্ধুকে বিশ্বাসঘাতক বলে নিন্দা করতেও পিছপা হয় নি। অনেকের ধারণা যে বেঙ্গলপ্যাক্ট বাস্তবে রূপায়িত হলে দেশভাগ রোধ করা যেত। মৌলানা আবুল কালাম আজ্জাদও মনে করেন: "The repudiation of this pact was one of the factors which led to increasing discord between Hindus and Muslims culminating in the portion." অনেকেরই ধারণা চিত্তরঞ্জন দাশ যদি বেঁচে থাকতেন তবে ভারত বিভাগ হ'ত না। এটা হয়ত ইতিহাস বিরুদ্ধ আশা। যেমন একথাও ইতিহাসের প্রকৃতি বিরুদ্ধ হবে যদি বলা হয় মহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন বলেই দেশ বিভাগ হ'ল।

এ বিষয়ে ভবাণীপ্রসাদ মনে করেন এক বা একাধিক ঘটনাকে দেশ বিভাগের কারণ স্বরূপ নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। যাঁরা মনে করেন যে কয়েকজন মানুষের ভুল-ত্রুটি, পক্ষপাতিত্ব এবং অবিবেচনাই দেশবিভাগকে অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছিল। তাঁদের কথায় "যুক্তি যত আছে, ভাবপ্রবণতা আছে তার চেয়েও বেশি। এঁদের কারও কারও মনে যে হিন্দু মানসিকতা প্রবল নয় সে কথা বলা যায় না। এই সব মানুষের যুক্তি এবং আবেগকে বিশ্লেষণ করলে যে সত্য বেরিয়ে আসে তা হল অখণ্ড ভারতবর্ষে হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য ক্রোধ।" (পৃ: ১৮৪)

হিন্দু মুসলমানের যে ভেদভাব ছিল তা অবশ্যই একতরফা নয়। হিন্দুরা বেশি দায়ী না মুসলমানরা বেশি দায়ী এ তর্ক

বৃথা এবং অনন্তকাল ধরেই চলতে পারে। বাস্তব হচ্ছে এই যে "এই ভেদভাবের বোধই রাজনীতির পটভূমিতে দেশবিভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। জিন্না তারই নিমিত্ত হয়েছিলেন। জিন্না না হলে হয়তো আর কেউ তাঁর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে একই কাজ করতে চেষ্টা করতেন" (পৃ: ১৮৫)। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এর সঙ্গে অন্যান্য সংঘাতের দিক যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই স্বার্থ দ্বন্দ্ব কোন হিন্দুর সঙ্গে কোন মুসলমানের দ্বন্দ্ব সে সম্বন্ধে ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কোন আলোকপাত করেন নি। হিন্দু ধনী শ্রেণীর সঙ্গে মুসলমান ধনী শ্রেণীর সংঘাতই ছিল মূল সংঘাত। দরিদ্র হিন্দু ও দরিদ্র মুসলমানরা ছিল শুধু দাবার বোড়ে। প্রয়োজন মতন এদের হিন্দু ও মুসলমান নেতারা ব্যবহার করেছেন। দেশবিভাগের পরও কোনও সম্প্রদায়েরই দরিদ্র মানুষদের অবস্থার সার্বিক পরিবর্তন হয় নি। হিন্দু বা মুসলমানদের যে সমস্যা দেশ বিভাগের মাধ্যমে তার সমাধান হয় নি। তবুও লেখকের মতে দেশ বিভাগ ছিল অনিবার্য।

সহজ কথাটা এই যে, ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলমানরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্বাতন্ত্র্যভিলাসী গোষ্ঠী। আবার সংখ্যার বিশালত্ব হিন্দুদের দিয়েছিল আলাদা সচেতনতা ও মর্যাদা। এই দুই এর সংঘাত ছাড়াও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক জমিনটা এতই ভিন্ন যে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা তেমন ভাবে গড়ে ওঠে নি। বিপদে পড়ে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক মিলন হয়েছে। কিন্তু তা ছিল ক্ষণস্থায়ী বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে। সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে টেক্কা দিতে যায় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকাংশ মানুষের কাছে তা অসহ্য ঠেকে।

এই বোধ থেকেই ভেদাভেদের রাজনীতির জন্ম। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু নেতা ও সাধারণ মানুষ সম্প্রীতির সেতু বন্ধনের চেষ্টা করেছেন যাঁদের অগ্রণী হচ্ছেন গান্ধীজি। কিন্তু দেশবিভাগ যদি শেষ কথা হয় সাময়িক শান্তি স্থাপনে তবে বলতেই হবে গান্ধীজি ব্যর্থ। কিন্তু গান্ধীজির প্রচেষ্টা একটা নতুন সংস্কৃতির ধারা তৈরি করেছিল বলেই বহুদিন আমরা দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পেরেছিলাম। তার চেয়েও বড় কথা, এর ফলে আমরা. ধর্মবিদ্বেষহীন রাজনৈতিক ভাবধারার প্রবাহ সৃষ্টি করতে পেরেছি। গান্ধীজির পক্ষে ইতিহাসের বিপুল বিরুদ্ধ স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে দেশ বিভাগ রোধ করা সম্ভব ছিল না। কারণ জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বে ততদিনে মুসলমান জনমানসকে মথিত করে দিয়েছে। গন্ধীজি আর ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন না। এই অবস্থায় "অনশনের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করলে অবস্থার বিপর্যয় হয়ে যেত" (পৃ. ১২৪)। লেখক মনে করেন "হয়তো জিন্নাই পারতেন দেশবিভাগ আটকাতে। ...ভারতবর্ষে যে অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনের ধারা প্রবাহিত ছিল, রাজনৈতিক পটভূমিতে যার পুরোভাগে ছিলেন গান্ধীজি, নেহেরু, আজাদ, বাদশা খান, সুভাষচন্দ্র প্রমুখরা জিন্না যদি তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতেন, সমান পদক্ষেপে এগিয়ে যেতেন তা হলে ব্রিটিশ-শাসননীতির শেষ পরিণাম দেশ বিভাগকে হয়তো এড়ান যেত। তা করা যায় নি। ...জিন্না পরিস্থিতিকে জটিল করে দিয়েছিলেন। আর, গান্ধীজি পরিস্থিতির কাছে পরাভূত হয়েছিলেন"। (পৃ. ১৮৪)।

কিন্তু প্রশ্ন এই জিন্না দেশ বিভাগ তখনকার মতো রোধ করতে পারলেও হিন্দু ও মুসলমানরা কি এক সঙ্গে থাকবার মানসিক শক্তি অর্জন করতে পারতো? জিন্না যেমন একসময় বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে হিন্দু ও মুসলমানরা একটি সাধারণ জাতিতে বিকশিত হবে। এ এক স্বপ্ন। লালা লাজপত রায়ও কিন্তু অনেক আগেই চিত্তরঞ্জনকে লিখেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অবাস্তব পরিকল্পনা। অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফৎ এর ব্যর্থতার পর ১৯২৬ এ কলকাতা দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বর্তমান হিন্দু-মুসমমান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন যে মুসলমানরা সত্যিই কখনও বিশ্বাস করবে না যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাদেরও স্বাধীনতা আনবে। এই সত্য তারা তখনই গ্রহণ করবে যখন তাদের ধর্মান্ধতা দুর্বল হবে।'

"দেশমাতৃকার নামে 'মুসলমান'দের কাছে আবেদন করা বৃথা," কারণ তাদের হৃদয় তুর্কী বা আরব দেশের জন্য বেদনার্ত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ১৯২৬ সালে শরৎচন্দ্রের পঠিত প্রবন্ধ হয়ত বাংলার বা ভারতের রাজনীতির গতি নির্ধারণ করে নি কিন্তু বাঙালি উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজের মানসিক গঠনের এক প্রামাণ্য দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে। দেশবিভাগের পশ্চাৎপট ঘটনার ও পশ্চাৎপট মানসিক প্রতিন্যাস ছিল আরও নির্মম। তবে ঘটনার মোকাবিলা করাই দক্ষ রাজনীতিকদের দায়িত্ব। একটি বিপর্যয়কর ঘটনাকে প্রতিহত করতে পারলে বৃহত্তর বিপর্যয় প্রতিহত করা সম্ভব হয়। হিন্দু মুসলমানদের মানসিক দূরত্ব যদি থেকেও থাকে তাকে টেনে বড় করার প্রচেষ্টায় উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চ শ্রেণীর নেতাদের কারও খামতি ছিল না।

এই অবস্থায় মনে হওয়া হয়ত স্বাভাবিক যে যদি নেহেরু রিপোর্ট গৃহীত হ'ত বা বেঙ্গল প্যাক্ট ও বাংলার ফজলুল হক্ মন্ত্রীসভা স্থায়ী হ'ত অথবা ক্যাবিনেট মিশন এর প্রস্তাব মেনে নেওয়া হ'ত তবে হয়ত দেশ বিভাগ ঠেকানো যেতো। অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য পিছিয়ে দেওয়া যেত। আবার মনে হয় সুস্থ গণতান্ত্রিক ও রুটি রোজগারের সমস্যা নিয়ে যদি দুই সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষদের এককাট্টা করে সংগ্রাম চালিয়ে

যাওয়া যেত তবে হয়ত সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রভাব অনেকটা প্রতিরোধ করা যেত।

পরিবর্তে হিন্দু ও মুসলমানরা স্বাধীনতার প্রশ্নে নিজেরা কোঁন্দল করেছে এবং পরিণামে ইংরেজের কাছে ছুটে গেছে তাদের ঘরোয়া বিবাদের মীমাংসার জন্য। এর পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে ইংরেজ। এদিকে সংগ্রামী শ্রমিক কৃষক দলের নেতারা কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে এক ঝান্ডার তলায়-আনার জন্য শক্তিক্ষয় করেছে।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটা বিচার করেন নি। কিন্তু অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও বেদনার্ত মন নিয়ে দেশ বিভাগের নেপথ্য কাহিনী উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। সহজ সুন্দর ভাষা গ্রন্থটির প্রসাদগুণ। নিছক ইতিহাসের বই নয় বলেই সাধারণ পাঠকদের কাছে এর মূল্য অনস্বীকার্য। □

■ **দেশ বিভাগ : পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী**
— ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলি-৯ / ৫০ টাকা।

মহাকাব্যগুলি এখন মৌলবাদী রাজনীতির হাতিয়ার

মঞ্জু দাশগুপ্ত

মানুষ পশুর থেকে বিশিষ্ট কিসে? এর উত্তর সকলেরই জানা আছে। কিন্তু যে বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা, হৃদয়বত্তা মানুষকে স্বমহিমায় স্বতন্ত্র করেছে তার প্রয়োগ কতটা হয়? ধর্মবোধ মানুষকে উন্নত চেতনা দেয় যা থেকে স্বভাবতই ধর্মনিরপেক্ষতাতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অথচ ধর্মের ধ্বজা তুলে যে অধর্ম মানুষ অহরহ করে চলেছে তাতে মানুষের ধর্মই লাঞ্ছিত হচ্ছে। আজকের পৃথিবীতে অতি নিকৃষ্ট ও সংকীর্ণ স্বার্থদুষ্ট এক শ্রেণীর লোক ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। বিচারহীন সংস্কার পালন করা এবং অতীতের কিছু আচার আচরণকে আঁকড়ে ধরাকেই এর ধর্মপালন মনে করে থাকে। অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে যুগের উপযুক্ত যুক্তি বিচার না করে প্রাচীন অনুশাসন পালন করাকেই সহজ ভাষায় মৌলবাদ বলা যেতে পারে।

মৌলবাদের শিকড় যে কত গভীরে প্রবিষ্ট তা শ্রী জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "মহাকাব্যে মৌলবাদ" গ্রন্থে সবিশেষে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। ইলিয়াড ওডিসি অথবা রামায়ণ মহাভারতের মত মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রামায়ণ মহাভারত যদিও ইতিহাস নয় তবু তাদের পরোক্ষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে বিশেষত মহাভারত থেকে আমরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাও সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক এবং উপাদান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে এই মহাকাব্যগুলিকে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কয়েক বছর আগে দূরদর্শনের পর্দায় রামায়ণ প্রতিফলিত হয়েছিল তা লেখকের মতে প্রধানত তুলসীদাস রচিত 'রামচরিতমানস' অনুসারী। কিন্তু আমার মনে হয় যে দূরদর্শনের রামায়ণ বহু ব্যবসায়িক সাফল্য বিজয়ী চলচ্চিত্রের প্রযোজক রামানন্দ সাগরের উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাক্ষ্য। এটি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রাময়াণগুলির এক জগাখিচুড়ী সংস্করণ। বাল্মিকী রাময়ণে বাল্যকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছিল না। এতে রামের অবতারত্বেরও বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু দূরদর্শনে বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং রামকে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। লেখক যথার্থই মন্তব্য করেন "সরকারী প্রচার মাধ্যমে এভাবে ধর্মবিশ্বাসকে উৎসাহ দেবার ফলে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সঞ্জীবিত হয়েছে।"

মহাভারত কাহিনীও বিকৃতভাবে দূরদর্শনের পর্দায় সম্প্রচারিত করা হয়েছে। কৃষ্ণের বাল্যকালের কীর্তিকলাপ মহাভারতে নেই। আছে পুরাণে। কিন্তু দূরদর্শনের মহাভারতে কৃষ্ণের অলৌকিক জন্ম, যশোদাকে নিজের মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, ব্রজগোপীদের সঙ্গে লীলা ইত্যাদি অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখানো হয়েছে। কাজেই এখানেও কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "এক শ্রেণীর সমাজপতি ও দলপতি ধর্মবণিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মৌলবাদকে রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের স্থূল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। জনসাধারণের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তাদের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে মৌলবাদী রাজনীতিতে রূপান্তরিত করে। আর অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং হিংসায় ইন্ধন যোগায়।" নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য মহাকাব্যের বিকৃত উপস্থাপনার মত হীন কাজ করতেও এই শ্রেণীর বিবেকে বাধে না।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্ধবিশ্বাস, ধর্মের অনুশাসন, অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা মৌলবাদ ইত্যাদিকে সমর্থন করা যায় না। যুগের সঙ্গে, যুক্তির সঙ্গে, বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে যোগ রাখতে গেলে, অন্ধবিশ্বাস ও মৌলবাদের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করতেই হবে। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। তাঁর

প্রথম প্রবন্ধ "গৌরব ও লজ্জা"তেই তিনি তাঁর বাকি আটটি প্রবন্ধের মূল সূত্রটি পাঠককে ধরিয়ে দিতে পেরেছেন।

'গৌরব ও লজ্জা' ছাড়া বাকি প্রবন্ধগুলির নাম যথাক্রমে 'রাম জন্মভূমি' 'রামায়ণে সত্যরক্ষা' 'মহাভারতের কৃষ্ণ' 'মহাভারতে সত্যজিজ্ঞাসা' 'সূর্য বিষ্ণু' 'ইতিহাস ও যুগধর্ম' 'ধর্ম ও খাদ্য' ও 'মৌলবাদের জন্মমৃত্যু'। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ অত্যন্ত সুলিখিত। বিশ্লেষণে আকাট্য যুক্তির পরিবেশনে লেখকের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'রামায়ণে সত্যরক্ষা' ও 'মহাভারতে সত্যজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ দুটিতে সত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে লেখক তাঁর বিশ্লেষণ শক্তি ও বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। সত্য যে প্রকৃতপক্ষে ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসন ছাড়া আর কিছু নয় এ বিষয়ে লেখক নিশ্চিত। দ্যুতক্রীড়ায় হেরে গিয়ে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীকে পণ রাখেন তখন ভীম ক্রোধান্বিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের দুই হাত পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু অর্জুন তাঁকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরস্ত করেন। যে কোনো অসত্য এবং অন্যায় নীতি অবলম্বন করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত যদি তাতে ধনলাভ, জয়লাভ ও রাজ্যলাভ হয়। কৃষ্ণর সত্যাসত্য ব্যাখ্যাকে সুবিধাবাদীর ব্যাখ্যা বলাই ভাল। কৃষ্ণকে সত্যনিষ্ঠ বলা যায় না। তিনি ছিলেন 'কৌশলজ্ঞ'।

মহাভারতে মিথ্যা ও ছলনার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। জয়ন্তবাবুর প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্য, বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর রচনাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং রাজনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ বিচরণের ফলে মৌলবাদ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা একটা সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে।

'ইতিহাস ও যুগধর্ম' প্রবন্ধে জয়ন্তবাবু শূদ্র ও নারীশক্তির অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর প্রাঞ্জল ভাষায় "বস্তুত ব্যাপক অর্থে শূদ্র ও নারীশক্তির অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসে প্রগতির প্রধান কারণ এবং পরিচায়ক।" এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের "কালের যাত্রা" নাটকের বিষয়বস্তুর উল্লেখ করেছেন। শূদ্রের করস্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত মহাকালের রথ অচল হয়ে থাকল।

'ধর্ম ও খাদ্য' প্রবন্ধটি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে গোমাংস ভক্ষণ হিন্দু সমাজে চালু ছিল। আলবেরুনি যথার্থই লক্ষ্য করেছিলেন যে গরুর মাংসের ওপর নিষেধ ছিল অর্থনৈতিক। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি স্বল্পজ্ঞাত চিঠির উদ্ধৃতি এই প্রবন্ধের বিশেষ আকর্ষণ। দুর্ভাগ্যবশত এই চিঠি রামকৃষ্ণ মিশন সম্পূর্ণ প্রকাশ করেননি। লেখক দ্বারা উদ্ধৃত এই চিঠির অংশবিশেষ তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। আমেরিকা বাসের সময় তিনি গোমাংস সহ সব আমিষ খাদ্যই গ্রহণ করতেন। বিদেশে বিবেকানন্দের প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে খ্রিষ্টান মিশনারিরা এ কথা ফলাও করে প্রচার করেন। উত্তরে বিবেকানন্দ নিজের খাদ্যাভ্যাসকে জোরালো সমর্থন করেন এবং শিষ্যদেরও তীব্র ভৎর্সনাৎ করেন। আলসিংগা নামক 'মাদ্রাজী' শিষ্যকে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন : "ভারতবাসীরা যদি চায় যে আমি একমাত্র হিন্দু খাবার খাই, তবে তারা যেন আমাকে একজন রান্নার লোক এবং তার জন্যে অনেক টাকা পাঠায়। .....আমি কারও আদেশে চলি না। আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য জানি এবং আমার কোন সংকীর্ণতা নেই। আমি যতখানি ভারতীয় ততখানিই বিশ্বমানব। .....কোন্ দেশের বিশেষ অধিকার আছে আমার উপর? আমি কি কোন জাতির ক্রীতদাস? .....তোমরা কি বলতে চাও যে আমি ঐ জাতিভেদে জর্জরিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিষ্ঠুর, ভণ্ড, নাস্তিক ও কাপুরুষ শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেই জীবন কাটাবার জন্য এবং মরবার জন্য জন্মেছি?" আজ চারপাশে যখন বিশ্বায়নের ধুয়ো উঠেছে তখন স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৫ সনে লেখা এই চিঠিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই চিঠিটি উদ্ধার করার জন্যে জয়ন্তবাবুকে ধন্যবাদ।

এই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ লেখকের মনস্বিতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও মানবিক মূল্যবোধ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শাণিত, লেখনীও শানিত। শুদ্ধ, সুস্থ ও সবল ভাষা ব্যবহার করে এবং বক্তব্যের সমর্থনে পাদটীকা প্রয়োগ করে তিনি প্রবন্ধগুলিকে বলিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য করেছেন।

তাঁর শেষ প্রবন্ধ "মৌলবাদের জন্মমৃত্যু"তে লেখক মৌলবাদের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করে মৌলবাদের প্রতিকারের সন্ধান দিয়েছেন। রামায়ণ-মহাভারতের পল্লবিত কল্পকাহিনীকে মূলধন করে আজ যারা এদেশে মৌলবাদী এবং ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাজনীতিতে মত্ত হয়ে উঠেছে তাদের "গণশত্রু" আখ্যা দিয়ে জয়ন্তবাবু লিখছেন : "বলাবাহুল্য ইতিহাসের আবর্জনাস্বরূপ এসব গণশত্রুদের মরণকাঠি আছে ধর্মান্ধতার শেকল-ছেঁড়া, মৌলবাদের কারাগার-ভাঙা শ্রমজীবি মানুষের হাতে। সাম্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ আমজনতার ব্যাপক সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মধ্যে।" রবীন্দ্রনাথের ধর্মমোহ কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধের শেষ —

"ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধাবলী এই "জ্ঞানের আলোক" আনার একটি সার্থক প্রয়াস। □

■ **মহাকাব্য ও মৌলবাদ** — জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়
অ্যালায়েড পাবলিশার্স লিমিটেড, কল-৭২ / ৪৫ টাকা।

লালনকে নিয়ে প্রামাণ্য গবেষণা

অজিত কুমার চক্রবর্তী

ধর্মের নামে, জাতি বা বর্ণের নামে আজ হানাহানি চলেছে চারদিকে। নিছক মানুষ হিসাবে লোপ পেতে বসেছে মানুষের পরিচয়। মনুষ্যত্বের আর জীবনের মহিমা প্রতিনিয়ত হচ্ছে ধ্বস্ত। এমন দিনেই স্মরণ প্রয়োজন মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, অন্তর্ময় মরমী কবি-সাধক লালন ফকিরকে। লালন ফকিরের নাম আর তার গান আজ আর সীমাবদ্ধ নয় শুধুমাত্র ছেঁউড়িয়ার ছোট্ট আঙিনাটুকুর মধ্যে। তা 'ছড়িয়ে গেল সবখানে।' একথাই বিস্তারে প্রকাশ করেছেন লোকধর্মের স্বতন্ত্রবর্গের গবেষক শ্রীসুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' গ্রন্থটিতে।

কিছুকাল যাবৎ দুই বাংলায় লালন ফকির সম্পর্কে শুরু হয়েছে গবেষণা আর অন্বেষণ। কিন্তু গবেষণার ছলে যখন আশ্রয় করা হয় কল্পনা আর পরিকল্পিত অসত্যকে, সৃষ্টি করা হয় মতলবি মিথ্, তখনই ঘটে সত্যের বিকৃতি আর বিপর্যয়। কিছু লালন গবেষক এমন কাজই করে চলেছেন। সৃষ্টি করে তুলেছেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে নানা বিতর্কের—লালনের জন্ম হিন্দু পরিবারে না মুসলমান পরিবারে, জন্মস্থান নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার কাছে চাপড়া-ভাঁড়ারা গ্রামে, না যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রামে, লালন শরিয়ত-পন্থী, মারফতি-সুফীপন্থী-সাধক না বাউলপন্থী এমন সব বিষয়ে। এর জন্য রচনাও করেছেন লালন শিষ্য দুদ্দুসাহের নামে এক জাল কলমী পুথি—'লালন-জীবনী' (সম্পূর্ণ পুথিটি গ্রন্থকার ছেপে দিয়েছেন 'পরিশিষ্ট-২' অংশে)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর আঁকা লালনের রেখাচিত্র দুটির যাথার্থ নিয়েও বিতর্ক তুলেছেন। আর এসকল প্রশ্নই উঠেছে দেশভাগের ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির পরই।

এ সকল বিতর্ক আর সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন গ্রন্থকার; বিশ্লেষণ করেছেন লালনের সমকালীন সমাজ-ইতিহাস, আঞ্চলিক-বিন্যাস, তার জনবিন্যাস, লোকায়ত ধর্ম, হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদ সমস্যা, সুফী ও বাউলপন্থার প্রকৃত উৎসমূল বিচারে লালন-পন্থার স্বতন্ত্রতা, যা কোনভাবেই আবশ্যিক মনে করেনি ইসলামি 'আকীদা' ও নির্দেশিত আচরণবাদকে।

লালন প্রথম জীবনে গভীর আঘাত পান সমাজের কাছে, যার ফলে তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে এক প্রতিবাদী সত্তা। সমাজ-সংস্কার, শাস্ত্র-আচার আর জাতিধর্ম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন লালন। সাম্প্রদায়িক জাতিধর্ম সম্পর্কে তাঁর গানে প্রকাশ পেয়েছে যে তীব্র অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণা, তার পেছনে সক্রিয় ছিল ব্যক্তিজীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা—একথা বুঝতে কষ্ট হয় না।

'আঠারো শতকে এক পা আর উনিশ শতকে এক পা রাখা লালন ফকিরের গানে এক অন্তর্লীন বিমিশ্রণ, যা বাউল গানের বন্দিশ মেনে নিয়েও ব্যক্তি উচ্চারণে বিশিষ্ট। তিনি ধর্মধারণায় শুধু প্রতিবাদী নন, গানের বক্তব্যেও প্রতিবাদী।' শাস্ত্র বিশ্বাসকে অস্বীকার করে তাই তাঁর গানে তিনি বলেন—'শুনতে নাই আন্দাজী কথা / বর্তমানে জানো হেথা।' অথবা 'মারফতে পথিক যারা / সরার কেতাব নেয়না তারা।'

হাজার বছর আগের সরহপাদের দোহা-তেও পাওয়া যায় এই প্রতিবাদী সুর। দোহাকার বলেন,—"ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হতে জন্মেছিল, যখন জন্মেছিল তখন জন্মেছিল, এখন তো অন্যেও যে ভাবে জন্মে, ব্রাহ্মণেরও তেমন ভাবেই জন্ম হয়। তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রইল কোথায়? যদি বল সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চন্ডালকে সংস্কার দাও, সেও ব্রাহ্মণ হোক। যদি বল বেদ পড়লে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক।"

লালনের গান থেকে বুঝতে বাধা হয় না যে, এই গানের মুলভিত্তি দেহতত্ত্ব। তাঁর গানগুলির বিশ্লেষণে আমরা বুঝতে পারি—চিশ্‌তীয়া সুফীধারা এদেশীয় সহজিয়া সাধনার রসে জারিত হয়ে রূপ পেয়েছে লালনের গানে— 'আত্মতত্ত্বে পায় সাধাধন / সহজ-সাধক জানে।"

সহজ-সাধক তিনি, যিনি 'প্রকৃতি'-সাধনা করেন। এঁদের তত্ত্বগানে ব্যবহৃত হয় কিছু বিশেষ অর্থবাহী গুহ্য অর্থবিশিষ্ট শব্দ। বাংলা গানের ঊষা লগ্নে বৌদ্ধ সহজিয়াদের চর্যাগানে—"রুখের তেন্তিলি কুম্ভীরে খাই"—থেকে শুরু করে বৈষ্ণব-সহজিয়া, নাথ যোগী আর বাউলগান পর্যন্ত দেখা পাই এ ধরনের 'সন্ধ্যাশব্দ'। যেমন 'বস্তু', 'চারিচন্দ্র', 'অমাবস্যা' প্রভৃতি। লালনের গানে—"সে কথা কি কবার কথা, জানিতে হয় ভাবাবেশে / অমাবস্যা পূর্ণিমা সে অমাবস্যে / অমাবস্যায় পূর্ণিমা যোগ আজব-সম্ভব সম্ভোগ॥" এখানে নারীর বিশেষ দিনকেই বলা হয়েছে 'অমাবস্যা'। সেই দিনই রতিসাধনের উপযুক্ত কাল। 'প্রশ্ন'—উপনিষদ (১/১৩) বা 'ছন্দোগ্য' উপনিষদ্ (৫/৮/১)-এও পাওয়া যায় এই বাণীর সমর্থন। এ সকল বিশিষ্ট শব্দ আর তত্ত্বের সন্ধান ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' গ্রন্থে।

লালনের মৃত্যুর পর নানা পুস্তিকা ছাপিয়ে মৌলবাদীরা লালনের বিরুদ্ধে ব্রতী হয়েছে কুৎসিত অপপ্রচারে। এর একটি উদাহরণও দিয়েছেন গ্রন্থকার (পৃ. ১১৭/১৮)। এ কালেও এই অপপ্রচারের

কমতি নেই, তার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র ফাল্গুন'৯৩ সংখ্যায় অধ্যাপক এস্. এম. লুৎফর রহমানের লেখা—'বাউল সাধনার বিবিধ রীতি' প্রবন্ধটি। প্রবন্ধকার অবশ্য মুখ্যত নির্ভর করেছেন মৌলবী আবদুল ওয়ালীর 'On Curious Tenets and Practices of Certain Class of Fakirs of Bengal'—নিবন্ধটির উপর। ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধটি আলোচ্য গ্রন্থেও (পরিশিষ্ট-১) সংযোজিত হয়েছে, আলোচনা সহ।

প্রসঙ্গত অন্যতম লোকধর্ম 'কর্তাভজা'দের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন গ্রন্থকার (পৃ. ১০৫)। 'যত মত তত পথ' নীতির প্রবক্তা পরমহংসদেবের এধরনের মন্তব্য—বিশ্বাস করা কঠিন হলেও কথামৃত ২য়, ৪র্থ ও ৫ম ভাগে উচ্চারিত উক্তিগুলি নিশ্চিতভাবেই বেদনাবাহী। আবার অক্ষয়কুমার সেন-এর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুথি'তে উল্লিখিত "সমকালে প্রচলিত কর্তাভজা মত।/ ভগবানে যাইবার একমাত্র পথ।/ পথটি বড়ই নোংরা, উপমা তাহার..." (উপমাটি উদ্ধৃতির যোগ্য নয়)—ইত্যাদিতেও শ্রীরামকৃষ্ণেরই মনোভাব প্রতিবিম্বিত বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। সকল লোকধর্মের প্রতি এই সকল উচ্চবর্গীয়রা ছিলেন বিরূপ। বস্তুত এসকল গৌণধর্মের সংকেত বহুল গানে 'না বলা বাণীর ঘন যামিনীর' রহস্য বা অন্তর্গহন মৌন আবিষ্কার না করলে বোঝা যায় না এর গহন তত্ত্বটি। ভুল বোঝার সম্ভাবনাও থাকে যথেষ্ট।

লালন গীতির সংখ্যার বিপুলতা ও ভাবের গভীরতার সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন, "তাঁর গানের সমুদ্রে দক্ষ ডুবুরির অভাব।' দীর্ঘজীবী লালন পৌনে শতবছর ধরে রচনা করেছেন হাজারের বেশী গান। সে গানে বাণীর সৌকর্য সুরের বৈভব আর ভাবের গভীরতা বিস্ময়কর। এ প্রসঙ্গে আশারফ সিদ্দিকী একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "Best words in the best order"-উৎকৃষ্টতম শব্দের সুন্দরতম বিন্যাসই কবিতা—লালন গীতের প্রতিটি চরণ এই পরিচয়ে নিবিড়" (লালন-গীতিতে শব্দ মটিফিম'—দৈনিক সংবাদ—১৩৮৩; ঢাকা। উদ্ধৃতঃ আবুল আহ্‌সান চৌধুরীর 'লালন শাহ' গ্রন্থ; ১৯৯০। পৃ. ৫৫)। উপমা রূপক চিত্রকল্প সব মিলিয়ে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে লালন-গীতি।

বাউলগানের রসগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের ছন্দ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর ছন্দগ্রন্থে লালনের দুটি গান উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন: "এই ছন্দের ভঙ্গি এক ঘেয়ে নয়। ছোট বড়ো নানা ভাগে ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজে ঘসে এর শোভা বাড়ানো চলে—আশা করি বলবার সাহস হবে না কারো।" বাউল ভাবের গভীরতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ দেশে এবং বিদেশে নানা ভাষণে এর উল্লেখ করেছেন। 'An Indian Folk Religion'-বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: "These Bauls have a philosophy, which they call philosophy of the body; but they keep its secret; it is only for the initiated. Evidently the underlying idea is that the individual's body is itself the temple, in whose inner mystic shrine the Divine appears before the soul, ..." (Creative Unity. 1962 ed. p. 86)।

লালন ফকিরের আজ যে আন্তর্জাতিক পরিচিতি, এর মূলে রবীন্দ্রনাথ একথা সকলেই জানেন। বর্তমানে লালন গীতির অনুবাদের প্রয়াস চলেছে পূর্ব ও পশ্চিম বিশ্বে। এ প্রচেষ্টার সাহসিকতা ও ব্যর্থতার সবিস্তার মূল্যায়ন করেছেন শ্রীচক্রবর্তী গ্রন্থের 'ছড়িয়ে গেল সবখানে' শিরোনামের শেষ অধ্যায়টিতে।

লালনগীতের নির্ভরযোগ্য সুরকাঠামো আজ হারিয়ে গেছে। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় এ সম্পর্কে বলেছেন—"শুনতে পাই লালন পন্থী বাউলদের মধ্যেও দুই ভাগ। যাঁরা ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় বাস করেন তাঁরা একসুরে গান। যাঁরা বাইরে বাস করেন তাঁদের গানের সুর আরেক।" (লালন ও তার গান, ১৩৮৫, ভূমিকা। পৃ.৭)। ইন্দিরা দেবী লালনের 'ক্ষম অপরাধ ওহে দীন নাথ' এবং 'কথা কয় কাছে দেখা দেয়না'—গান দুটি স্বরলিপি ধরে 'বীনাবাদিনী' পত্রিকায় ১৩০৫ সালে প্রকাশ করেন দুটি সংখ্যায়। প্রথম গানটির স্বরলিপি আলোচ্য গ্রন্থে (পরিশিষ্ট-৩) যোজিত হয়েছে। অপর গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত না করার কারণ বোঝা গেল না। এটিও মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল।

সবশেষে বলতে হয়—গ্রন্থটি লালন সম্পর্কে সর্বাধুনিক তথ্য বিশ্লেষণ বহুল শুধু নয়, লালন সম্পর্কে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত আলোচনার ধারাবাহিক বিবরণ, বিতর্কমূলক ক্ষেত্রে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের যথা যোগ্য বিচার বিশ্লেষণ করে নতুন দৃষ্টিকোণে সন্ধান করেছেন নতুন তর সত্যের। সেই সঙ্গে বাংলা —'সাহিত্যের ঐকতান সঙ্গীত সভায়—একতারা যাঁহাদের'—তাঁদেরও উপযুক্ত ও দীপ্ত সম্মান দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রত্যাশা পূরণ করেছেন এই গ্রন্থে। □

■ **ব্রাত্য লোকায়ত লালন** — সুধীর চক্রবর্তী
পুস্তক বিপণি, কল-৯ / ৮০ টাকা।

নানা বর্ণের বিচ্ছুরণ

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন আগে কলকাতায় একটি আমেরিকান ফিল্ম এসেছিল, "দি ওয়েস্ট সাইড স্টোরি"। তার প্রথম দৃশ্যেই দেখা গেল এক দল যুবক নিউ ইয়র্কের রাস্তা দিয়ে চলেছে, নিছক প্রাণ-ধারণের, দেহ-ধারণের আনন্দে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে প্রায় ছুটে চলেছে রাস্তা দিয়ে। তারপর দেখি তাদের সেই চলা কখন নৃত্যের রূপ ধারণ করেছে, চলার ছন্দের ভিতর থেকেই জন্ম নিয়েছে নৃত্যের ছন্দ। সে নৃত্য কিন্তু স্টেজের নয়, চলার পথেরই নৃত্য, পথ চলারই নৃত্য।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায়, বিশেষতঃ দীর্ঘতর কবিতায়, সহজ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল পদক্ষেপে কবির আনন্দ ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়, আবার সেই আনন্দই ভিতরকার কোন তাপে, কোন চাপে, ক্ষণে ক্ষণে মাটি ছেড়ে ওপরে ওঠে যেতে যায়, প্রাত্যহিকের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে, কেলাসিত হয়ে ওঠে হঠাৎ কোনও অপ্রত্যাশিত স্ফটিক, নানাবর্ণ বিচ্ছুরিত করতে থাকে নানা জনের অক্ষিপটে :

ঠিক এই সময়েই
বড় বাজারের খ্যাপা ষাঁড়ের মতো
শিং বাঁকিয়ে
ঝকঝকে নীল আকাশের গায়ে
লাফিয়ে পড়ে সেই কৃষ্ণবর্ণ
মেঘপুঞ্জ,
সার দুপুর চুপচাপ যে কিনা
দশতলা ওই বাড়িটার পিছনে লুকিয়ে ছিল।
আকাশের মুখও তৎক্ষণাৎ
অপমানে কালো হয়ে যায়, আর তার
চোখের মধ্যে
রাগের আগুন ঝিলিক দিয়ে ওঠে।
(কালবৈশাখী)

কবিতা, তা সে নিয়মিত ছন্দোবদ্ধ হক আর না হক, তার চলাটাই হল আসল, তার চলার যে নিজস্ব ছন্দ কিংবা ভঙ্গী তা থেকেই বেরিয়ে আসে সৃষ্টির প্রেরণা বলুন, উদ্দীপনা বলুন, অমোঘ, অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়া বলুন, সব কিছু। তীরধনুকের জ্যাটি টানটান করে বাঁধলে তবে না তা থেকে তীর ছুটবে। কবি যেই বললেন 'অনাথপিণ্ডদ' অমনি একটা ছন্দে বাঁধা হয়ে গেল তাঁর কবিতার ছত্র এবং স্তবক শুধু নয়, ভাব, আবেগ, কল্পনা, এমন কি চিত্রকল্প পর্যন্ত। সেই কারণেই, কখনো কখনো, কোনও কোনও কবিতা পড়বার সময়ে মনে হয়, হয়ত কতকটা মানসিক অভ্যাসের বশেই হক কিংবা যে কারণেই হক, কবি যে চলনটি এখানে অবলম্বন করেছেন তাতে সুবিচার করেন নি তিনি নিজের প্রতি, নিজের সৃষ্টির সম্ভাবনার প্রতি। যেমন, "রূপকাহিনী"। হয়ত, পাছে মনে হয় মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করছেন তিনি নিজের ওপর, নিজের অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শনের ওপর, একটু মাত্রাতিরিক্ত হাল্কা, চটুল চলনভঙ্গীই তিনি বেছে নিয়েছেন। কোনও কবির পক্ষে অতিরিক্ত বিনয়ী হওয়া ভাল নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা মনে করুন, মিলটনের কথা মনে করুন।

বাদবাকি দিন বলতে যে ঠিক কদিন বাঁচব
সেটাই কি ছাই জানি? নাকি
না-জানলে আর চলছে না? দূর,
জানতে আমার রয়েই গেছে। (রূপকাহিনী)

কবি যতই বলুন, কোনও পাদপীঠের ওপর নিজেকে আমি দাঁড় করাব না, ভুলেও এমন ভাব দেখাব না যে আমি রাম-শ্যাম-যদু-মধুর থেকে আলাদা কোনও কিছু, যতই তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করুন;

"এই তো আমি ভালই আছি, ঘুরছি-ঘারছি,
আড্ডা মারছি,
উঠছি বসছি, নিদ্রা দিচ্ছি, খাচ্ছি দাচ্ছি"— ইত্যাদি

এমন যেন কখনও মনে না হয় কোনও মুখোশের আড়ালে তিনি আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছেন। একটু এগিয়ে কবি যখনই বলেন,

মায়ার মধ্যে মস্ত একটা বোলতা আছে, তার কামড়ে
পাগল হয়ে বাইরে যাচ্ছি,
খনিক বাদেই ধেত্তেরিকা, আবার আমি ফিরছি ঘরে
মাঝে মধ্যে ছড়া বানাচ্ছি,

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে মনে, এ কার কথা বলছেন কবি, কিসের কথা? বেশ কিছু দিন থেকে আমাদের শিক্ষিত শহুরে সমাজে কারো কারো মধ্যে একটা চেষ্টাকৃত অভ্যাস দেখা যাচ্ছে নিজের কথা বলতে গেলে "এই অধম" বলার। (যতদূর মনে হয় সৈয়দ মুজতবা আলি এই রীতির প্রবর্তনের জন্যে দায়ী) এই ছদ্ম বিনয় কাউকেই সাজে না, কোনও কবিকে একদম নয়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ছড়া নয়, সত্যিকারের কবিতার কারিগর। তাঁর 'কবিতা-সমগ্র'-র ওয় খণ্ড এলোপাথাড়ি যে কোনও জায়গায় খুলুন, দেখুন কেমন থমকে দাঁড়াতে হয়, কেমন অবাক হয়ে ভাবতে হয়, এ কী হল! এ কেমন করে হল! গুটি কয়েক মাত্র শব্দ, সবই অতি চেনা শব্দ, তার মধ্যে এমন ম্যাজিক ছিল, তা তো জানতাম না। আমাদের এত চেনা পৃথিবী, তার মধ্যে এমন কৌতুক, এমন রহস্য, এমন ঐশ্বর্য ছিল তা তো জানতাম না :

আমি বললুম, এসো!
সে তবু আসে না কাছে,
মায়া দিয়ে গড়া
জ্যোৎস্না অধরা
দূরারে দাঁড়ায়ে আছে। (জ্যোৎস্নারাতে)

দাঁড়ি টেনে পর্ব ভাগ করে এই কাব্যস্তবকের গঠন-সৌন্দর্য ব্যাখ্যার চেষ্টা বৃথা, উচ্চারণ করে পড়বারও দরকার করে না, এ এমন কবিতা, যার দিকে একবার তাকালেই নানা ভাবের গুঞ্জন শুরু হয় মনের মধ্যে। কবিতা থেমে যায়, কিন্তু তার রেশ আর থামতেই চায় না। এ তো নতুন কথা কিছু নয়, কিন্তু কখনও কখনও আবার এইটুকু বললে মনে হয় সবটা বলা হল না। কখনও কখনও মনে হয়, কবিতাটি যেখানে এসে থামল, সেখান থেকে যে অন্ধকার শুরু সেই অন্ধকারের মধ্যে কতদূর পর্যন্ত কে জানে প্রসারিত হয়ে আছে আরও একটি কবিতা। "জয়ন্তী পাহাড়ে" কবিতাটি শেষ ধাপে পৌঁছে যেন আবছা দেখতে পাই অপেক্ষারত আরেকটি কবিতার, কিংবা একের পর এক কবিতার মূর্তি :

কিন্তু জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে শুধু
জলের শব্দই আমরা সেদিন
শুনেছিলুম।
জল দেখতে পাইনি। (জয়ন্তী পাহাড়ে)

কেন এমন মনে হয়, বলা বড় কঠিন। সে কি কবিতার শেষে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে বলে? অদৃশ্য জলের গর্জন শুনতে পাচ্ছি বলে? না কি, কবিতার শেষ স্তবকের ছোট ছোট বাক্য, কাটা কাটা লাইন, যেন মনে হয় আমাদেরকে যা বলা যায় না তার প্রান্তে এসে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, সেই কারণে? অর্থাৎ কলম যেখানে এসে থামল, তার পরের কবিতাটা আর লেখা যায় না।

অথচ নীরেন্দ্রনাথ শক্ত মাটির ওপরে পা রাখতে ভালবাসেন, যে মাটিতে কঠিন সব ব্যাঞ্জনবর্ণ ছড়িয়ে পড়ে আছে, যে মাটিতে পথ চলতে গেলে পায়ে পায়ে ঠোক্কর পেতে হয় :

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকা দিয়ে
উত্তর শহরতলির এই
কলোনির মধ্যে খুবই কষ্টেসৃষ্টি যিনি
দশ বাই দশ দুখানা শোবার ঘর,
পাঁচ-বাই সাত একটি দমা-ঘেরা কলঘর এবং একফালি
তিন বাই আট বারান্দার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন,
সেই রোহিনীকুমার চৌধুরী এতদিন
ঊর্ধ্বমুখী হয়ে
আকাশ দেখবার অবকাশ বড় একটা পাননি।

অথচ, (আবার অথচ), এই কবিতারই শেষে দেখি, কবি, যিনি 'খবুরে-কাগুজে' পদকার, খুবই বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছেন :

আকাশের ওই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যেই
রোহিনীকুমার তাঁর
অনেককাল আগে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়া মা'কে এখন
খুঁজে বেড়াচ্ছেন (রোহিনীকুমার)

অথচ, অথচ অথচ। নানা বিচিত্র প্যারাডক্স নিয়ে গড়ে উঠেছে নীরেন্দ্রনাথের কবিতা। বন্ধুদের "নিষ্পাদপ উদ্যানে" আগাছারা, কেমন চমৎকার বেঁচে আছে, অথচ তারা বাঁচবার অর্থ খোঁজে না। (আগাছার দিন)। কবি "তিন হাজার সাতশো / চৌষট্টি রকমের / অকাজের মধ্যে ঘুরপাক" খাচ্ছেন, অথচ, "কাজের ডাক যখন, / তখন / অন্য সকলের আগে / আমিই সে-ডাক সবচেয়ে স্পষ্ট শুনতে পাবে। (ভাবনা কোরো না)

আসলে কবির চেতনার ঝিনুকটির মধ্যে অসঙ্গতির কোনও কাঁকর কড়কড় করে না উঠলে বোধহয় কবিতার মুক্তফলকটির জন্ম হয় না। এই সঙ্কলনের একটি কবিতায় সেই রকম এক মূর্তিমান অসঙ্গতি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এ এমন কবিতা, যা নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া অনাবশ্যক ব্যর্থ বাচালতা বলে মনে হতে পারে। অথচ এরও সেই ছোট-ছোট পা ফেলা দ্রুত লয়ের ছন্দ :

জনমনিষ্যি কোত্থাও নেই দূরে-কাছে
ব্রহ্মডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে
নুপসি অশথ সারাটা দিন, সারাটা রাত।
বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ছে বিশাল ধারার
জলপ্রপাত। (একলা-অশথ)

রবীন্দ্রনাথের "অশ্বত্থপিণ্ডর"-র মত এখানেও সম্ভবত "একলা-অশথ" আর "ব্রহ্মডাঙা" এই দুটি কথাই জন্ম দিয়েছে এ কবিতার ছন্দের। এ অনুমান সত্য হক বা না হক, "ব্রহ্মডাঙায় একলা-অশথ", এই চিত্রধ্বনিই যে সমস্ত কবিতাটিকে অনিবার্য করে তুলেছিল তাতে কোনও ভুল নেই।

নীরেন্দ্রনাথ শব্দের ও ছন্দের জাল ফেলেন অনেক দূর ছড়িয়ে। তাতে যা-কিছু উঠে আসে তার সবই যে ঘরে নিয়ে যাবার মত, তা নয়। কিন্তু আনন্দের এবং দুঃখের, প্রাপ্তির এবং অপ্রাপ্তির, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের প্রাত্যহিকের মধ্যে অপ্রত্যাশিতের কত মুহূর্ত যে তিনি শব্দের অব্যর্থ সড়কিতে গেঁথে তুলেছেন, তার হিসাব করা সহজ নয়—, বৈচিত্র্যের শেষ নেই, বৈপরীত্যের অন্ত পাওয়া যায় না, তাতেই কবির আনন্দ। অথচ (এই শেষ অথচ) এত রকমের গরমিলের মধ্যে কোনও একটা মিল যে কোথাও আছে, এ বিশ্বাস অজেয়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরে অন্বেষণ চলতেই থাকবে :

আমার মনে হয়,
মুখ টিপে তাঁরা হাসছেন। যেন
বলতে চাইছেন, 'আর কেন,
অনেক তো হল,
দেরাজের মধ্যে খাতা আর কলম ঢুকিয়ে এখন
চলে এসো।'
আমি বলি, 'যেতেই তো চাই। কিন্তু একটা
মুশকিল হয়েছে।
সেই যে একটা মিল খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম,
এখনও সেটা পাওয়া যায়নি। পেলেই চলে যাব।'
(একটা মিলের জন্যে) □

■ **কবিতা সমগ্র-৩** — নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কল-৯ / ৫০ টাকা।

বুদ্ধবিষয়ক কবিতার সংকলন

সুধীর চক্রবর্তী

ভারতীয় ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব। তাঁর প্রবর্তিত মৈত্রী-করুণা-অহিংসার দীক্ষা আকর্ষণ করেছে সারা বিশ্বের মুমুক্ষু মানুষকে। বৌদ্ধধর্ম তার উদ্ভবভূমির সীমা ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে নানা দেশে। বুদ্ধজীবন নিয়ে রচিত হয়েছে নানা নাটা ও কাব্য। তাঁর দর্শন নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা মত বা প্রস্থান। তাঁর প্রভাব দুধরনের— ব্যক্তি ও সংঘ ঘিরে। কাজেই এটা স্বাভাবিক যে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও অসমের নানা ব্যক্তি কবি মনের পটে বুদ্ধদেব ফেললেন তাঁর অমলিন জ্যোতিপ্রভাব। কিন্তু এতদিন যেসব কবিতা একত্র সঙ্কলন করে একটি মণি মঞ্জুষার মতো কেউ আমাদের উপহার দেননি। অবশেষে বাঙালি পাঠকের সে সৌভাগ্য হল। 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী 'বুদ্ধপ্রণাম' নাম দিয়ে বাংলাভাষায় লেখা বুদ্ধবিষয়ক কবিতার এক বৃহৎ সংকলন প্রস্তুত করেছেন।

সুরুচিসম্মত সুশোভন বুদ্ধপ্রণাম নামের সংকলনটি ১৯৭ জন কবির একটি করে কবিতা নিয়ে গ্রথিত। শুরুতে আছেন রবীন্দ্রনাথ (জন্ম ১৮৬১) সবশেষে আছেন শৈলেন্দ্র হালদার (জন্ম ১৯৬৭)। কবিদের বয়সের কালক্রম অনুযায়ী কবিতাগুলি বিন্যস্ত এবং বইয়ের শেষে আছে কবি পরিচিতি। ২৬৪ পৃষ্ঠার এই অনতিবৃহৎ কাব্যসংকলন বুদ্ধপ্রেমী সকল পাঠককে খুশি করবে। বুদ্ধবাণী ও বুদ্ধের আদর্শ প্রচারের পাশে পাশে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্গুর সভা বুদ্ধ বিষয়ে বাঙালি কবিদের ভাবনা যে দুই মলাটের পরিসীমায় ধরতে চেয়েছেন এরজন্য তাঁদের সাধুবাদ অবশ্য প্রাপ্য। বড় কাজে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা সম্পাদককে অনেকখানি ভারমুক্ত রাখে। প্রকাশক ধর্মপাল তাঁর প্রাক্ ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন : 'বুদ্ধত্ব লাভই মানুষের আদর্শ। ...কবিতা সমাজ জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। আমাদের কবিরা মহামানব বুদ্ধকে কী দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তাঁর প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন সে বিষয়ে একটি সংকলনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।' সংকলন প্রসঙ্গে হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীর মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য। তাঁর মতে, 'কাল প্রবাহের সঙ্গে বাংলায় বুদ্ধচর্চা ক্রমে নিঃসন্দেহে গভীরতর অনুপ্রবেশে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। বুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমাদের কবিরা বিভিন্ন সময় যেসব কবিতা লিখেছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে স্বতন্ত্র কলেবরে ইতিপূর্বে তা প্রকাশিত হয়নি। ..সংকলনটি যদি দেশবাসীর প্রেরণাসঞ্চারী হয়, তবেই আমার এই প্রয়াস সার্থক হবে।' তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

'বুদ্ধপ্রণাম' সংকলনভুক্ত ১৯৭ জন কবির বুদ্ধবিষয়ক কবিতাগুলি অবশ্য বহুক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত নয়। বেশ কিছু কবিতা কবিরা 'সম্পাদকের অনুরোধে' লিখেছেন, যে কবিতাগুলি অনেকক্ষেত্রে, ছন্দ পতন ঘটিয়াছে। তাছাড়া এরমধ্যে এমন অনেকের লেখা আছে যাঁরা ঠিক কবি বলেও পরিচিত নন। যেমন তারাশঙ্কর, বনফুল, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, কুমারেশ ঘোষ, অরুণা হালদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বা অমিতাভ চৌধুরী। ফলে সম্পাদকের উদ্দেশ্য ও সংকলনের গাম্ভীর্য অনেক সময় ধা খায় যখন কবিতার নামে এ ধরনের রচনা পড়তে হয়, যথা—

যদি থাকতেন বুদ্ধ
হত কি আর কাটাকাটি
দুই দেশে ঘোর যুদ্ধ?

অথবা
অহিংসার পূজারী
হে মহান বুদ্ধ,
এ বিশ্বে আজ দেখি 'বুদ্ধ' বিদ্যমান

হাস্যকর ও শোচনার বিষয়।

সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ এই প্রধান একটা জায়গায় মস্ত ভুল করে ফেলেছেন। ফুল কুড়োতে গিয়ে এমন সব ফুল কুড়িয়ে বসেছেন যা পুজোয় লাগে না। সম্পাদকের দুটি প্রখর গুণ দরকার— প্রথমত অপক্ষপাত থাকা, দ্বিতীয়ত খুব বেশি গণতান্ত্রিক না হওয়া। বুদ্ধ প্রণামের সংকলক এই দুই বিষয়ে অসতর্ক এবং মাত্রাতিরিক্ত উদার। ফলে গদ্য লেখক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, ছড়াকার এমনকি রঙ্গ ব্যঙ্গের লেখক তাঁর কাছে কবি বলে ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। সেটা ঠিক নয়। আর একটা ভাববেগের দিক তিনি সামলাতে পারেননি। বুদ্ধ বিষয়ে লেখা বলেই কোনও রচনা কবিতা হয়ে যাবে তা তো নয়। বা কবি ধর্মে বৌদ্ধ বলে তাঁর রচনা নিতে হবে এমন কোনো বাধ্য বাধকতা থাকতে পারে না। সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ এ ব্যাপারে ভারি অসহায় মনে হল। অন্তত কবিদের নামসূচি এবং তাঁদের বেশকিছু কবিতা লক্ষ করলে একথা মনে হবেই। আর এইসব অকবি ও তাঁদের অকবিতার অন্তর্ভুক্তির ফলে সংকলনটি তার যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা হারিয়েছে অনেকাংশে।

সম্পাদকের প্রান্তিক নানা নমুনা অনুভাবেও চোখে পড়ে। যেমন 'প্রাক্‌কথন' অংশে হেমেন্দুবিকাশ লিখেছেন, 'স্বনামধন্য কবি অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অনিল বিশ্বাস, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাংলাদেশের বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুর রহমান, আসামের নবকান্ত বড়ুয়া প্রমুখ আমার অনুরোধেই কবিতা লিখেছেন।' ভালকথা। কিন্তু প্রশ্ন হল স্বনামধন্যদের তালিকায় অনিল বিশ্বাস নামক কবির নামই যে আমরা শুনিনি। কবি পরিচিতি পড়ে অবশ্য জানা গেল তিনি, 'একাধিক বিদ্যায় পারঙ্গম। মানবিকী, বৈজ্ঞানিকী, আইনিকী প্রভৃতি বহুবিধক জ্ঞানকে তিনি সমালোচনে বিধৃত করেছেন।' তাঁর কবিতাটিও বহুবিধক জ্ঞানের নমুনা। তাতে অবশ্য কবিত্বের ছিটফোঁটা নেই। ছন্দজ্ঞানের ভারসাম্যও কম। আঠারমাত্রায় আগাগোড়া লিখে অজ্ঞাত কারণে কবি শেষ চার পংক্তি চৌদ্দ মাত্রায় লিখেছেন।

সম্পাদকীয় অবিবেচনার চরম উদাহরণ অবশ্য জীবনানন্দ দাশের তিনটি কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন তিনটি স্তবকের নির্বাচিত উৎকলন। 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে'র উল্লেখ আছে বলেই 'বনলতা সেন' বুদ্ধবিষয়ক কবিতা?

এত রকমের অন্তর্ঘাত সত্ত্বেও 'বুদ্ধপ্রণাম' বইটি কিন্তু মূল্যবান ও সংগ্রহযোগ্য। কারণ রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সদ্যতন মানা বাঙালি কবিদের লেখা প্রকৃত ভাল বেশ কিছু কবিতা সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের বুদ্ধভাবনার বিচিত্রধর্মিতাও কম আকর্ষণীয় নয়। □

■ **বুদ্ধপ্রণাম** — সম্পাদনা : হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলকাতা-১২।
৫০ টাকা।

সর্বজনীন বর্ণমালা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়

অমিত্যভ মুখোপাধ্যায়

ভাষাবিজ্ঞানের উপর বই বাংলায় খুব বেশি বেরয় না। তাই নতুন যে-কোনও বই-ই আগ্রহের সৃষ্টি করে। আবার সে-বই যদি হয় অনাবাসী কোনও বাঙালির লেখা যিনি লেখাপড়ার বেশির ভাগটাই সেরেছেন বাংলার বাইরে তাহলে ঔৎসুক্য আরও বাড়ে। আলোচ্য বইখানির বক্তব্যটা সূত্রত গঙ্গোপাধ্যায় দীর্ঘকাল ইয়োরোপ-আমেরিকায় কাটিয়েছেন। জন্ম আসামে এবং শৈশবশিক্ষাও সেখানে। তারপর বাঁকুড়া ও কলকাতা হয়ে জার্মানি। পরে কানাডা ঘুরে আবার জার্মানি। যন্ত্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান ও পরিচালনবিদ্যা তাঁর আয়ত্তে। এশিয়া, ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরেছেন। ভারতের প্রায় সর্বত্রই গিয়েছেন তিনি। অভিজ্ঞতা যেমন প্রচুর, তেমনি অধ্যয়নও ব্যাপক। একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি এই বইটি লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সারা পৃথিবীতে প্রচলিত নানা লিপির উৎপত্তি ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ-খানেক পৃষ্ঠার এই বই-এ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এসবের পশ্চাতে আছে একটি গূঢ় অভিপ্রায় : ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য একটি সর্বজনীন লিপির সুপারিশ। লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন, 'ভারতে যাকে বহুভাষার সমস্যা বলা হয়, আসলে তা হচ্ছে বহুলিপির সমস্যা।' লিপির এই বিভিন্নতা ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি না করে অন্তরায়েরই কারণ হয়ে উঠেছে বলে তাঁর নির্ণয়। আর তাই তিনি চান সব-কটি ভারতীয় ভাষাই রোমান হরফে অক্ষরান্তরিত করে লেখার ব্যবস্থা হোক। এই লিপান্তর পদ্ধতি যথাসম্ভব সরল করার প্রয়াসও তিনি পেয়েছেন। কতকগুলি ছক তৈরি করে তিনি নানা ভারতীয় ভাষার বর্ণসমূহের রোমান হরফে লিপান্তরের নির্দশন দেখিয়ে দিয়েছেন। এজন্য প্রচলিত ইংরেজি কমপিউটারের একটি সংশোধিত কি-বোর্ড-এর নমুনাও দেওয়া হয়েছে।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য সাধু। তাঁর এই সংকল্পের অন্যতম পূর্বতন প্রবক্তা ছিলেন স্বয়ং আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। রাজশেখর বসু, গোপাল হালদার ও আরও কেউ কেউ এই মতের সমর্থক ছিলেন। রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখেরও এই একই ভাবনা ছিল। বহু ভাষাভাষী এই উপমহাদেশে আন্তঃরাজ্য অবাধ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রোমান লিপির কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা দীর্ঘদিন ধরেই চলেছে। সেই আলোচনায় সাম্প্রতিক সংযোজন আলোচ্য পুস্তকটি।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের তার প্রতিপাদ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বই-এর গোড়ায় একটি ছোটো অধ্যায়ে লিপি বিষয়ে সমাজভাষাতাত্ত্বিক কথাবার্তা বলে নিয়ে ক্রমান্বয়ে গ্রিক, আরামেয়িক, দক্ষিণ সেমেটিক, কোমক, ভারতীয় ও এশীয় কয়েকটি লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করেছেন। ভারতীয় লিপিচিহ্নের বিবর্তনের কথা দু-পৃষ্ঠায় সেরে নিয়েছেন। ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় বেশ কয়েক পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন, এখানে যদিও সেটা খুব জরুরি ছিল না। তবে বইটিতে নানা আলোচনার সূত্রে যেসব ছক, তালিকা ও চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলি কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে খুবই কাজের হবে। এর মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তুত করতে লেখকের পরিশ্রম আন্দাজ করা যায়। বইটির বিষয়বস্তু ও তার উপস্থাপনা অবশ্যই সাধারণ পাঠককে আকর্ষণ করবে। তবে, ভাষা সংক্রান্ত এই বই-এ মুদ্রণপ্রমাদ এবং বিশেষ করে 'উৎকর্ষতা' 'লক্ষণীয়' শব্দাবলি না দেখতে পেলেই ভালো লাগত।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে উপস্থাপিত প্রস্তাবের সপক্ষে অনেককেই পাওয়া যাবে। বিশেষ করে জাতীয় সংহতির দিক দিয়ে এমন লিংক স্ক্রিপ্ট বা সর্বজনীন লিপির প্রয়োজন অনেকেই সহজে স্বীকার করে নেবেন। কিন্তু আবার কোনও কোনও মহল লিপিসমস্যার এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে দ্বিধাবোধ করতে পারেন। যে সুনীতিকুমার একদিন রোমকলিপি প্রচলনে উৎসাহী ছিলেন তিনিও পরে তাঁর সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন। এক লিপি প্রবর্তনের দ্বারা সংহতি দৃঢ় হবে অথবা বিচ্ছিন্নতার মনোভাব মাথাচাড়া দেবে সে কথা ভেবে দেখতে চাইবেন কেউ কেউ। কেননা বৈচিত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে ঐক্য আনার চেষ্টায় একটা বড়ো ঝুঁকি থেকে যায়। ভারতবর্ষের মতো বিশাল

দেশে ধর্ম, ভাষা, লিপি প্রভৃতির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যই হল এ-ভূখণ্ডের বিশিষ্টতা। এগুলিকে মেনে নিয়েই নানা শ্রেণীর মানুষ পাশাপাশি একত্র বসবাস করছে। আর তার থেকেই বেরিয়ে এসেছে অখণ্ডতা ও একাত্মতার সূত্রটি। কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে লিপিসংস্কার করেছিলেন একটি বিশেষ ভাষার, সেখানে সমস্যাটা নানা ভাষা নিয়ে ছিল না। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বর্তমান লিপিসমূহ কয়েক শতাব্দী ধরে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিটি ভাষারই মানুষের সেই সেই লিপির প্রতি মমত্ব থাকে, ভাষা ও লিপি মিলে এক ধরনের সাজতা অভিমান গড়ে তোলে। কাজেই সেই লিপি কেড়ে নিলে বা বিজাতীয় কোনও লিপি চাপিয়ে দিলে অভিমানে ঘা লাগে। তার ফলে বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে। আর তাই লিপিসাম্য নিয়ে এত এত কথার পরও আজ পর্যন্ত তা রূপায়ণে তেমন উদ্যোগ দেখা যায় নি। বরং গোটা দেশের সরকারি কাজকর্ম একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে চালানোর উদ্দেশ্য এদেশীয় ভাষাগুলির শব্দসমন্বয়ে এসপেরেন্তো-র মতো একটা কৃত্রিম ভাষা উদ্‌ভাবনের কথা চিন্তা করার সময় এসেছে।

বাইবেলের টাওয়ার অব ব্যাবেলের কাহিনী আমাদের মনে পড়তে পারে। এযুগে কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে বাংলায় সাহিত্য নাগরি হরফে এবং হিন্দি সাহিত্য বাংলা হরফে রূপান্তরিত করে হিন্দিভাষীকে মুল বাংলায় বাংলা সাহিত্য এবং বাংলাভাষীকে তার নিজের লিপিতে মূল হিন্দি সাহিত্য পড়ার সুযোগ করে দিতে পারলে হাতেতা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় অনেক দূর এগোনো সম্ভব হবে। তবে সব ভারতীয় ভাষার সাহিত্য এভাবে লিপান্তর করা যাবে না। ওড়িয়া অসমিয়া বাংলায় করা যাবে, মারাঠি গুজরাটিতে করা যাবে, মালয়ালাম তামিলে করা যাবে, তেলেগু কন্নড়ে করা যাবে। বাকি কাজটা অনুবাদে করতে হবে। আমরা ফরাসি সাহিত্যিকদের লেখা ইংরেজি অনুবাদে পড়ে থাকি। যিনি মূল ভাষা শিখে নিয়েছেন তিনি ফরাসিতেই রস গ্রহণে অধিকার অর্জন করেছেন। একালের নাম করা সাহিত্যিক মার্কোয়েজ, মিলান কুন্দেরা, গুন্টার গ্রাস প্রমুখ তাঁদের মাতৃভাষাতেই লেখালেখি করে থাকেন। রোমান হরফের একরূপ-তার সুযোগ থাকলেও স্পেনীয় বা জার্মান ভাষায় লেখা কিন্তু ইয়োরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ার মানুষ আস্বাদন করতে পারেন না। পারেন না ইংরেজি-জানা ভারতীয়রাও। আশ্রয় নিতে হয় অনুবাদের। ভারতের ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও তাই হবে।

তাই সর্বজনীন বর্ণমালা নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। □

■ **লিপির পদাঙ্ক রেখায়** — সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
সমতট প্রকাশন, কলকাতা-২৯ / ৬০ টাকা।

আবদুল ওয়াহাব মাহ্‌মুদ

জন্ম ১৫অগস্ট ১৯১০

মৃত্যু ১২মার্চ ১৯৯৬

সূর্যের অন্তিম হাত মুছে দিয়েছিল দুঃস্বরেখা

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে মাহ্‌মুদ বলেছিলেন, 'একটা স্বপ্ন ভেঙে গেছে। ...স্বপ্ন ভাঙে; কিন্তু মরে না।' মগজের মধ্যে থামতে চায় না, এই কথাগুলোর অনুরণন।

অথচ স্বপ্নও তো এখন পণ্য, লালাসিক্ত পণ্য। বিজ্ঞাপনের দেশিবিদেশি ফেরিওয়ালারা হরেক মিডিয়ার মারফত পণ্যীকৃত স্বপ্নের বেসাতি ঢালাও চারিয়ে দিচ্ছে সমাজের স্তরে স্তরে। এই কলুষিত সময়ে মাহ্‌মুদ সেই একজন মানুষ, যিনি একটা স্বপ্নের শুদ্ধতা অনাহত রেখেছিলেন, আমরণ। সে স্বপ্ন সেক্যুলার ভারতবর্ষের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন ভাঙে; কিন্তু মরে না।

জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম.এ. পর্যন্ত লেখাপড়াও পূর্ব বাঙলাতেই। যাকে বলে, নির্ভেজাল বাঙাল! অথচ দেশভাগের পর স্বদেশ ব'লে—স্বেচ্ছায়—বেছে নিলেন ভারতবর্ষকে। সীমান্তের ওপার-থেকে-আসা আমন্ত্রণে আর কান দেন নি। এরও কারণ সেই সেক্যুলার প্রজাতন্ত্রে বদ্ধমূল বিশ্বাস।

বাস্তবিক, ওই সেক্যুলার প্রত্যয় ছিল মাহ্‌মুদের মজ্জার মধ্যে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি অক্সফোর্ডে ছিলেন উনি। সেই সময়ে জড়িয়ে পড়েন বিলেতের ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনে। নাৎসি সন্ত্রাসে যাঁরা দেশত্যাগী হয়েছিলেন সেই উদ্বাস্তুদের শিবির সংগঠিত করেন তখন। হয়তো সেই সময় থেকে এই সত্যিটা ওঁর বোধে আসে যে ভারতীয় রাজনীতিতে বিকৃত সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ফ্যাসিজমের আঁতের যোগ আছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ফ্যাসিজমের ভারতীয় সংস্করণ রূপে চিনতে শেখেন তিনি। ক্রমে ক্রমে ফ্যাসিজম-বিরোধিতা আর সেক্যুলার প্রত্যয়—এই দুটো মূল উপাদান—তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারায় মিলে মিশে যায়। এর একটা ছাপ পড়ে ওঁর জীবনযাত্রায়। তাই দেখি: ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াতে পড়াতে তিনি যুদ্ধে যোগ দিচ্ছেন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্তর্জাতিক ফ্রন্টে শামিল হবার জন্যে। আবার দেখি: ১৯৪৬ সালের ১৬ অগস্ট থেকে শুরু করে যতবার কলকাতায় দাঙ্গা বাধছে, ততবার, সে আগুন নেবাতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, সম্পূর্ণ বেপরোয়া।

২.

আশির দশক থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমাগত ঘোরালো হতে থাকে। ওই দশকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ ঘটে দিকে দিকে: মোরাদাবাদে ভিওয়ানডিতে বরোদায় আমেদাবাদে মীরাটে দিল্লিতে কোটায় বদাউনে কানপুরে ইন্দোরে সাসারামে হাজারিবাগে কাশীতে ভাগলপুরে। স্তব্ধ হয়ে সমস্ত দেশ দেখল: সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রাষ্ট্রযন্ত্রের যোগসাজস, প্রত্যক্ষ মদত। মীরাটের হাশিমপুরায় (মে ১৯৮৭) প্রভিন্সিয়াল আর্মড কনস্টেবুলারি (পি.এ.সি.) সরাসরি গুলি চালিয়ে খুন করল মুসলমানদের। গণনিধন! অযোধ্যায় শিলান্যাসের মহোৎসবে (১০ নভেম্বর ১৯৮৯) বন্দুকধারী পি.এ.সি. নেচে কুঁদে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলল। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা বললেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নাচার হলে, সেদিন পি.এ.সি.-ই শিলান্যাস 'সুসম্পন্ন' করত! দেশের বিশাল অংশ জুড়ে দেখা গেল সাম্প্রদায়িক শক্তির বাড়বাড়ন্ত দশা। রাষ্ট্রব্যবস্থার যত ধুরন্ধর মুরুব্বি, তাঁরা, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রইলেন। গোটা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে যা অভাব্য শয়তানির মাত্রা দেয়, তা হচ্ছে: বেহদ্দ ভণ্ডামি। সংকট থেকে সংকটের চক্রে তখন যে-সময় পাক খাচ্ছে, তার কালো ছায়ার সঞ্চরণ দেখতে পাচ্ছি মাহ্‌মুদের এই পর্বের চিঠিপত্রে। বাবরি মসজিদের ওপর সংঘবদ্ধ হামলার মাস তিনেক আগে এইরকম একটি চিঠিতে (২১-৯-৯২) তিনি লিখছেন:

> কোনও দিকে ভালো কিছু দেখা যায় না। ক্ষয় এবং হতাশা। চার দিকে যা দেখছি—দারিদ্র্য, অভাব, মিথ্যা, জোচ্চুরি—মনে হয়, এক বছরের মধ্যে আবহাওয়া অসহনীয় হয়ে উঠবে। তখনও কি সবাই চুপচাপ থাকবে? কে কথা বলবে? সমস্ত জাতি চোর হয়ে গেছে! কেউ নাই! আছে শুধু কলকাতার রাস্তার ঘুমন্ত পাথরগুলো। কোনো দিন, চরম দুরবস্থায়, তারা কি উঠে কথা কইবে?

বাবরি মসজিদ ভাঙার চার মাস পরে—এবং তারই বীভৎস পরিশিষ্ট হিসেবে, ভারতবর্ষের উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে-পশ্চিমে প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে যে-ব্যাপকতম দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল, তার পরে—আরেকটি চিঠিতে (৫-৪-৯৩) তিনি লিখছেন:

> দেশে অনেক কিছু ঘটে গেল। দেশের স্বাধীনতা, সংহতি ও ঐক্য আজ খুব বিপন্ন। জানি না কী হবে।
>
> আমার মন চাইছে তোমাকে দেখতে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে।

ওদিকে প্রায় ওই একই সময়ে আন্তর্জাতিক দিগন্তেও কালো মেঘ জমছিল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেমে পড়ল দীন-দুনিয়ার ভুঁইফোঁড় দারোগাগিরির ভূমিকায়, যা প্রকট হয়ে উঠল ইরাক-মার্কিন যুদ্ধে। এই পর্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মাহ্‌মুদ দেখতে পাচ্ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ আর ফ্যাসিজমের নতুন চেহারায় ফিরে আসার প্রক্রিয়া। যে-দিন ইরাক-মার্কিন যুদ্ধ বাধল, ঠিক সেদিন (১৬-১-৯১)—যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে—একটি চিঠিতে তিনি লেখেন:

> আজ হয়তো যুদ্ধ শুরু হবে। যদি সত্যি যুদ্ধ হয় তবে জগতের রাজনৈতিক চেহারা পালটে যাবে। এখন থেকে *process of recolonisation* শুরু হচ্ছে।

৩.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ সালে মাহ্‌মুদকে সম্মানিত করেন একজন অগ্রগণ্য শিক্ষক রূপে। নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তিকেই এই মান দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়। এই সূত্রে বলি, অগ্রগণ্য শিক্ষক বিষয়ে মাহ্‌মুদের ধ্যানধারণায় একটা নিজস্বতা ছিল। আমাদের এই গুরুশিষ্য পরম্পরার দেশে গুরুর নামে শিষ্যকে শনাক্ত করার রেওয়াজ আছে। কিন্তু মাহ্‌মুদ ভাবতেন অন্যরকম। তিনি তো বলতেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের গড়ে তোলে ওঁদের ছাত্ররাই। জীবনের শেষের দিকে এক ছাত্রকে তিনি বলেন: আমার ছাত্র তুমি—এইটেই আমার শেষ পরিচয়। □

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য